বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

সংখ্যা-২৯ • বর্ষ-৭

প্রত্যয়
এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২২ • সংখ্যা-২৯ • বর্ষ-৭

উপদেষ্টা সম্পাদক
জাকির হোসেন

সম্পাদকমণ্ডলী
প্রাণেশ চন্দ্র বণিক
ফারমিনা হোসেন

সম্পাদক
ফেরদৌস সালাম

নির্বাহী সম্পাদক
বিদ্যুত খোশনবীশ

প্রচ্ছদ
ইনফ্রা-রেড কমিউনিকেশনস লি.

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
শাহ আবুল কালাম আজাদ

প্রোডাকশন
পাওয়ার গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টার্স

যোগাযোগ
khoshnobish@burobd.org
01318 230552
01977 220550

www.prottoybd.com

বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক
বাড়ি-১২/এ, ব্লক-সিইএন (এফ),
সড়ক-১০৪, গুলশান-২,
ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

শুভেচ্ছা মূল্য : ১০০ টাকা

সম্পাদকীয়

নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী দেশের মূল্যবান সম্পদ

একটি দেশের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী সে দেশের বড় সম্পদ। সে দিক থেকে বাংলাদেশ অতীব সম্পদশালী। এ দেশে বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠী ছাড়াও রাষ্ট্রীয়ভাবে ৫০টি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর স্বীকৃতি রয়েছে। তাদের শারীরিক গঠন কাঠামো, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আচার ব্যবহার, জীবন-জীবিকা, সংস্কৃতি ও ভাষার ভিন্নতা বিদ্যমান। বাঙালি সংস্কৃতি ছাড়াও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্র্যময় এ সকল সংস্কৃতি ও নানা উৎসব আয়োজন দেশের জাতীয় সংস্কৃতিকে আরো সমৃদ্ধ ও বর্ণিল করেছে। বাংলাদেশকে করেছে বহুমাত্রিক ফুলের সমন্বয়ে একটি সমৃদ্ধ বাগান। করেছে অনেক সুন্দর, অনেক বৈচিত্র্যময়।

২০২২ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা সাড়ে ১৬ কোটির বেশি। তবে বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানের জরিপে বলা হয়েছে লোকসংখ্যা ১৭ কোটির অধিক। আর দেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনসংখ্যা প্রায় ১৭ লাখ। দেশের নাগরিক হিসেবে তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও নিরাপত্তার দায়িত্বও রাষ্ট্র ও সরকারের। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এ দেশের এই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের অনেক সদস্যই আর্থ-সামাজিক দিক যেমন শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে। এমনকি সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন উদ্যোগ সত্ত্বেও তাদের অনেকেই এখনো মানবেতর জীবন যাপন করছে। এ সকল কিছুর পেছনে মূল কারণ শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব, আর্থিক দুরবস্থা ও কর্মসংস্থানের অভাব।

এসব দুরবস্থা থেকে তাদের উন্নয়নের পথে যুক্ত করতেই সরকারের উন্নয়ন উদ্যোগের পাশাপাশি মিশনারী চার্চসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি উন্নয়ন খাতের অনেক প্রতিষ্ঠান এই পিছিয়ে থাকা সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের আত্মকর্মসংস্থান, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর ফলে নৃগোষ্ঠীসমূহের অনেকেরই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে। একই সাথে বাঙালিদের সাথে এক সময় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর যে সামাজিক দূরত্ব ছিল তা ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। দেশ ও জাতির উন্নয়নে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে সম্মিলিতভাবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বুরো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক এবং প্রত্যয়ের উপদেষ্টা সম্পাদক জাকির হোসেন এর নির্দেশনা ছিল দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা কেমন আছে তা সরেজমিন দেখে, জেনে এবং তাদের সাথে কথা বলে প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। বিশেষ করে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন খাতের সহায়তা নিয়ে কতোদূর এগিয়েছে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী তা জানতে হবে।

এ উদ্দেশ্যে আমরা চষে বেড়িয়েছি বৃহত্তর রাজশাহী, বৃহত্তর রংপুর, বৃহত্তর দিনাজপুর, বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেটের পথে-ঘাটে এবং পার্বত্য জেলাসমূহের দুর্ভেদ্য গভীর বনাঞ্চলে। ভারতের মিজোরাম সীমান্তবর্তী সাজেক এর সুউচ্চ কংলাক পাহাড়ের চূড়োয় উঠেছি লুসাই ও ত্রিপুরাদের যাপিত জীবন সম্পর্কে জানার জন্য। আমাদের প্রচেষ্টা বিফল হয়নি। বরং এ সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা মনের আকুতি মিশিয়ে তাদের প্রাণে জাগা কথাগুলো বলেছেন, সমস্যা তুলে ধরেছেন। অনেকেই বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনসমূহের সহযোগিতায় তাদের সাফল্যের গল্প বলে প্রশান্তির হাসি হেসেছেন। বলেছেন, আমাদের ভাগ্যের চাকা বদলানোর পেছনে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন খাতের অবদান অনেক। তারা আমাদের আত্মার আত্মীয়। প্রত্যয়ের এ সংখ্যা সাজানো হয়েছে দেশের পিছিয়ে থাকা নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সুখ-দুঃখ, সমস্যা ও সম্ভাবনার গল্প নিয়েই।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

সাতান্ন হাজার বর্গমাইলের বাংলাদেশের জনগণের সাংবিধানিক নাগরিক পরিচয় একটিই- বাংলাদেশি। কিন্তু এই অভিন্ন নাগরিক পরিচয় যে স্বতন্ত্র জাতিসত্তাগুলোর মিশেলে গড়ে উঠেছে তা এক কিংবা দুই নয়, বহু। বিশ্বের অন্যতম জনবহুল এই দেশে বসবাসকারী নৃগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রধান ও বৃহত্তম নৃগোষ্ঠী বাঙালি। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বাঙালিদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। এই বাঙালি জাতিসত্তার উদ্ভব আর্য জাতিগোষ্ঠী থেকে। এ জন্য বাঙালিদের ইন্দো-আর্য জাতিগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আবার বাঙালি নৃগোষ্ঠীর সংকর পরিচয়ও রয়েছে কারণ এই নৃগোষ্ঠীর মধ্যে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়দের বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা যায়। ফলে বাঙালির মুখের ভাষা বাংলায় ইন্দো-আর্য ভাষার পাশাপাশি অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষার মিশ্রণও রয়েছে। আর অন্যান্য যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো আছে তাদের উদ্ভব বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী থেকে। প্রায় প্রতিটি নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব কথ্য ভাষা ও বর্ণমালা রয়েছে।

বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর পাশাপাশি বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি পুষ্ট হয়েছে এসব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর ভাষা ও সংস্কৃতির মিশেলে। ২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী আমাদের দেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা ৫০টি। জনসংখ্যা ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার ১৫৯, যা এদেশের মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ এই প্রতিবেদন অনুযায়ী এদের মধ্যে সংখ্যায় চাকমারাই এগিয়ে, ৪ লক্ষ ৮৩ হাজার ২৯৯। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে আছে মারমা ও ত্রিপুরা। সংখ্যা যথাক্রমে ২ লক্ষ ২৪ হাজার ২৬২ ও ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৫৭৮। আর সংখ্যায় সবচেয়ে কম ভিল জনগোষ্ঠী, মাত্র ৯৫ জন।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর বসবাস পাহাড় ও সমতলে, বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, সিলেট ও রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন জেলায়। জেলার নিরিখে তাদের সংখ্যা রাঙামাটিতেই সবচেয়ে বেশি, ৩ লক্ষ ৭২ হাজার ৮৬৪। খাগড়াছড়ির অবস্থান দ্বিতীয়। এখানে বসবাস করেন বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ৩ লক্ষ ৪৯ হাজার ৩৭৮ জন। আর বিভাগ অনুযায়ী চট্টগ্রামে ৯ লক্ষ ৯০ হাজার ৮৬০, রাজশাহীতে ২ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫৯২, সিলেটে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৫৯৪, রংপুরে ৯১ হাজার ৭০, ঢাকায় ৮২ হাজার ৩১১, ময়মনসিংহে ৬১ হাজার ৫৫৯, খুলনায় ৩৮ হাজার ৯৯২ ও বরিশালে ৪ হাজার ১৮১ তবে সমতলে সাঁওতাল নৃ-গোষ্ঠীর জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যাই বেশি। ২০২২ এর জনশুমারি অনুযায়ী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নারীর সংখ্যা ৮ লক্ষ ২৫ হাজার ৪০৮ এবং পুরুষের সংখ্যা ৮ লক্ষ ২৪ হাজার ৭৫১ জন।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংবিধান ও আইনে প্রতিটি নৃগোষ্ঠীর জন্য নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে সমান মর্যাদা ও অধিকারের এবং একই সাথে অঙ্গীকার করা হয়েছে, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর সংস্কৃতি-ঐতিহ্য রক্ষা ও সংরক্ষণে রাষ্ট্র কর্তৃক বিশেষ দায়িত্ব পালনের। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৩(ক) তে বলা হয়েছে: 'রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।' কিন্তু তারপরও নানা কারণে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো বৃহত্তম নৃগোষ্ঠী বাঙালিদের তুলনায় আর্থ-সামাজিকভাবে অনেক পিছিয়ে। এর ফলে মূল ধারার শিক্ষাব্যবস্থা থেকেও বঞ্চিত তারা। কার্পে ফাউন্ডেশন নামের একটি বেসরকারি সংস্থা ২০১৯ সালে জানিয়েছিলো, পাহাড়ের চেয়ে সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে দারিদ্র্যের হার বেশি। পাহাড়ে ৬৫ শতাংশ আর সমতলে এই হার ৮০ শতাংশ। তবে এরও আগে দারিদ্র্যের এই হার ছিলো আরো অনেক বেশি।

সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশের এনজিও-এমএফআই সেক্টর বিগত কয়েক দশক ধরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে দারিদ্র্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বিশেষ করে অনেকগুলো এনজিও নানামুখী প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর জন্য আয়ের উৎস সৃষ্টি করার পাশাপাশি তাদের বিভিন্ন নাগরিক অধিকার অর্জনের জন্যও নিভৃতে কাজ করে যাচ্ছে। বুরো বাংলাদেশও এনজিও-এমএফআই সেক্টরের এই প্রচেষ্টার অংশীদার। বহুমাত্রিক আর্থিক সেবা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি অনগ্রসর ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর নারী-পুরুষের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে এই উন্নয়ন সংস্থাটি এগিয়ে গেছে বহুদূর। তাছাড়া ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের কৃষিঋণের আওতায় এনে ফসল উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনার পেছনে বুরো বাংলাদেশের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আগেই উল্লেখ করেছি, সরকারি হিসেবে বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা ৫০টি। পাঠকের সুবিধার্থে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত তালিকাটি এই লেখার শেষাংশে সংযুক্ত করা হয়েছে। দেশের এই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের সমকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থা সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রত্যয়ের পাঠকদের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যেই এই 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সংখ্যা' প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তব সম্মত কারণেই প্রতিটি নৃগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় পৌঁছে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তারপরও প্রত্যয়ের উপদেষ্টা সম্পাদক ও বুরো বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন এর অকৃত্রিম আগ্রহ ও দিকনির্দেশনায় আমরা চেষ্টা করেছি পাহাড় ও সমতলের বেশ কিছু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রকৃত আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলে আনতে। একই সাথে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অবদান ও উৎকর্ষ নিয়ে বেশ কিছু লেখা স্থান পেয়েছে প্রত্যয়ের এই সংখ্যায়। আমরা বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতেও দেশের অনগ্রসর এই নাগরিক গোষ্ঠীদের নিয়ে আরো কাজ করার সুযোগ আমাদের থাকবে।

বাংলাদেশের ৫০টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: ওঁরাও, কোচ, কোল, খাসিয়া/খাসি, খিয়াং, খুমি, গারো, চাক, চাকমা, ডালু, তঞ্চঙ্গা, ত্রিপুরা, পাংখোয়া/পাংখো, বম, বর্মণ, মণিপুরী, মারমা, পাহাড়ি/মালপাহাড়ি, মুন্ডা, ম্রো, রাখাইন, লুসাই, সাঁওতাল, হাজং, মাহাতো/কুর্মি মাহাতো/বেদিয়া মাহাতো, কন্দ, কড়া, গঞ্জু, গড়াইত, গুর্খা, তেলী, তুরি, পাত্র, বাগদী, বানাই, বড়াইক/বাড়াইক, বেদিয়া, ভিল, ভূমিজ, ভূঁইমালী, মালো/ঘাসিমালো, মাহালী, মুসহর, রাজোয়ার, লোহার, শবর, হুদি, হো, খারিয়া/খাড়িয়া, খারওয়ার/ খেড়োয়ার।■

● তথ্যসূত্র: উইকিপিডিয়া, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বাংলাদেশ গেজেট (এসআরও ৭৮-আইন/২০১৯) ও দৈনিক প্রথম আলো।

জাকির হোসেন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী | বৃদ্ধি পাচ্ছে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

আয়তনের দিক থেকে ছোট হলেও বাংলাদেশ ভূমি গঠনশৈলীতে যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনি নানাবিধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের লীলাভূমি। এখানে যেমন বয়ে চলেছে সহস্রাধিক নদী-নালা, রয়েছে বিশাল বিশাল হাওড়-বাওর, একই সাথে আছে পাহাড়-পর্বতের সমাহার। আছে পৃথিবীর দীর্ঘতম অখণ্ডিত সমুদ্র সৈকত, সেন্টমার্টিনসহ অনেক দ্বীপ। রয়েছে প্রায় ১০ হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তনের পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন।

জাকির হোসেন

এদেশের মোট জনসংখ্যা সাড়ে ১৬ কোটি। এর মধ্যে বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও আরো ৫০ সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাস। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা এই নৃগোষ্ঠীরা আলাদা আলাদাভাবে সংখ্যায় অল্প হলেও তাদের মোট সংখ্যা প্রায় ১৭ লাখ। তাদের চেহারা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আচার ব্যবহার, জীবন-জীবিকা, সংস্কৃতি ও ভাষার ভিন্নতা বিদ্যমান। বিভিন্ন ভাষাভাষী, ধর্ম বর্ণের জাতি-গোষ্ঠীর মানুষ দেশপ্রেমের গভীর আবাহনে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে একই মৃত্তিকায় সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সাথে হাজার হাজার বছর ধরে বাস করে আসছে। বাঙালি সংস্কৃতি ছাড়াও এদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্র্যময় এসব সংস্কৃতি ও নানা উৎসব আয়োজন জাতীয় সংস্কৃতিকে আরো সমৃদ্ধ ও বর্ণিল করেছে। বাংলাদেশকে করেছে বহু ফুলের সমন্বয়ে একটি সমৃদ্ধ বাগান। এটি ঠিক যে কোনো বাগানে একটি ফুলের বাহার যতোটা না বাগানকে সমৃদ্ধ ও সুন্দর করে বহু ফুলের বিচিত্র সমাহার সেই বাগানকে অনেক আলোকিত করে তোলে। স্বাভাবিকভাবেই এ সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উপস্থিতি বাংলাদেশকে করেছে অনেক সুন্দর, অনেক বৈচিত্র্যময়।

রাষ্ট্রীয় ও ভূখণ্ডগত জাতীয়তাবাদে এ দেশের সকল নাগরিক বাংলাদেশি এবং রাষ্ট্রের সকল সুযোগ-সুবিধায় প্রত্যেক নাগরিকেরই রয়েছে সমান অধিকার। সেই বিবেচনায় ৫০টি ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীকেও রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও নিরাপত্তার দায়িত্বও রাষ্ট্র ও সরকারের। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এ দেশের এই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের অনেক সদস্যই আর্থ-সামাজিক দিক থেকে যেমন শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে। এমনকি সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন উদ্যোগ সত্ত্বেও তাদের অনেকেই এখনো মানবেতর জীবন যাপন করছে। এসব দুরবস্থা থেকে তাদের উন্নয়নের পথে যুক্ত করতেই সরকারের উন্নয়ন উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন খাতের অনেক প্রতিষ্ঠান এই পিছিয়ে থাকা সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের আত্মকর্মসংস্থান, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে যাচ্ছে। এর ফলে এই নৃগোষ্ঠীসমূহের অনেকেরই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে। এভাবে কাজের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে দেশের পিছিয়ে পড়া এ সকল নৃগোষ্ঠী উন্নয়ন ধারা মূল স্রোতের সাথে বেগবান হতে সক্ষম হবে– যা বলার অপেক্ষা রাখে না।

উল্লেখ্য, দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকাংশই পার্বত্য চট্টগ্রাম, বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, পটুয়াখালী, কক্সবাজার, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে বসবাস করে। এদের মধ্যে চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা, মারমা, ম্রো, খেয়াং, খুমী, চাক, বম, লুসাই, পাংখোয়া, ত্রিপুরা, রাখাইনসহ বেশ কিছু নৃগোষ্ঠী পার্বত্য অঞ্চলে বাস করে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে বাস করে গারো, কোচ, বর্মণ ও হাজং সম্প্রদায়। সিলেট অঞ্চলে মনিপুরী, ত্রিপুরা ও খাসিয়ারা। রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে ছোট-বড় ২১টি নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী আছে। এর মধ্যে সাওতাল, ওরাওঁ, কোল, মুন্ডারা উল্লেখযোগ্য। এদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা জাতিগত সমস্যা থাকলেও একটি অভিন্ন সমস্যা হচ্ছে– শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা এবং কর্মসংস্থানের অভাব। বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলে অনেক স্থানেই কাছাকাছি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান না থাকায় তারা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

দেশের এ সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর রয়েছে নিজস্ব ঐতিহ্যমণ্ডিত ও স্বতন্ত্র সমৃদ্ধ কৃষ্টি, ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান যা বংশ পরম্পরায় অদ্যাবধি তারা লালন করে আসছে। নৃতাত্ত্বিক এই জনগোষ্ঠীসমূহের সাথে অতীতে দেশের মূল জনগোষ্ঠীর একটা দূরত্ব ছিল। বর্তমানে শিক্ষা, সামাজিকতা, রাজনীতি ও কর্ম সুবাদে সেই দূরত্ব কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। দেশের এ সকল নৃগোষ্ঠীর কেউ কেউ সরকারের সচিব হিসেবেও দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছেন। শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটায় তাদের মধ্যে অনেক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, শিক্ষক, ব্যাংকার, বেসরকারি উন্নয়ন খাতের কর্মী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যেও এখন তারা কর্মমুখর– অর্থাৎ রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে তারা জাতি গঠনমূলক কাজে ভূমিকা পালন করছে।

তারপরও এ সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অনেকেই দেশের অন্যান্য এলাকার দরিদ্র মানুষের মতো আর্থ-সামাজিকভাবে অনেকটা পিছিয়ে। বিশেষ করে অর্থ, শিক্ষা, কর্মোদ্যোগ ও পরামর্শের অভাবে অনেকেই আর্থিক কার্যক্রম থেকে এখনো বঞ্চিত। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে মেধাবী ছেলে মেয়েরাও পড়াশোনা থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। সেক্ষেত্রে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি মিশনারী চার্চসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি উন্নয়ন খাতের অনেক সংগঠনই সরাসরি কাজ করছে। লক্ষ্যণীয় বিষয়, অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলে কর্মস্থল থেকে গভীর জঙ্গলে দুর্গম এলাকায় ১৫-২০ কিলোমিটার দূরে গিয়েও উন্নয়ন কর্মীরা তাদের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে। এতে অনেকেই উপকৃত হচ্ছেন। তাদের আত্মকর্মসংস্থানসহ কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। উদ্যোক্তা হিসেবেও উঠে আসছেন অনেকে। আর তাদের কাছাকাছি থাকার সুবাদে গড়ে উঠছে পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক। বাংলাদেশের অভিন্ন জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত হয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নে একতাবদ্ধ হয়ে কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাদের এই কর্মমুখিনতা, উন্নয়ন, শিক্ষা ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের ফলে দেশের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পর্ক দিন দিনই নিবিড় হচ্ছে। যা ভবিষ্যতে আরো অধিক হবে বলে আশা করা যায়।

দেশের পিছিয়ে থাকা এই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও তাদের উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগের সাথে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার অনেক সংগঠনই কাজ করছে। এর ফলে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কতোটা উন্নয়ন হয়েছে, তাদের বর্তমান সমস্যা ও সম্ভাবনা কি এসব বিষয় সরেজমিন পর্যবেক্ষণ এবং তা নিয়ে প্রতিবেদন করার উদ্দেশে প্রত্যয় টিমের সদস্যরা দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়েছেন। নৃগোষ্ঠীসমূহের সকলের সাথে কথা বলা সম্ভব না হলেও কথা বলেছেন তাদের অনেকের সাথেই। তাদের সাথে সরাসরি কথা বলে প্রত্যয়ে যে প্রতিবেদন তুলে ধরা হলো, আশা করি তা আগামী দিনের সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনের কার্যক্রম ও পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্ব পাবে– দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়নে রাখবে ফলপ্রসূ ভূমিকা।■

● নির্বাহী পরিচালক, বুরো বাংলাদেশ

নিবন্ধ

ড. ফাতিমা ইয়াসমিন

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমকালীন জীবন ও সংস্কৃতি

বাংলাদেশ জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের দেশ। এখানে বৃহত্তর বাঙালি নৃ-গোষ্ঠীর সাথে সাথে আবহমান কাল থেকেই বসবাস করছে চুয়ান্নটিরও বেশি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী। যাদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি। অর্থাৎ জীবনযাপন করার নিজস্ব পদ্ধতি, আচার- প্রথা এবং বিশ্বাস ব্যবস্থা। বাংলা ভাষার সাথে সাথে এখানে রয়েছে আরও ৩৫টি ভাষা, প্রায় প্রতিটি ভাষারই রয়েছে নিজস্ব বর্ণমালা।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বলতে এমন একটি জনগোষ্ঠীকে বোঝায় যারা একটি অঞ্চলে বসবাস করে, যাদের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র একটি সংস্কৃতি রয়েছে এবং যারা নিজেদের আলাদা মনে করে। নৃতাত্ত্বিকভাবে নৃ-গোষ্ঠী বলতে এমন একটি জনসমষ্টিকে বোঝায় যারা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সংগঠিতভাবে বসবাস করে, যাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে যা অন্য জাতিগোষ্ঠী থেকে পৃথক। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অধিবাসীরা তাদের আদিবাসী পরিচয় দিতেই বেশি স্বাচ্ছন্দবোধ করে। আদিবাসী সজ্ঞাটিও তাদের জীবনধারার সাথে মানানসই।

বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তবে অপেক্ষাকৃত প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাদের ঘনত্ব বেশি। ভৌগলিক অবস্থান অনুসারে বাংলাদেশের এই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে সমতল এবং পাহাড়ি নৃ-গোষ্ঠী হিসেবে বর্ণনা করা হয়। সাঁওতাল, গারো, হাজং, কোচ, ওঁরাও, মুন্ডা, রাজবংশী, মালো, মাহাতো, মাহালী, বর্মণ, মণিপুরী, খাসীয়া, পাত্র, কোল, ডালু, রাখাইন প্রভৃতি গোষ্ঠীগুলো সমতলীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত। এরা সাধারণত দেশের উত্তর-পূর্ব (সিলেট, সুনামগঞ্জ), উত্তর-(নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, শেরপুর, জামালপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড়), উত্তর-পশ্চিম (রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, জয়পুরহাট), পশ্চিম (নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর) এবং দক্ষিণের কিছু জেলায় (বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা) বসবাস করেন। অন্যদিকে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের পার্বত্য অঞ্চলে (চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কুমিল্লা, চাঁদপুর, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবন) পাহাড়ি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অধিবাসীরা বসবাস করে। চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, পাঙ্খো, খিয়াং, খুমি, ম্রো, লুসাই প্রভৃতি পাহাড়ি নৃ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

২০১১ আদমশুমারি অনুসারে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগুলোর জনসংখ্যা ১৫,৮৬,১৪১ জন। এই শুমারি অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যার ১.১৩ শতাংশ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অন্তর্গত। পরিসংখ্যান অনুযায়ী চাকমা নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যা সর্বাধিক (৪,৪৪,৭৪৮ জন)। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে মারমা নৃ-গোষ্ঠী। এদের সংখ্যা ২,০২,৯৭৪ জন (সূত্র: আদমশুমারি ২০১১)।

বাংলাদেশের প্রতিটি নৃ-গোষ্ঠী স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এদের প্রত্যেকের ভাষা, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, ঐতিহ্য এককথায় সামগ্রিক জীবনধারা অপরাপর জনগোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র। এরা সাধারণত কৃষি, পশুপালন এবং কুটির শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করে জীবিকা নির্বাহ করে। কিছু নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক ও পিতৃসূত্রীয়, আবার কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক ও মাতৃসূত্রীয় পরিবার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। প্রত্যেক নৃ-গোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অনুশাসন মেনে চলে।

সাঁওতাল : বাংলাদেশের অন্যতম ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নাম সাঁওতাল। ভারতের সাঁওতাল পরগনার অধিবাসী হওয়ায় এ নামকরণ হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে বাস করার পর ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৬ সালে সাঁওতালদের স্থায়ী এলাকা নির্ধারণ করে দেয়। সাঁওতালরা ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম অধিবাসী।

নৃতাত্ত্বিকদের ধারণা, সাঁওতালরা আদি অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীভুক্ত। এদের চেহারা কালো, নাক চ্যাপ্টা, ঠোঁট মোটা, চুল কোঁকড়ানো এবং দেহের

উচ্চতা মাঝারি ধরনের। এজন্য এদেরকে প্রাক-দ্রাবিড়ীয় বলেও মনে করা হয়। সাঁওতালরা ১২টি গোত্রে বিভক্ত। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় দুই লক্ষের বেশি সাঁওতাল বসবাস করেন। এদের মূল আবাসস্থল রাজশাহীর বরেন্দ্র অঞ্চল। অর্থাৎ রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জে অধিকাংশ সাঁওতাল নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস। বগুড়া, রংপুর, পাবনা, ময়মনসিংহ এবং বৃহত্তর সিলেট জেলায়ও সাঁওতালদের বসবাস রয়েছে। সিলেট অঞ্চলের চা-বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের একটি অংশ সাঁওতাল নৃ-গোষ্ঠীর অন্তর্গত বলে মনে করা হয়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চল থেকে বাংলাদেশে বনজঙ্গলের পতিত জমিতে সাঁওতালরা বসবাস ও চাষাবাদ শুরু করে। সাঁওতালদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। এ ভাষা দুটি উপভাষায় বিভক্ত– ক. কারমেলি ও খ. মাহলেস। ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে, সাঁওতাল ভাষা মুন্ডারী ভাষার উপভাষা। আবার নৃবিজ্ঞানী হডসন মনে করেন, কোল ভাষার উপভাষা হচ্ছে সাঁওতাল ভাষা। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ প্রধানত হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী। সনাতন ধর্মে বিশ্বাসীরা হিন্দুধর্মের রীতিনীতি ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। অন্যরা খ্রিস্টান ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। সাঁওতালদের প্রধান গ্রামদেবতার নাম 'মারাংক্রুরো'। সাঁওতালদের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত। পিতাই পরিবারের প্রধান। সাঁওতালদের মধ্যে বর্তমানে একক বা অণুপরিবার লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে একক বিবাহ প্রচলিত। সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। তবে বিবাহ বিচ্ছেদ (তালাক) এবং একাধিক বিবাহ প্রচলিত আছে। ভাত সাঁওতালদের প্রধান খাদ্য। ভাতের সাথে ডাল এবং শাকসবজি তারা খায়। উৎসব-অনুষ্ঠান এবং নৃত্যের সময় তারা চাউল থেকে তৈরি 'হাড়িয়া' নামক মদ পান করে। সাঁওতাল মেয়েরা সাধারণত কাঁধের ওপর জড়িয়ে শাড়ি পরে। মেয়েরা হাতে রাং, লোহা কিংবা শাঁখের বালা পরে। পুরুষেরা লুঙ্গি পরে। কোনো কোনো পুরুষ গলায় মালা ও হাতে বালা ব্যবহার করে। সাঁওতাল অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। ভূমিহীন হওয়ার কারণে ৯০ শতাংশ সাঁওতাল কৃষিশ্রমিক হিসেবে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করে। মহিলা-পুরুষ উভয়ই মাঠে কাজ করে।

গারো (মান্দি) : নৃ-গোষ্ঠী হিসাবে গারোদের নামকরণ নিয়ে মতভিন্নতা রয়েছে। একটি মত অনুসারে, গারো পাহাড়ের নামানুসারে 'গারো' নামকরণ করা হয়। অন্য মতে বলা হয়েছে, গারো নৃ-গোষ্ঠীর নামানুসারে 'গারো পাহাড়' নামকরণ হয়েছে। গারোরা নিজেদেরকে মান্দাই/মান্দি নামে পরিচয় দিয়ে থাকে। গারো ভাষায় মান্দি অর্থ মানুষ। গারো গোষ্ঠী দুই শ্রেণিভুক্ত; যথা- ক. অচ্ছিক গারো বা পাহাড়ি গারো ও খ. লামদানি বা সমতলীয় গারো। বাংলাদেশে প্রধানত লামদানি গারোরা বাস করে। গারোরা ভারতের আসাম প্রদেশের আদি বাসিন্দা। গারোদের মধ্যে মঙ্গোলয়েড নৃ-গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এদের শরীর লোমহীন, মুখমণ্ডল গোলাকার, নাক প্রশস্ত ও চ্যাপ্টা, প্রায় দাড়িবিহীন; ঠোঁট মোটা, ভুরু; কপাল ক্ষুদ্রাকৃতির, চুল কালো, সোজা ও ঢেউ খেলানো; গায়ের রঙ ফর্সা। গারোদের ভাষার নামও মান্দি বা গারো ভাষা। এ ভাষার মধ্যে বাংলা ও আসামি ভাষার মিশ্রণ রয়েছে। এদের ভাষা মূলত সিনো-টিবেটান ভাষার অন্তর্গত, যা বোডো বা বরা ভাষা উপগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এ ভাষার নিজস্ব কোনো লিপি বা অক্ষর নেই। ফলে এ ভাষার লিখিত কোনো রূপ নেই। বাংলাদেশের গারোরা বাংলা হরফে লিখে থাকে। বাংলাদেশের গারো পাহাড়ের পাদদেশে ময়মনসিংহ জেলার নালিতাবাড়ি, হালুয়াঘাট, কলমাকান্দা, দুর্গাপুর, শ্রীবর্দী এলাকায় লামদানি শ্রেণির গারো বাস করে। এছাড়া টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর পাহাড়ি অঞ্চলেও অনেক গারোর বসবাস রয়েছে।

গারো পরিবার মাতৃস্থানীয়। পরিবারের সকল কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা মাতা বা স্ত্রীর হাতে ন্যস্ত থাকে। সে কারণে গারো পরিবারে মা পরিবার প্রধান ও বাবা পরিবারের ব্যবস্থাপনা প্রধান। এ সমাজে উত্তরাধিকার মাতৃধারায় মা থেকে মেয়েতে বর্তায়। এখানে মাতৃবাস রীতি অনুসরণ করা হয়। বিয়ের পর গারো দম্পতি স্ত্রীর মায়ের বাড়িতে বসবাস করে। গারো সম্প্রদায়ে একক বিবাহভিত্তিক পরিবার বিদ্যমান। বাংলাদেশে বসবাসরত গারো সম্প্রদায়ের প্রায় শতকরা ৯৮ ভাগ ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান। গারোদের ঐতিহ্যগত ধর্মের নাম সাংসারেক। এরা ঐতিহ্যগতভাবে সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী। তারা অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস করে, যাকে 'মাইতে' বলে উল্লেখ করা হয়। গারোদের প্রধান পূজার নাম 'ওয়ানগালা'।

গারো গোষ্ঠী মাতৃসূত্রীয় ব্যবস্থা অনুসরণ করে। তাদের সর্ববৃহৎ পরিসরের মাতৃসূত্রীয় গোত্রের নাম চাটচি, যার অর্থ জ্ঞতি বা আত্মীয়-স্বজন। যারা এই গোত্রভুক্ত তারা সবাই একে অন্যের সাথে মাতৃসূত্রীয় রীতিতে সম্পর্কযুক্ত। গারোদের প্রধান খাদ্য ভাত, সবজি ও ফলমূল। মেয়েরা ঐতিহ্যবাহী পোশাক হিসেবে 'দকমান্দা' পরে থাকে আর ছেলেরা লুঙ্গি পরে। গারো অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের মধ্যে ধান, নানা প্রকার সবজি ও আনারস অন্যতম। তাছাড়া, জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করেও তারা অর্থ উপার্জন করে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই হাটবাজারে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করে। গারো নৃ-গোষ্ঠী শতভাগ শিক্ষিত। শিক্ষিত গারোরা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হওয়ায় তাদের মধ্যে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মণিপুরি : সাধারণত মণিপুর রাজ্যের অধিবাসীদেরকে 'মণিপুরি' বলা হয়। ভারতের আসাম সংলগ্ন 'মণিপুর' রাজ্য থেকে উদ্বাস্তু হয়ে ১৭৫৬, ১৭৫৮ এবং ১৮৯১ সালে মণিপুরি সম্প্রদায়ের লোকেরা বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। লোককথায় প্রচলিত আছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে মণিপুর রাজ্যের এক রাজপুত্র মণিপুর থেকে পালিয়ে সফরসঙ্গীসহ সিলেটে চলে আসেন। ধারণা করা হয় যে, এরাই হচ্ছে বাংলাদেশের বর্তমান মণিপুরিদের পূর্বপুরুষ। এদেরকে আদি-মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়। ধারণা করা হয় যে, মণিপুরিরা ভারতের আসাম রাজ্যের কুকি জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত। মণিপুরিদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। মণিপুরি ভাষার দুটি উপবিভাগের একটি হচ্ছে বিষ্ণুপ্রিয়া, অপরটি হচ্ছে মৈতৈ ভাষা। বিষ্ণুপ্রিয়ার সাথে অহমিয়া, উড়িয়া বাংলা ভাষার সাদৃশ্য রয়েছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার নিজস্ব বর্ণলিপি আছে। তবে উৎপত্তিগত দিক থেকে এটি মাগধি-প্রাকৃত থেকে আগত। মৈতৈ মণিপুরিদের ব্রহ্মীয় ভাষার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। মণিপুরিরা হিন্দুধর্মের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়ে তারা পূজা করে থাকে। সাধারণত তাদের মন্দিরে শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ, শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেব এবং শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গের মূর্তি দেখা যায়। বাংলাদেশের মণিপুরি সম্প্রদায় সিলেটের তামাবিল, মৌলভীবাজারের ভানুগাছ এবং হবিগঞ্জের আসামপাড়া এলাকায় বসবাস করে।

মণিপুরিদের মধ্যে বহিঃগোত্র বিবাহ প্রচলিত আছে। বাল্যবিবাহের প্রচলন নেই। তবে তালাক ও বিধবা বিবাহের প্রচলন রয়েছে। মণিপুরিদের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক এবং পিতৃসূত্রীয় পরিবার ব্যবস্থা প্রচলিত। এদের মধ্যে একক বা অনুপরিবার বেশি পরিলক্ষিত হয়। মণিপুরীদের লোকসংস্কৃতি সমৃদ্ধ। বিশেষ করে মণিপুরি নৃত্য ও সঙ্গীত জাতীয়ভাবে সমাদৃত। মণিপুরিদের প্রধান খাদ্য ভাত। তা ছাড়া মাছ ও শাকসবজি তাদের খাদ্য তালিকায় থাকে। মণিপুরিরা নিজেদের পোশাক নিজেরা তৈরি করে। এদের অর্থনীতি কৃষির ওপর নির্ভরশীল। নারী-পুরুষ উভয়ই কৃষিক্ষেতে কাজ করে। নারী-পুরুষ সবাই কৃষিকাজে দক্ষ। কৃষিকাজ ছাড়াও তারা কাপড় বোনা ও তাঁত পরিচালনায় পারদর্শী। বর্তমানে তাদের আচার-আচরণ ও রীতিনীতিতে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে এবং এ সমাজে সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাখাইন : মায়ানমারের আরাকান অঞ্চল থেকে রাখাইনরা বাংলাদেশে এসেছিল। রাখাইন শব্দের উৎপত্তি পালি ভাষা থেকে। এ ভাষায় 'রাখাইন' শব্দের অর্থ হলো রক্ষণশীল অর্থাৎ যারা নিজেদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, পরিচয় ইত্যাদিকে সংরক্ষণ করতে সচেষ্ট থাকে। ১৭৮৪ সালে বার্মিজ রাজা 'বোদোপ্রা' আরাকান রাজ্য জয় করলে বিপুলসংখ্যক রাখাইন সেখান থেকে পালিয়ে বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলা পটুয়াখালী এবং কক্সবাজারে আশ্রয় নেয়। রাখাইনরা মঙ্গোলীয়দের ভোটবার্মি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। রাখাইনদের

মুখমণ্ডল গোলাকার, নাক বোঁচা, চুল কালো এবং দেহের রঙ হালকা বাদামি ও উচ্চতায় খাটো। রাখাইনদের ভাষা ভোটবার্মি দলের ভাষার অন্তর্ভুক্ত। উত্তর ভারতের আদি ব্রাহ্মীলিপি থেকে রাখাইন বর্ণমালার উৎপত্তি। প্রায় ছয় হাজার বছর আগে পাথরে খোদাই করা শিলালিপিতে রাখাইন বর্ণমালা পাওয়া গেছে। যা প্রথম রাখাইন বর্ণমালার দলিল হিসেবে ধারণা দেয়। বাংলাদেশের কক্সবাজার, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় তাদের বসবাস।

রাখাইনরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। ধর্মীয় এবং ভাষাগত জ্ঞানের জন্য বৌদ্ধ মন্দিরে যায়। গৌতম বুদ্ধের জন্মবার্ষিকী ও প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপন রাখাইন অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বাইরে রাখাইনদের নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব রয়েছে। রাখাইনদের সবচেয়ে বড় উৎসব হচ্ছে জলকেলি উৎসব। বিবাহ রাখাইন সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সাধারণত অভিভাবকেরাই বিবাহ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকেন। যৌতুক প্রথা রাখাইন সমাজে নিষিদ্ধ। রাখাইন পরিবার ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। পিতাই পরিবারের প্রধান। পরিবারে নারী-পুরুষ প্রত্যেকেরই সমান অধিকার রয়েছে। পুত্র এবং কন্যা উভয়েরই পৈতৃক সম্পত্তিতে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে।

রাখাইনরা সাধারণত ভাত, মাছ, ডাল এবং শাকসবজি খেয়ে থাকে। শূকর এবং শুটকি মাছ তাদের প্রিয় খাবার। রাখাইন পুরুষেরা সাধারণত লুঙ্গি ও ফতুয়া পরে থাকে। রাখাইনরা বিভিন্ন ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে মাথায় পাগড়ি পরে। রাখাইন নারীরা নকশাকৃত লুঙ্গি এবং ব্লাউজ পরে।

শিল্পকলা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাখাইনদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে। স্থাপত্যকলা, চারু ও কারুকলা, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, নাটক, সঙ্গীত, নৃত্যকলা ইত্যাদিতে রাখাইন জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য সমৃদ্ধ। নদীর তীরবর্তী অঞ্চল ও সমুদ্র উপকূলের সমতল ভূমিতে রাখাইনরা বসবাস করে। নিচে খালি রেখে উঁচুভিত বা মাচার ওপর ঘর নির্মাণ করে তারা বসবাস করে। রাখাইনদের প্রধান পেশা কৃষি ও মৎস্য শিকার। এছাড়া তারা ব্যবসা-বাণিজ্য, তাঁত বুনন, নৌকা নির্মাণ ও অন্যান্য কারিগরি পেশার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। হস্তচালিত তাঁত থেকে কাপড় বোনার কাজে রাখাইনরা দক্ষ। রাখাইনরা লবণ এবং গুড় তৈরি করে। কৃষিকাজে রাখাইন নারী-পুরুষ উভয়েই অংশগ্রহণ করে থাকে।

চাকমা : এই জনগোষ্ঠী নিজেদের 'চাঙমা'-নামে পরিচয় দিতে পছন্দ করে। চাকমা লোককাহিনিতে বলা হয়, এক চাকমা রাজপুত দেশজয়ের উদ্দেশ্যে চম্পকনগর থেকে মায়ানমারের আরাকানে গমন করেন এবং নবম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত আরাকানের বেশকিছু অঞ্চল চাকমারা শাসন করেন। পরে স্থানীয় আরাকানীদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে প্রথমে চট্টগ্রাম জেলায় এবং পরে আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে তারা বসতি স্থাপন করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে আগমনের পর চাকমারা তুলা চাষের মাধ্যমে প্রথমে মুঘল-সরকার ও পরে ব্রিটিশ-সরকারের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। ব্রিটিশ আমলেই চাকমাসহ পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত নৃ-গোষ্ঠীসমূহ পুরোপুরি কেন্দ্রীয় ব্রিটিশ সরকারের শাসনাধীনে আসে। চাকমারা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় বসবাস করে। বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে চাকমা সর্ববৃহৎ। চাকমাদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার লক্ষ (২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ৪,৪৪,৭৪৮ জন)। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে চাকমাদের লিপিতে আরাকানী অক্ষরের প্রাধান্যই বেশি পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে তারা ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষায় কথা বলে। চাকমা ভাষার নিজস্ব লিখিত লিপি রয়েছে। চাকমাদের মধ্যে মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। তারা উচ্চতায় মাঝারি থেকে বেঁটে। তবে কারো কারো উচ্চতা লম্বাকৃতির। দৈহিক গড়নে বেশ শক্তিশালী ও সুঠাম।

চাকমা পরিবার পিতৃতান্ত্রিক ও পিতৃসূত্রীয়। ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব পিতা, স্বামী বা অন্য কোনো বয়স্ক পুরুষের হাতে ন্যস্ত থাকে। সম্পত্তি ও বংশমর্যাদার উত্তরাধিকার পিতা থেকে পুত্রের ওপর বর্তায়। সাধারণত চাকমাদের মধ্যে নিজ বংশে সাত পুরুষের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ। চাকমা সমাজে অন্তর্বিবাহ ও বহির্বিবাহের প্রচলন রয়েছে। চাকমা যুবকরা সাধারণত নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ে করে থাকে। তবে অন্য সম্প্রদায়ের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তেমন কোনো নিষেধ নেই। বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা চাকমা সমাজে বিরল।

চাকমা অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক ও জুমচাষ নির্ভর ছিল। জুম চাষ নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে তারা সেচ কৃষিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। চাকমাদের প্রধান খাদ্য ভাত। তা ছাড়া মাছ, মাংস, ফলমুল, ডাল ইত্যাদি তারা খেয়ে থাকে। স্থানীয়ভাবে তৈরিকৃত মদ চাকমাদের অন্যতম সামাজিক পানীয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের চাকমা সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত। চাকমা সমাজের প্রধান হলেন সার্কেল প্রধান বা চাকমা রাজা। চাকমা পুরুষেরা ধুতি ও ঘরে-বোনা কোট পরিধান করে। মাঝেমধ্যে পাগড়া (খাবাং) পরে। মেয়েরা 'পিনধান', 'খাদি' ও কখনও কখনও খাবাং এবং শাড়ি-ব্লাউজও পরে থাকে।

চাকমারা প্রধানত বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। তাদের বৌদ্ধমন্দিরের নাম ক্যাং। তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব মাঘি পূর্ণিমা আড়ম্বরের সাথে পালন করা হয়। এছাড়াও তাদের প্রধান সামাজিক-সাংস্কৃতিক উৎসব কঠিন চিবর দান অনুষ্ঠানে পার্বত্য অঞ্চলের অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ অংশগ্রহণ করে। এই জনগোষ্ঠীর মানুষজন ব্যাপকভাবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। শিক্ষার সম্প্রসারণের ফলে সামাজিক সচলতার হার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

মারমা : 'স্রাইমা' শব্দ থেকে মারমা শব্দটির উৎপত্তি। মারমারা 'মগ' নামেও পরিচিত। মারমারা মূলত রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় বসবাস করে। মারমাদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে বার্মিজ সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে। মারমারা লেখালেখির ক্ষেত্রে বার্মিজ বর্ণমালা ব্যবহার করে। মারমাদের ভাষা তিব্বত-বার্মা ভাষাসমূহের অধীনে বার্মা-আরাকান শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। মারমারা বার্মিজ ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে থাকে। তাদের নববর্ষ উদযাপনের অনুষ্ঠানকে সাংগ্রাই বলা হয়। মারমারা মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত। তারা মূলত মায়ানমারের আরাকানিদের বংশধর। মারমা সম্প্রদায়ের গয়ের রঙ হলদে ফর্সা, উচ্চতা তুলনামূলকভাবে খাটো, নাক বোঁচা, কালো চুল ও ছোট চোখ। ১৪ থেকে ১৭ শতকে বার্মিজরা আরাকান জয় করলে মারমারা আরাকান থেকে বিতাড়িত হয়। তখন তারা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে। মায়ানমারের প্রাচীন পেগুসিটি হলো মারমা সম্প্রদায়ের আদি বাসস্থান।

মারমাদের পরিবার ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। মারমা পরিবারের প্রধান পিতা হলেও পারিবারিক কাজকর্মে মাতার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। পরিবারের সবচেয়ে বয়স্ক পুরুষটি মারমা পরিবারের প্রধান হিসেবে ভূমিকা পালন করে। মারমা পরিবার সাধারণত একক পরিবার। পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারে ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই সমান অধিকার রয়েছে। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে তারা প্রাচীন বার্মিজ প্রথা অনুসরণ করে যাকে 'থামোতাদা' বলা হয়। মারমা সম্প্রদায়ে সাধারণত একবিবাহ ব্যবস্থাই প্রচলিত। নারী এবং পুরুষ উভয়েরই বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে হেডম্যান বা কারবারির বিচারই চূড়ান্ত। মারমা সমাজে অন্তর্বিবাহ ও বহির্বিবাহ দুই ধরনের বিয়েই প্রচলিত আছে। মারমারা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। প্রায় প্রত্যেকটি মারমা গ্রামে বৌদ্ধ বিহার 'কিয়াং' এবং বৌদ্ধভিক্ষু 'ভান্তে'দের অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। এই নৃ-গোষ্ঠীর একটি অংশ সর্বপ্রাণবাদ চর্চা করে, যাদের ধর্মীয় গ্রন্থের নাম 'খাদুত্যিয়াং'। মারমারা অতিপ্রাকৃতিক শক্তিতে বিশ্বাস করে। এজন্য তারা বিভিন্ন রীতি ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ শক্তিকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে। কৃষিনির্ভর মারমা সম্প্রদায়ের প্রধান পেশা কৃষি। সাধারণত তারা জুমচাষ করে। মারমা নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে বসতবাড়িভিত্তিক ছোট আকারের বাগানকৃষি দেখা যায়। এছাড়াও তারা ঝুড়ি এবং চোলাই মদ তৈরি করে। মারমা নারীরা বস্ত্র তৈরিতে পারদর্শী। মারমা সমাজ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বোমাং সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত। মারমা সমাজের প্রধান হলেন বোমাং চিফ বা বোমাং রাজা।

মারমারা ভাত, মাছ, মাংস এবং নানা ধরনের শাকসবজি খেয়ে থাকে। সিদ্ধ শাকসবজির সাথে মরিচ মিশিয়ে প্রস্তুত করা 'তোহজা' তাদের একটি প্রিয় খাবার। শুটকি মাছ থেকে প্রস্তুতকৃত 'নাপ্পি' বা 'আওয়াংপি' তাদের আরেকটি পছন্দের খাবার। মারমারা বাঁশ, কাঠ ও ছন দিয়ে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে। কয়েকটি বাঁশের খুঁটির ওপর মাটি থেকে ৬-৭ ফুট ওপরে তাদের ঘরবাড়ি নির্মিত হয়। বাঁশ বা কাঠের উঁচু ভিতের ওপর নির্মিত ঘরবাড়িকে 'মাচাং' বলা হয়। গৃহপালিত পশু রাখা, জ্বালানি কাঠ সংরক্ষণ, জুমের ফসল রাখা ইত্যাদি কাজে তারা মাচাং ব্যবহার করে থাকে। মারমা নারী পুরুষেরা পোশাক পরিচ্ছদে পরিপাটি। মারমা পুরুষেরা গায়ে জামা ও লুঙ্গি পরে। পুরুষেরা মাথায় 'গবং' নামক পাগড়ি পরে। মারমা নারীরা 'আনিঞ্জ' নামক এক ধরনের ব্লাউজ পরে। এছাড়াও মারমা নারীরা 'রাংকাই' ও 'থামি' নামের দুটি বিশেষ ধরনের পোশাক পরে থাকে। গত কয়েক দশকে মারমা সম্প্রদায়ে আধুনিকতা ও পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে।

ত্রিপুরা : লোক সংখ্যার দিক থেকে ত্রিপুরারা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের তৃতীয় বৃহত্তম ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী। ত্রিপুরারা বাংলাদেশের পাহাড়ি ও সমতল উভয় অঞ্চলেই বসবাস করে। 'টিপরা' নামেও এদের পরিচিতি রয়েছে। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর পূর্বসুরিগণ মঙ্গোলিয়া থেকে মধ্য এশিয়ার তিব্বত ও সাইবেরিয়ার পথ পরিক্রমণ করে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে আগমন করে। বাংলাদেশে বসবাসরত ত্রিপুরাদের আদি বাসস্থান ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য। ত্রিপুরা জাতি ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি শক্তিশালী নৃ-গোষ্ঠীরূপে পরিচিত ছিল। ত্রিপুরারা মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত। এদের গায়ের রঙ উজ্জ্বল, নাক বোঁচা, চোখ ছোট এবং চুল খাড়া হয়ে থাকে। বাসস্থান, ভাষা: বাংলাদেশের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, ফরিদপুর, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার, কুমিল্লা, কক্সবাজার প্রভৃতি জেলাসমূহে ত্রিপুরারা বসবাস করে। ত্রিপুরাদের ভাষার নাম ককবরক। এ ভাষাটি 'বোডো' দলের অন্তর্ভুক্ত। সিনো-টিবেটান পরিবারভুক্ত টিবেটো-বার্মা ভাষার আসাম শাখা থেকে ককবরক ভাষাটির উৎপত্তি। ককবরক ভাষার নিজস্ব অক্ষর-লিপি রয়েছে।

ত্রিপুরাদের পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থায় পিতাই পরিবারের প্রধান। সন্তান পৈতৃক সূত্রে বংশ পরিচয় লাভ করে থাকে। তবে তাদের কিছু গোত্রে মেয়েরা মাতৃবংশ পরিচয় লাভ করে থাকে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র অগ্রাধিকার পায়। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীদের মধ্যে পিতা-মাতা বা অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথাগতভাবে ত্রিপুরাদের নিজ গোত্রের মধ্যে বিবাহ অনুমোদিত নয়। যৌতুক প্রথা এ সমাজে নিষিদ্ধ। ত্রিপুরাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত। বহুবিবাহ এ সমাজে দেখা যায়। তবে তা প্রথাগতভাবে নিন্দনীয়। ত্রিপুরা গোষ্ঠী সনাতন হিন্দুধর্মের অনুসারী। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী শিব এবং কালীসহ ১৪ জন দেব-দেবীর পূজা অর্চনা করে থাকে। ত্রিপুরা নৃ-গোষ্ঠীর 'সমাজ'কে দফা (দল) বলা হয়। ত্রিপুরারা মোট ৩৬টি দফায় বিভক্ত। এর মধ্যে ১৬টি দফা বাংলাদেশে বসবাস করে। প্রত্যেকটি দফার নিজস্ব পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা, আচার অনুষ্ঠান, রীতি-প্রথা ও অলঙ্কার রয়েছে। ত্রিপুরা পুরুষেরা ধুতি পরে থাকে। তারা মাথায় পাগড়ি/টুপি পরিধান করে। ত্রিপুরা নারীরা শীরের ঊর্ধ্বাংশে ব্লাউজ এবং নিম্নাংশে সায়া পরিধান করে। ত্রিপুরাদের অর্থনীতি জুমচাষ, পশু পালন ও হালচাষের ওপর নির্ভরশীল। ত্রিপুরা লোকসাহিত্য বেশ সমৃদ্ধ।

এদের জীবন-জীবিকা এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণে, বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে নৃত্য, গীত এবং বাদ্যযন্ত্র অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। ত্রিপুরাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠান হল বৈসুকি বা বৈস, যা মূলত বর্ষবরণের অনুষ্ঠান। এই উৎসব তিন দিন ধরে উদযাপন করা হয়।

বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ যা বৃহত্তর বাঙালি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা যোগ করে পূর্ণতা দিয়েছে। সবাই মিলে মিশে হয়েছে বাংলাদেশি।■

● ড. ফাতিমা ইয়াসমিন
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জাতিগত অধিকার বিশেষজ্ঞ

আইয়ুব হোসেন

মুক্তিযুদ্ধে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

ষড়ঋতুর এই দেশে অতুল আবহাওয়া-বৈচিত্র্য মানুষকে উদ্বেলিত করে। জল-মাটি-হাওয়ায় নতুন মাত্রা যোগ করে। নবপ্রাণের সঞ্চার করে মানুষকে নতুন কর্মউদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত করে। পাহাড়, অরণ্য, নদী, উপত্যকার বেষ্টনে এই দেশে বিভিন্ন জাতি ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বর্তমান। অঞ্চলভেদে বাস করেন ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা। তাদের রয়েছে আলাদা আলাদা সাংস্কৃতিক উপাদান। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, আদিবাসী, উপজাতি বা পাহাড়ি বলে পরিচিত এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়।

সংস্কৃতি ও অবস্থান দেশের মূলস্রোত থেকে স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন হলেও জাতীয় পর্যায়ের ঘটনাবলী থেকে কিন্তু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো অবিচ্ছিন্ন বরাবরই। সব জাগরণে, আন্দোলনে তারা অংশগ্রহণ করেছে। ইতিবাচক অবদান সংযোজিত করেছে। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে তারা পথ প্রদর্শকের ভূমিকাও পালন করেছে।

গেল দশকের গোড়ার দিকে সংঘটিত রংপুর-দিনাজপুরের তেভাগা আন্দোলন, নাচোলের সাঁওতাল বিদ্রোহ, ময়মনসিংহের হাজং বা টঙ্ক-বিরোধী আন্দোলন এবং চাকমা বিদ্রোহ এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। কেবল তাই নয়, ব্রিটিশ শাসনামলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেরও সূচনা করেছিলেন এই সম্প্রদায়।

বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় অর্জন মহান মুক্তিযুদ্ধে ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলোর ছিল উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ। মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র সংগ্রামে তারা শামিল হয়েছেন, সর্বস্ব খুইয়েও। যারা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন অথবা দেশ ত্যাগ করেছিলেন তাদের ঘরবাড়ি, সহায়-সম্পদ লুট অথবা ধ্বংস করা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর তারা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে ভিটে-মাটি ব্যতিরেকে আর কিছু পাননি।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর যোদ্ধা ও তাদের তৎপরতার সংক্ষিপ্ত কিছু বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে বর্তমান নিবন্ধে। এক প্রাথমিক হিসেবে জানা যায়, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা তিন সহস্রাধিক। যুদ্ধে শহীদের সংখ্যা শতের কোঠায়।

মুক্তিযুদ্ধে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

যদি ত্যাগই হয় মুক্তির আদর্শ, যদি রক্তই হয় স্বাধীনতার মূল, তবে এদেশের, মানুষ সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছে। মানবেতিহাসে সংগঠিত অজস্র গণহত্যার ঘটনার মধ্যে স্বল্পতম সময়ে সর্বাদিক সংখ্যক ব্যক্তি নিহত হয়েছে বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের পাকিস্তান কর্তৃক গণহত্যায়। মানুষের কল্পনাকে ছাড়িয়ে যাওয়া এই নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছিলেন এদেশের মানুষ। এদেশের বাঙালি ছাড়াও তেতাল্লিশটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষ। অস্তিত্বে জড়িয়ে থাকা, চেতনায় মিশে থাকা তাঁদের প্রতিবাদের ভাষা ইতিহাসের অধ্যায়ে অধ্যায়ে জন্ম দিয়েছে মহাকাব্যের।

ভারতীয় উপমহাদেশের বিদ্রোহ-সংগ্রামের ইতিহাসে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের অবস্থান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশে এঁদের বসবাস উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে। ১৯৭১ সালে উত্তরবঙ্গের পাকিস্তানিদের প্রধান ঘাঁটি ছিল রংপুর শহরে। পাকবাহিনীর ২৩তম ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার ছিল এটি। ব্রিগেড কমাণ্ডার আব্দুল্লাহ মালিক। ব্রিগেডটির অধীনে ছিল ৩য় বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ২৬ এফ এফ রেজিমেন্ট, ২৩ ক্যাভালরি এবং ২৯ ট্যাঙ্ক বাহিনী। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রথম পর্যায় ২৩ মার্চে পাকিস্তানি সেনা অফিসার অবাঙালি লেফটেন্যান্ট আব্বাসের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রংপুরসহ সমগ্র উত্তরবঙ্গে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পার্শ্ববর্তী সাঁওতাল গ্রামগুলোতে নেমে আসে অত্যাচারের খড়গ। এহেন অসহনীয় পরিস্থিতিতে দা-কুড়াল, তীর-ধনুকের মতো আদিম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রংপুর সেনানিবাস আক্রমণের মতো দুঃসাহসিক কাজে এগিয়ে আসে সাঁওতালরা। ২৮ মার্চ হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ সশস্ত্র সাঁওতাল ক্যান্টনমেন্টের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে নিসবেতগঞ্জ হাট ও তার আশপাশের এলাকাসহ ঘাঘট নদীর তীর ঘেঁষে জমায়েত হতে থাকেন। এমন সময় পাশবিক আক্রোশে গর্জে ওঠে পাকসেনাদের অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। শিকারির তীরের আঘাতে লুটিয়ে পড়া অসংখ্য পাখিদের মতো লুটিয়ে পড়ে সাঁওতালরা। সহস্র শহীদের রক্তে রক্ত-বর্ণ হয়ে যায় ঘাঘট নদীর জল। অকুতোভয়, স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার প্রত্যয়ে স্থিরসিদ্ধান্ত, নিঃশঙ্কচিত্ত, প্রাণ সঁপে দিতে প্রস্তুত ইতিহাসখ্যাত সাহসী সাঁওতালরা তখন থেকেই স্থির হয়ে যায় একটি বিন্দুতে– যাঁর নাম স্বাধীনতা। পূর্ব পাকিস্তানে পরাধীনতা টিকিয়ে রাখতে পাকিস্তানিরা প্রধান বাধা বিবেচনা করত হিন্দু ধর্মাবলম্বী ও আওয়ামীপন্থিদের। সাঁওতালদের হিন্দু গণনা করে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড চালায় তাঁদের ওপর। অবাধ লুণ্ঠনের পর আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয় সাঁওতালদের গ্রামগুলোতে। লুণ্ঠনের সেই মহোৎসবে পাকসেনাদের পাশাপাশি সোল্লাসে অংশগ্রহণ করেছিল অতিচেনা বৃহত্তর গোষ্ঠীর প্রতিবেশীরা। পরিকল্পিতভাবে নির্বিঘ্নে নির্দ্বিধায় নিমিষেই হস্তান্তরিত হয়েছে অসহায় দরিদ্রতর সাঁওতালদের কয়েক দশকে শ্রমে সঞ্চিত সহায়-সম্পদ। জীবনের নিরাপত্তার খাতিরে বাংলাদেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন ৩০ হাজার সাঁওতাল। ভারতের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়া সাঁওতালদের মধ্যে নতুনভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে অনুপ্রেরণা জাগান সাঁওতাল নেতা সাগরাম মাঝি (হাঁসদা)। তাঁর প্রচেষ্টায় সাঁওতাল তরুণরা সংগঠিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ভারতের পাতিরাম, মধুপুর, শিলিগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, পানিঘাটা প্রভৃতি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এভাবে তিনশ'রও বেশি সাঁওতাল প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। গোদাগাড়ি রাজশাহীর বীর মুক্তিযোদ্ধা বিশ্বনাথ টুডু ছিলেন একজন প্লাটুন কমান্ডার। চাঁপাইনবাবগঞ্জের সীমান্ত এলাকায় সংগঠিত বেশ কয়েকটি সংঘর্ষে তিনি বীরত্বপূর্ণ নৈপুণ্য দেখাতে সক্ষম হন। একই থানার সুধীর চন্দ্র মাঝিও কয়েকটি সম্মুখ যুদ্ধে সাহসিকতার পরিচয় দেন। নওগাঁর জগদ গ্রামের সাঁওতাল তরুণ মাথাই টুডু বিভিন্ন ইয়ুথ ক্যাম্পে এবং চূড়ান্তভাবে পানিঘাটায় এক মাসের প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। চকচান্দাডু, বদলগাছি ও পাহাড়পুরের অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশনে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেন তিনি।

এভাবে রক্তে হুলের চেতনা নিয়ে জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন সম সরেন, চাম্পাই সরেন, ঠাকুর মুরমু, সুশীল সরেন, দাসু মুরমু প্রমুখ সাঁওতাল। ফাদার লুকাশ মারান্ডি ছিলেন সাঁওতাল সম্প্রদায়ের একজন খ্রিষ্টান যাজক। একাত্তরের অনিশ্চিত সময়ে তিনি ভারতে পলায়নপর শরণার্থীদের রুহিয়া মিশনে আশ্রয় ও বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করেছেন। এই অপরাধে ২১ এপ্রিল পাকসেনারা যাজক লুকাশ মারান্ডিকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এমনিভাবে শহীদ হয়েছেন রাজশাহী কাশিঘুটুর ১১ জন সাঁওতাল এবং রংপুর উপকণ্ঠে ২০০ জন।

১৮ সেপ্টেম্বর ইপিআর কমান্ডার সালেক (বগুড়া), বেঙ্গল রেজিমেন্টের মান্নান, ঢাকা পুলিশের হাবিলদার রজব আলী এবং রজিত কুমার মহন্ত, প্রদীপ কুমার কর (গোবিন্দগঞ্জ) প্রমুখের নেতৃত্বে সাঁওতাল সেনাদের একটি দলের সাথে হিলির পার্শ্ববর্তী একটি স্থানে পাকবাহিনীর সাথে ভীষণ সংঘর্ষ বাঁধে। এই সংঘর্ষে বেশ কিছু সৈন্যসহ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয় পাকবাহিনী। ঘোড়াঘাটের সাঁওতাল বীর ফিলিপসের নেতৃত্বে মাইন বিস্ফোরণে পাকসেনাদের একটি বেডফোর্ড গাড়ি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এ সময় মুক্তিসেনারা নাটোরের প্রতিটি সরকারি অফিস থেকে পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের মানচিত্রখচিত পতাকা টানায়। ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠীসহ সর্বস্তরের জনগণের সশস্ত্র বিক্ষোভ-মিছিলে প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল সেদিন নাটোরের রাজপথ।

নাচোল বিদ্রোহসহ বিভিন্ন উপনিবেশ বিরোধী সংগ্রামে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অংশগ্রহণে স্মরণীয় সাঁওতাল নারীরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও সমধিক সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। রাজশাহীর গোদাগাড়ি থানার সাঁওতাল আদাড়পাড়া গ্রামের কয়েকটি পরিবার যুদ্ধের সময় গ্রামেই থেকে যায়। পরিবারগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সোনামনি সরেন, মালতী টুডু ও সোহাগিনীদের পরিবার।

এই সাঁওতাল পরিবারগুলো মুক্তিযুদ্ধের সময় হয়ে ওঠে মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য-আশ্রয়সহ সার্বিক সহযোগিতার কেন্দ্র। যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মুক্তিযোদ্ধাসহ ১৫/২০ জনের একটি দল সাঁওতাল আদাড়পাড়াতে আশ্রয় নেয়। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বপন, বাচ্চু, জামিন সরেন, সুশীল সরেন, ক্ষুদিরাম মুরমু, সনাতন মুরমু, সুধীরচন্দ্র মাজহী, নাজমুল প্রমুখ। দেশ মুক্ত হওয়ার বেশ কয়েকদিন পূর্বে স্থানীয় রাজাকার যোবেদ-এর প্ররোচনায় এসব সাঁওতাল পরিবারে হানা দেয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। এসব পরিবারগুলোর অপূরণীয় ক্ষতি করার পাশাপাশি লাঞ্ছনা করা হয় ষোড়শী যুবতী মালতী টুডুকে।

মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ সময়ের এক দিন রাজশাহী তানোর সংযোগ রাস্তার ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়ার জন্য যান সাঁওতাল মুক্তিযোদ্ধা সুশীল সরেনসহ কয়েকজন। অপারেশন সফল হলেও জনৈক ব্যক্তির সহযোগিতায় তাঁরা পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে যান। তানোর সেনাক্যাম্পে নিয়ে তাঁদের ওপর চালানো হয় অমানুষিক অত্যাচারের স্টিমরোলার। পাকসেনাদের নির্যাতনে সেদিন শহীদ হয়েছিলেন দুজন মুক্তিসেনা।

সাগরাম মাঝি (হাঁসদা), সাঁওতাল মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক হিসেবে যাঁর নাম প্রথমেই চলে আসে। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে যুক্তফ্রন্ট থেকে মেম্বার অব লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি (এলএমএ) সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় অনেক প্রখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাথে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে। জেলে শহীদ ৪ মহান নেতার অন্যতম কামরুজ্জামানের রাজনৈতিক সহকর্মীও ছিলেন সাগরাম মাঝি। তিনি ১৯৭১ সালে ভারতে আশ্রয় নেয়া সাঁওতাল শরণার্থীদের ক্যাম্পগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের প্রচারণা চালিয়ে সাঁওতাল তরুণদের উদ্বুদ্ধ করেছেন দেশ-মাতৃকার লড়াইয়ে।

এক বিকৃত ইতিহাসের জন্ম হয়েছে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে চাকমা সম্প্রদায়ের ভূমিকা নিয়ে। স্বভাবগত সাহসিকতার অধিকারী দেশপ্রেমিক এই সম্প্রদায়ের বাস বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে। সামাজিক গবেষণা পদ্ধতির অংশ হিসেবে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহকালে এ সত্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব হয়েছে যে, বাংলার ইতিহাসের হিরন্ময় পর্ব ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ছাত্র-যুবক শ্রেণী স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং সে লক্ষ্যে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণে ইচ্ছে পোষণ করে। কিন্তু তৎকালীন স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ হয়তো বা অনাস্থা হেতুই আদিবাসীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও মুক্তিযুদ্ধে শামিল করার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখাননি।

প্রচারণা রয়েছে– বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে চাকমা সম্প্রদায় সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ভূমিকা পালন করেছে। বলা হয়ে থাকে, চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় যখন পাকিস্তানের পক্ষ নেয় তখন সমস্ত চাকমা পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। কিন্তু চামকা নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণের ভাষ্যে– এ সত্য গবেষকদের ঐতিহাসিক অবমূল্যায়নের নামান্তর। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে

শিক্ষা-দীক্ষায় অপেক্ষাকৃত অগ্রসর এই জাতিটিকে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে জাতীয়তাবাদ বিরোধী রাজনৈতিক প্রপঞ্চ হিসেবে নির্দিষ্ট করে হেয়প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চলেছে। যেমন– পাকিস্তান পর্বে এদেরকে বলা হত ভারতপন্থি, আবার '৭১ ও পরবর্তী বাংলাদেশ পর্বে এদের বলা হয় পাকিস্তানপন্থি। তবে এটা সত্য যে অসংখ্য বাঙালিদের মতো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কিছু কুলাঙ্গারও পাকিস্তানের পক্ষে সামরিক ও বেসামরিকভাবে স্বাধীনতা বিরোধী বিভিন্ন অপকর্মে শামিল হয়েছে। মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠের মতো পৃথিবীর যে কোনো দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধেই এই সত্যের চরম উপস্থিতি রয়েছে। চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় '৭১ যে পাকিস্তানের পক্ষ নিলেও চাকমা রাজপরিবারের অন্যতম সদস্য কে. কে রায়ের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে। প্রখ্যাত চাকমা নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে এরকম সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রস্তুতি নিয়েছিল অসংখ্য চাকমা ছাত্র, যুবক ও সচেতন সাধারণ মানুষ। এর অনেক অনেক প্রামাণ্য উদাহরণের নমুনা হিসেবে উল্লেখযোগ্য রসময় চাকমা, তাতিন্দ্রলাল চাকমা প্রমুখের নাম। শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন রসময় চাকমা। এ লক্ষ্যে দেশে উত্তাল পর্ব শুরু হলেই তিনি মুক্তিযুদ্ধে নাম লেখানো ও ট্রেনিং গ্রহণের জন্য ছুটে যান ভারতের রস্যাবাড়ি। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে সেখানে তাঁকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করা হয়। নিরাশ হয়ে দেশে ফিরে আসেন রসময় চাকমা। তখনো চেতনায় মুক্তিযুদ্ধে। তাই দেশে ফিরে এসে খাগড়াছড়ির মাইছছড়িতে জায়গীর খান নামক এক পাঞ্জাবির বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেন।

এই পাকিস্তান বিরোধী ঘটনায় তাঁর ওপর হুলিয়া জারি করা হয়। তাই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পেরেও তাঁকে পাকসেনাদের দৃষ্টিচক্ষুর আড়ালে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। রসময় চাকমার মতোই এক অভাগা তাতিন্দ্রলাল চাকমা। কলেজের ছাত্র থাকাকালেই ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিলেন তাতিন্দ্রলাল। অসংখ্য পাকিস্তান বিরোধী রাজপথ-কাঁপানো মুক্তির মিছিলে ছিল তাঁর উচ্চকণ্ঠী সপ্রতিভ অংশগ্রহণ। তাই মুক্তিযুদ্ধের মাহেন্দ্রক্ষণে আগেভাগেই ট্রেনিং সম্পন্ন করে সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রস্তুত হয়েছিলেন তিনি। সঙ্গী করেছিলেন আরো অনেক চাকমা যুবকদের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়নি। উল্লিখিত তাতিন্দ্রলাল ও রসময় চাকমার মতো অনেক-অনেক চাকমা সেদিন বিফল মনোরথ হয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়ে। পরবর্তীতে এদের মধ্যে কেউ কেউ হতাশাগ্রস্ত হয়ে ও পাকসেনাদের ইন্ধনে সিভিল আর্মড ফোর্স অথবা রাজাকার বাহিনীতে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাঙালি রাজাকারদের অধিকাংশ বিভিন্নভাবে পার পেয়ে গেলেও চাকমাদের চরম মূল্য দিতে হয়েছিল।

সব প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে কিছুসংখ্যক ছাত্র-যুবক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও তাঁদের প্রতি শীতল আচরণ করা হয়। অনাকাঙ্ক্ষিত এই আচরণে হতাশ হয়ে পরবর্তী পর্যায়ে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অনেকেই আর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহ দেখাননি। জানা যায়, পাকিস্তানি প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গিজনিত কারণে জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তারা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষদের বিশেষ করে চাকমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত করতে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। এই অবস্থায় সমগ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হওয়ার আহ্বান জানানোর মতো দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টিতে তৎকালীন মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বরা ব্যর্থ হন। এই দুর্বলতার সুযোগ কাজে লাগায় পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে শান্তি বিনষ্টকারী অপতৎপরতা উল্লেখ করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর যুবকদের নিয়ে রাজাকার, মুজাহিদ বাহিনী ও সিভিল আর্মড ফোর্স গঠন করে। তবুও তৎকালীন ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের দিয়ে বিভিন্ন লোভ-লালসা সত্ত্বেও চেতনায় স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে প্রাণপণ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছেন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর শত সহস্র তরুণ, শহীদ হয়েছে দেশমাতৃকার মুক্তির লক্ষ্যে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথাগত ইতিহাসে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভূমিকা এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর যুবকদের একটি অংশের কতিপয় বেসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগদানের অজুহাতে পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

বিপুল ধ্বংস, ব্যাপক গণহত্যা, অসংখ্য মানুষের জীবন বিপর্যস্ত করে তোলা এবং অনেক সুদূরপ্রসারী প্রভাব সৃষ্টি প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ একটি অনন্যপূর্ব ঘটনা। আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন সার্বভৌম স্বদেশ। গুটিকয়েক কুলাঙ্গার ব্যতীত এই অর্জনে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে অংশগ্রহণ ছিল দেশের সর্বস্তরের মানুষের। রাখাইনরা এদেশেরই ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি আদিবাসী সম্প্রদায়। তাদেরও ছিল একটি সমৃদ্ধ জনপদ, স্বতন্ত্র-স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজ্য। বর্মি সম্প্রদায়ের নিষ্ঠুর ছোবলে সবকিছু হারিয়ে এদেশে থিতু হয়েছিলেন তাঁরা। অভিজ্ঞতায় স্বাধীনতা হারানোর বেদনা, চেতনায় পরাধীনতা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষার বশেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কৃতিত্ব রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন অসংখ্য রাখাইন তরুণ। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অসহায় বাঙালিদের আশ্রয়দান ও মুক্তিযোদ্ধাদের নানামুখী সহায়তা ছাড়াও রাখাইনরা দেশের বৃহত্তর অংশের সাথে একাত্ম হয়ে জীবন-মরণের সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়েছেন। তেমন কয়েকজন উল্লেখযোগ্য বীর মুক্তিযোদ্ধা হলেন– কক্সবাজার অঞ্চলের উ-মংয়াইন, উ-কহ্লাচিং (প্রয়াত কাষ্টমস অফিসার), পটুয়াখালী-বরগুনা অঞ্চলের উ-উসিটমং (কৃষিবিদ) প্রমুখ। এছাড়াও রয়েছেন রামু উপজেলার বিলুপ্ত রাখাইন পাড়ার মংয়াইন, মহেশখালীর মংহ্লা। এঁরা বাংলাদেশ সরকারের তালিকাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধা। এঁদের ছাড়াও এমন অসংখ্য সহজ-সরল রাখাইন মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন যাঁরা কেবল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেই তাঁদের পবিত্র কর্তব্য পালন করেছেন। স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে তাঁরা 'মুক্তিযোদ্ধা' নাম বিকিয়ে বাড়তি সুযোগ-সুবিধার প্রত্যাশায় দিন গুজরান করেননি।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের সাথে চীনের অত্যন্ত সুহৃদ সম্পর্ক ছিল। এ সময় রাখাইনদের কেউ কেউ নিজেদের 'চায়না বৌদ্ধ' বলে পরিচয় দিয়ে মুক্তি পেলেও পাকিস্তানি নৃশংসতায় নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল রাখাইন জনপদ। ১৯৭১'র মে মাসের এক দিন তেমনি সহজাত পাশবিকতা নিয়ে মহেশখালীর ঠাকুরতলা বৌদ্ধ বিহারে অনুপ্রবেশ করে পাকসেনারা। বিনা অপরাধে তারা বিহারের মহাথেরো উ-তেজিন্দাসহ সাতজন শিষ্যকে বাইরে নিয়ে এসে এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় চচামং ও চিং হ্লা মং পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও বিহার অধ্যক্ষসহ অন্যান্যরা ঘটনাস্থলেই শহীদ হন। বৌদ্ধ বিহারের ৬২টি রৌপ্য মূর্তি লুণ্ঠন ও কয়েকটি শ্বেত পাথরের মূর্তি ধ্বংস করে উন্মুক্ত হিংস্রতার পরিচয় দেয় পাকসেনারা। একই এলাকার দক্ষিণ রাখাইন পাড়ার বৌদ্ধ বিহারেও সমান বীভৎসতার জন্ম দেয় তারা। বিহার পুরোহিতের সেবা শুশ্রূষায় নিয়োজিত তিনজন নিষ্পাপ নিরপরাধ শিষ্যকে মন্দিরের রান্নাঘরে জোর করে ঢুকিয়ে তালা মেরে দিয়ে মন্দিরে আগুন জ্বালিয়ে সোল্লাসে মুখরিত হয়ে উঠেছিল পাকিস্তানিরা। এমনিভাবে পাকিস্তানি সৈন্যদের আদিম বর্বরতার শিকার হয়েছেন রাখাইন সম্প্রদায়ের অসংখ্য মানুষ। বরাবর প্রচারবিমুখ নিভৃতচারী সহজ-সরল রাখাইনদের এসব করুণ আলেখ্য বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে এখনো উপেক্ষিত।

শত শত বছরের সংগ্রাম, সাধনা, নিরলস প্রচেষ্টা, রক্ত ত্যাগের মহিমায় বর্তমান বাংলাদেশের বাস্তব রূপায়ণ। ব্রিটিশদের 'Trade & Territory' নীতির যুপকাষ্ঠে বলি হয়ে পরাধীনতার সবটুকু বিষাক্ত নির্যাস পতিত হয়েছিল এদেশের মানুষের ওপর। তবুও তাঁরা ভেঙে পড়েননি। দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় একাত্ম হয়ে স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে দেশকে টেনে আনার প্রচেষ্টায় প্রাণ বাজি রেখে শত্রুর সম্মুখে অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁরা। এরই মধ্যে ভিড় করেছে 'স্বাধীনতা' নামের কুহক। অবশেষে শরীরের শেষ রক্তবিন্দুর বিনিময়ে হলেও স্বাধীনতার সত্য রূপায়ণে সংগ্রাম সমরে সমুত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁরা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সবাই একাত্ম হয়েছে সেই মুক্তির মিছিলে। এভাবেই ত্যাগ-তিতিক্ষা, আন্দোলন-সংগ্রাম এবং আত্মাহুতির তরঙ্গ দ্রোহকালে বাংলাদেশের জনগণ হয়েছে এক ও অবিচ্ছিন্ন সত্তার অংশ। একই সমতলে লীন হয়ে গেছে মানবসৃষ্ট সকল সীমারেখা, বিভেদের দেয়াল। সভ্যতার এই মহান কবিতার মাহেন্দ্রক্ষণ ১৯৭১ সাল। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সৃষ্ট এই কবিতার একটি পঙক্তির নাম বাংলাদেশের মণিপুরী সম্প্রদায়।

২৫ মার্চ '৭১-এ পাকসেনাদের গণহত্যায় নরক হয়ে ওঠা ঢাকা শহর থেকে মানুষেরা নিরাপত্তার সন্ধানে গ্রামমুখী হয়ে পড়লে পাকিস্তানি তাণ্ডব সেখানেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে মণিপুরী অধ্যুষিত মৌলভিবাজারের ভানুগাছ, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট, ছাতকের কোম্পানিগঞ্জ ও সিলেটে পাকসেনাদের অনুপ্রবেশ ঘটে। নৃশংস হত্যার শিকার হয় নিরপরাধ ছাত্র, যুবা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা। তখন থেকেই মণিপুরী চেতনায় জেগে ওঠে স্বাধীনতা লাভের দুর্মর প্রতিজ্ঞা। শারীরিকভাবে সক্ষম মণিপুরীরা পালিয়ে ভারতের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ থেকে প্রশিক্ষণ লাভ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণপণ যুদ্ধে।

মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানার ভানুবিল গ্রামে আগস্ট মাসের ১২ তারিখে পাঞ্জাবি সেনারা প্রবেশ করে মণিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়া ব্রাহ্মণ সার্বভৌম শর্মাকে গ্রেফতার করে এবং পূর্বের জঙ্গলে চোখ বেঁধে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। পাঞ্জাবিদের ক্যাম্প ছিল কামারছড়া চা বাগানে। ক্যাম্পের সন্নিকটে বাংকার খনন ও জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য পালাক্রমে স্বেচ্ছাশ্রমে বাধ্য করা হয় ভানুবিলের প্রতিটি মণিপুরীকে। এ সময়ে জঙ্গলে কাজ করতে গিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কয়েকজন মণিপুরী যুবক পালিয়ে ভারত যেতে সক্ষম হন। এভাবেই সুযোগ বুঝে ভারতে আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধ প্রশিক্ষণ নেন বেশ কয়েকজন মণিপুরী। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– কৃষ্ণ কুমার সিংহ, বাবুসেনা সিংহ, বিদ্যাধন সিংহ, কুলেশ্বর সিংহ (শিক্ষক), মানত্রী সিংহ প্রমুখ। এছাড়াও সতীশচন্দ্র সিংহ, নীলকান্ত সিন্‌হা, ব্রজমোহন সিংহ, মণি সিংহ, থইবা সিংহ, নিমাই সিংহ, বিশ্বম্ভর সিংহ, দীনমনি সিংহ, বাপ্পী সিংহ, বসন্ত কুমার সিংহ, ব্রজেন্দ্র সিংহ, কুঞ্জ সিংহ, পদ্মাসন সিংহ, হীরেন্দ্র সিংহ, দিলীপ সিংহ, বীরেশ্বর সিংহ, ধনো সিংহ, আনন্দ সিংহ, সুরমনি সিংহ, নন্দেশ্বর সিংহ, ভুবন সিংহ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। অগ্নিঝরা একাত্তরের অসামান্য অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ এই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যক্তিগত কথনই এক একটি অভূতপূর্ব মহাকাব্য সৃষ্টির দাবি রাখে। রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে এঁরা ছিলেন মহাকাব্যের সংশপ্তকদের মতোই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পাকসেনাদের ওপর চোরাগুপ্তা হামলা চালাতে গিয়ে বাঘিনীর কবলে পড়ে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে ফিরে এসেছেন মৌলভীবাজারের কালিগঞ্জ গ্রামের ব্রজেন্দ্র সিংহ। শত্রু সেনাদের হাতে ধরা পড়েও বেঁচে এসেছেন উত্তর ভানুবিলের বাবুসেনা সিংহ। তবুও অসংখ্য মহান মুক্তিসেনার মতো স্বাধীনতার শপথে বলি হয়েছেন মাধবপুর গ্রামের গিরীন্দ্র সিংহ। পাকসেনাদের অকথ্য অত্যাচারে শহীদ গিরীন্দ্র সিংহের মৃতদেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয় রক্তাক্ত ধলাই নদীর বুকে।

এমনি অসংখ্য মণিপুরী অস্ত্রসৈনিকের মতো মুক্তিযুদ্ধের মহিমায় ভাস্বর হয়েছেন বেশ কয়েকজন মণিপুরী শব্দসৈনিক। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাধন সিংহ, অনিতা সিন্‌হা, বাণী সিনহা প্রমুখ। ভারতের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়ে তাঁরা মুক্তির গানে উজ্জীবিত করেছেন মুক্তিপিয়াসী জনতাকে। তাঁদের সাথে একাত্ম হয়েছিলেন বাঙালি শিল্পী শিবু ভট্টাচার্য, শ্রীদাম (নৃত্য শিল্পী), হিমাংশু গোস্বামী প্রমুখ বিশিষ্টজন। ঘুরে ঘুরে সঙ্গীত পরিবেশন করে তা থেকে উপার্জিত অর্থ তাঁরা দান করেছেন বাংলাদেশ সরকারের তহবিলে।

একাত্তরের ২৩ মার্চে পাকিস্তানের অবাঙালি সেনা অফিসার লেফটেন্যান্ট আব্বাসের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রংপুরসহ সমগ্র উত্তরবঙ্গে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পার্শ্ববর্তী সাঁওতাল গ্রামগুলোতে নেমে আসে অত্যাচারের খড়্গ। এই অসহনীয় পরিস্থিতিতে দা-কুড়াল, তীর-ধনুকের মতো আদিম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রংপুর সেনানিবাস আক্রমণের মতো দুঃসাহসিক কাজে এগিয়ে আসে সাঁওতালরা। ২৮ মার্চ হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ সশস্ত্র সাঁওতাল ক্যান্টনমেন্টের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে নিসবেতগঞ্জ হাট ও তার আশপাশের এলাকাসহ ঘাঘট নদীর তীর ঘেঁষে জমায়েত হতে থাকেন।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে মণিপুরীদের অসামান্য বীরত্বকথন উল্লেখের ক্ষেত্রে বিশেষ শ্রদ্ধায় যাঁদের নাম অবশ্য স্মরণীয়, তাঁরা হলেন মুক্তিযুদ্ধের বিশিষ্ট সংগঠক নীলমনি চট্টোপাধ্যায়, নন্দেশ্বর সিংহ, বিজয় সিংহ প্রমুখ। এঁদের মধ্যে নীলমনি চট্টোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল প্রায় ১২০০ মুক্তিসেনার একটি প্রতিরোধ বাহিনী।

পৃথিবীর ইতিহাসে অবিশ্বাস্য ত্যাগে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহীদের আত্মত্যাগের বাইরেও রয়েছে ৮ থেকে ৭৫ বছর বয়সি ২ লাখ ৬৯ হাজার নারীর লাঞ্ছনার বিষণ্ন কথন। এর মধ্যে দেশাভ্যন্তরে যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছেন ২ লাখ ২ হাজার ৫শ ২৭ জন এবং যাঁর মধ্যে শতকরা ৭০ জনই ছিলেন স্পষ্ট গণধর্ষণের শিকার। আনুপাতিক হারে এই পাকিস্তানি বীভৎসতার শিকার হয়েছিলেন মণিপুরী নারীও, যাঁদের অনন্তপ্লাবী অশ্রুস্নানে 'পূর্ব-পাকিস্তান' নামক একটি কদর্য সৃষ্টি হয়ে উঠেছে 'বাংলাদেশ' নামের একটি স্বতন্ত্র-স্বাধীন সার্বভৌম দেশ।■

অধ্যাপক ড. এম. এ. বাকী খলিলী

সাবেক চেয়ারম্যান, ফিন্যান্স বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণের সাফল্য অনেক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্টের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. এ. বাকী খলিলী দেশের প্রগতিশীল ধারার একজন বরেণ্য অর্থনীতিবিদ। ছাত্রজীবনে ছিলেন দারুণ মেধাবী। তিনি ১৯৭৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স থেকে বিকম (অনার্স)সহ এম কম ডিগ্রি লাভ করে একই বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। পরে যুক্তরাষ্ট্রের Ohio State University থেকে ১৯৯১ সালে Finance & Development বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৯৪ সালে অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পান এবং ৩৭ বছর অধ্যাপনা শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০১২ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

অর্থনীতিতে ড. খলিলী একজন পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। তার অসংখ্য গবেষণাপত্র দেশে ও বিদেশের উল্লেখযোগ্য জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফাইন্যান্স এর প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক এবং প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর এর দায়িত্বসহ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের পরিচালক পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনার সাথে সম্পৃক্ত।

বিশিষ্ট এই অর্থনীতিবিদ প্রত্যয়কে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে যা বলেন, তা এখানে উপস্থাপন করা হলো:

প্রত্যয় : আপনি একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর এই মাহেন্দ্রক্ষণেই স্বপ্নের পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। দেশের অর্থনীতিতে পদ্মা সেতু কি ধরনের সুফল বয়ে আনবে বলে আপনি মনে করেন?

ড. এম. এ. বাকী খলিলী : পদ্মা সেতু জাতির জন্য একটি গর্বের প্রকল্প। এর অর্থনৈতিক বেনিফিট প্রচুর। ম্যাক্রো লেভেলে বললে, দক্ষিণ বাংলার সাথে পুরো মার্কেটের ইকোনমিক ইন্টিগ্রেশন বা অর্থনৈতিক একত্রীভূতকরণ; দ্বিতীয়টি হলো দক্ষিণ বাংলার অর্থনীতিতে এসএমই উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে অবদান রাখবে। তৃতীয়টি হলো কৃষি। পদ্মা সেতুর কারণে চলাচলে সহজলভ্যতার জন্য দক্ষিণাঞ্চলের কৃষিপণ্য দেশের সব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়বে। এছাড়া এখন ফ্লো অব রিসোর্সেস ঢাকার দিক থেকে দক্ষিণে যাবে আর দক্ষিণ থেকে ঢাকায় আসবে। এতে অর্থনৈতিক সম্পর্কের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং জিডিপিতে একটি বড় অবদান রাখবে। যদিও বলা হয়, জিডিপিতে ১% এর বেশি কন্ট্রিবিউট করবে। আমি মনে করি আরো বেশি হওয়া উচিত এবং হবেও। সামাজিক উন্নয়নেও অবদান রাখবে পদ্মা সেতু।

প্রত্যয় : স্বাধীনতার পর দেশের অর্থনীতি মারাত্মক রকম বিপর্যস্ত ছিল। ধীরে ধীরে আমরা বেশ উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হয়েছিলাম। কিন্তু বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির কারণে আমরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। সঙ্কট উত্তরণে আপনার পরামর্শ বা প্রস্তাবনা কি?

ড. এম. এ. বাকী খলিলী : করোনাকালীন লকডাউন অর্থনীতিতে একটি বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল। পরবর্তীতে সরকার যে সকল উদ্যোগ নিয়েছে, আমি মনে করি সে সকল উদ্যোগ যথেষ্ট ভালো। যেমন সরকার গরিব মানুষদের জন্য বিভিন্ন এনজিও/এমএফআইদের মাধ্যমে আলাদা ক্রেডিট প্রোগ্রাম সাবসিডাইজড ক্রেডিটের ব্যবস্থা করেছিল। একই সাথে সরকার সোশ্যাল সেফটিনেস প্রোগ্রাম এক্সপান্ড করেছিল। সেগুলোর প্রভাব খুবই ইতিবাচক। কিন্তু সম্প্রতি বিশ্ব ব্যাংকের একটি প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে যে, টার্গেটেড সোশ্যাল সেফটিনেস প্রোগ্রামের টার্গেট এখনো ৫০% এর বেশি লক্ষ্যে পৌঁছায়নি। কিন্তু করোনাকালীন সময়ে সরকার মোবাইলের মাধ্যমে যে টাকাটা ট্রান্সফার করেছে আমার মনে হয় সেই সময় এটি একটি ওয়েল টার্গেট ছিল।

বর্তমানে আমাদের অর্থনীতিতে যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে সে ক্ষেত্রে আমাদের কতগুলো প্রক্রিয়া অনুসরণ করা দরকার। একটি হলো সোশ্যাল সেফটিনেট প্রোগ্রামকে আরো জোরদার এবং ওয়েল টার্গেটেড করা। দ্বিতীয় হচ্ছে করোনার সময় যে উদ্যোগটা নেয়া হয়েছিল বর্তমান যে বৈশ্বিক অস্থিরতা চলছে এখন সেটা নিলে হবে না। এখন কর্মদক্ষতার সাথে সাথে আমাদেরকে রক্ষণশীল ভূমিকা নিতে হবে।

যেমন ধরুন মূল্যস্ফীতি– মানি সাপ্লাই বাড়াতে কষ্ট বাড়ছে, মূল্যস্ফীতি হচ্ছে, ফরেন রিজার্ভ কমছে– এগুলোর ক্ষেত্রে সরকারের যেটা দরকার সেটি হলো রক্ষণশীল হওয়া। রক্ষণশীল হওয়া বলতে ফরেন এক্সচেঞ্জের অর্থে আমদানিকে একটু নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। বর্তমান পরিস্থিতিতে যে কোনো জিনিস আমদানি করার মতো বিলাসিতা আমাদের এ পর্যায়ে নেই। সরকারের এই জায়গাটাতে একটু পদক্ষেপ নেয়া উচিত এবং এনজিও/এমএফআইদের সাথে সমন্বয় করা দরকার যাতে গরিব মানুষগুলো ভালো অবস্থায় থাকে এবং তাদের জন্য কর্মসৃষ্টিটা যেন বজায় থাকে।

প্রত্যয় : বড় বৈদেশিক ঋণ আমাদের দেশে কতোটা সুফল বয়ে আনবে, নাকি আমাদের অর্থনীতিকে নেতিবাচক দিকে নিয়ে যাবে– এ বিষয়ে সংক্ষেপে যদি বলেন–

ড. এম. এ. বাকী খলিলী : দেখুন আন্তর্জাতিক ঋণ নিতে কোনো সমস্যা নেই। অর্থাৎ যে কাজে এই ঋণ ব্যবহার হবে এবং সেটি যদি জিডিপিতে অবদান রাখে তাহলে এ ধরনের ঋণে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে যে অস্থিরতা বিরাজ করছে সেক্ষেত্রে এই ঋণ নিতে আমাদেরকে কিছুটা কনজারভেটিভ হতে হবে। সমস্যা হলো, ঋণ নিয়ে ইনস্টলমেন্ট প্রদান করতে না পারা। কিন্তু জিডিপির আকার যদি বড় থাকে তাহলে আন্তর্জাতিক ঋণ নিতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তবে বর্তমান অস্থির পরিস্থিতিতে সরকারের উচিত হবে একটু রক্ষণশীল হওয়া; অযথা ঋণের বোঝা কাঁধে না নিয়ে একটু দূরে থাকাই ভালো। সরকার এ মুহূর্তে আইএমএফ থেকে ঋণ নিচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনে স্থিতিশীলতার জন্য। স্থিতিশীলতা নীতির অংশ হিসেবে এই ঋণটি আসছে, এক্ষেত্রে আমি মনে করি শর্তটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

অনেকেই বলার চেষ্টা করছেন যে, আইএমএফ এর ঋণ নেয়ার কারণে সরকার পেট্রোলিয়ামের দাম বাড়িয়েছে। আমার কাছে মনে হয় এটার কোনো দরকার ছিল না। কারণ এটা অত্যাধিক। সরকারকে সতর্ক হতে হবে, আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে ঋণ নেয়ার সময় তাদের দেয়া শর্তগুলো অর্থনীতিকে আরো দুর্বল করবে কি না।

প্রত্যয় : এনজিও/এমএফআই কাজ করে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে। সেটির পরিমাণ সর্বোচ্চ ৫০ লাখ। ক্ষুদ্রঋণের ইম্প্যাক্ট আর বড় ঋণের ইম্প্যাক্ট এ দুটোর মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক দেখেন?

ড. এম. এ. বাকী খলিলী : অবশ্যই। যেমন ধরুন পদ্মা ব্রিজ একটি মেগা প্রজেক্ট। এটির কাজ শেষ হয়ে এখন যাতায়াত হচ্ছে। এটা কি এনজিও সেক্টরের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে? নিম্ন আয়ের মানুষ যাদেরকে ক্ষুদ্রঋণ দেয়া হয় তাদেরকে কি প্রভাবিত করবে? ইতিবাচক কোনো ভূমিকা রাখবে? আমার তো মনে হয় বেশ কতোগুলো কারণে রাখবে। এক, ঢাকার সাথে দক্ষিণাঞ্চলের মার্কেটের পার্থক্য খুব কম হবে। সেক্ষেত্রে যারা দরিদ্র মানুষ, এনজিওরা যাদেরকে ঋণ দিচ্ছে তারা পণ্যের প্রকৃত মূল্য পাবে। দ্বিতীয়ত, যে সকল ক্ষেত্রে আগে বিনিয়োগ করা হতো এখন সেখানে বিনিয়োগের ধরনটাই বেড়ে যাবে। তাই বলা যায় এটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। আর সরকারি কোনো মেগা প্রজেক্ট হলে সেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, দক্ষিণাঞ্চলে ইন্ডাস্ট্রি হলে সেখানে নিম্ন আয়ের দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

প্রত্যয় : ক্ষুদ্রঋণের ধারণাটা আপনার কাছে কেমন? বিশেষ করে এক সময় ১ হাজার টাকা ঋণ দেয়া হতো। পরে ৫ হাজার/১০ হাজার/৫০ হাজার হয়েছে। তখন মানুষ ভাবতো যে টাকার অংশ দিন দিন বাড়ছে। এখন এসএমই ঋণ হিসেবে ৫০ লাখও দেয়া হয়। ক্ষুদ্রঋণের রেঞ্জটা কি দিন দিন বাড়বে নাকি লিমিট থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

ড. এম. এ. বাকী খলিলী : আপনি নিজেই উত্তর দিয়ে দিয়েছেন যে ১ হাজার থেকে ৫০ লাখে এসেছে; কেন এলো? এর অনেকগুলো কারণ আছে। একটি হলো, এই ক্ষুদ্রঋণের ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে, মানুষ দারিদ্রতা থেকে আস্তে আস্তে বের হয়ে আসছে, তাদের উচ্চ আয়ের জন্য অনেক বেশি বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। সেক্ষেত্রে তাদের চাহিদাটা বাড়ছে, এখন আর ১ হাজারে হবে না। দ্বিতীয়ত মূল্যস্ফীতি– যখন ১ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে সেই টাকার ভ্যালু আর এখনকার ভ্যালু সমান হবে না। এটা একটা কারণ। তৃতীয় হলো টাকার যে ট্রান্সফর্মেশনটা হচ্ছে অর্থাৎ ১ হাজার থেকে ৫০ লাখ– এর দুটি সম্ভাব্য কারণ আছে। এক. ক্ষুদ্রঋণ দারিদ্র্য বিমোচনে একটা ভূমিকা রাখছে। আস্তে আস্তে তাদের বিনিয়োগ সক্ষমতা বাড়ছে, চাহিদা বাড়ছে, অন্যদিকে এনজিওরা ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ করছে। এই জায়গাতে ব্যাংকগুলো আসে না, যে কারণে ঋণের পরিধি বেড়েছে। তাই আমার বিশ্বাস এখন যে ৫০ লাখ টাকার ঋণ দিচ্ছে এটা আগামীতে আরো বড় হবে। কারণ, এনজিওরা অর্থনীতিতে যত ইতিবাচক ভূমিকা তৈরি করবে ঋণের এই সিলিংটাও বাড়তে থাকবে।

প্রত্যয় : তখন হয়তো ক্ষুদ্রঋণ শব্দটাও বদলাতে হবে– এমনটা কি মনে করেন?

ড. এম. এ. বাকী খলিলী : আমি চাইব ক্ষুদ্রঋণ শব্দটা থাকা উচিত। কারণ এটাই এনজিওদের আইডেনটিটি। সেখান থেকে দূরে যাওয়া মানে আইডেনটিটি থেকে বিচ্যুত হওয়া। আমি আশা করবো, ৫০ লাখ থেকে ১ কোটি টাকা দিলেও এনজিওরা যেন ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা নামেই পরিচিত থাকে।

প্রত্যয় : সাম্প্রতিক রাশিয়া এবং ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী যে অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থাটা আপনি কীভাবে দেখছেন? এখান থেকে উত্তরণ কীভাবে সম্ভব?

ড. এম. এ. বাকী খলিলী : রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে এর প্রতিকূল প্রভাব বহু দেশে হচ্ছে। ইউরোপে বেশি হচ্ছে, আমেরিকাতেও হচ্ছে, আমরাও এর বাইরে নেই। কারণ আমাদের জ্বালানি, শস্যবীজ এগুলো তো আসে ওই অঞ্চল থেকে। ওখানকার প্রভাব আমাদের ওপরও পড়ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে যখন দাম বেড়ে যায় তখন এর একটা প্রভাব পড়ে। সামনে আরো দীর্ঘমেয়াদে প্রভাব পড়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কারণ, ইউরোপে যদি খরচ সীমাবদ্ধ হয়ে যায়

মূল্যস্ফীতি যদি বাড়ে তাহলে আমাদের প্রধান রপ্তানি পণ্য গার্মেন্টস মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়বে। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে আরো সতর্ক হতে হবে। কারণ, আমদানি কম করে আমাদের ফরেন রিজার্ভটাকে মেইনটেইন করতে হবে। এটা আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ।

সেক্ষেত্রে আমাদের রপ্তানিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইতোমধ্যে সেখানে মূল্যস্ফীতি দেখা দিয়েছে।

সেখানে যদি চাহিদা না থাকে, মূল্যস্ফীতি যদি বাড়ে তাহলে আমাদের প্রধান রপ্তানি পণ্য গার্মেন্টস মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়বে। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে আরো সতর্ক হতে হবে। কারণ, আমদানি কম করে আমাদের ফরেন রিজার্ভটাকে মেইনটেইন করতে হবে। এটা আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ। আমাদের অর্থমন্ত্রী শুধু সমস্যার কথা বলছেন যে, তেলের দাম বাড়লে খাদ্যের দাম বাড়বে, সব জিনিসের দাম বাড়বে। আমাদের দরকার হবে এটাকে সহনীয় করে তোলা। কারণ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, জ্বালানি তেলের দাম বাড়ছে, এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দরিদ্র মানুষ, মধ্য আয়ের মানুষ। উচ্চবিত্ত কিংবা উচ্চ আয়ের মানুষরা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না। লো-ইনকাম এবং মিডল ইনকাম গ্রুপ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেক্ষেত্রে সরকারকে এই জায়গায় বিশেষভাবে ব্যবস্থা নেয়া দরকার। আমি মনে করি জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধিতে সরকারের ভর্তুকি দেয়া উচিত ছিল। আমাদের পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের অদক্ষতা তো আছেই। ইন্ডিয়াতে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য ওঠা-নামার সাথে সেখানকার মূল্য ওঠা-নামা করে। ওরা মার্কেট লিংক করে দিয়েছে। আমাদের এখানেও গভর্নমেন্ট ফিক্স না করে যদি মার্কেট লিংক করে দিত একটা ফর্মুলা দিয়ে তাহলে কিন্তু আমাদের এখানেও সামঞ্জস্য রেখে দাম ওঠা-নামা করতো।

প্রত্যয় : মন্ত্রণালয় থেকে বলা হচ্ছে, বিপিসি ৪৮ হাজার কোটি টাকা লাভ করেছে। যা দিয়ে দুটো পদ্মা সেতু নির্মাণ করা যায়। এটাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

ড. এম. এ. বাকী খলিলী : আমরা সবসময় ক্রস সাবসিডাইজেশনের কথা বলি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিপিসি এটা করতে পারত। কারণ তার অঙ্কটা যাই হোক সেই সারপ্লাসটা যদি এখানে আনত তাহলে কিন্তু ফুয়েলের দাম বাড়ানোর প্রয়োজন ছিল না। যদি সারপ্লাস না-ও থাকতো আমি মনে করি সরকার বহু জায়গায় আয়-ব্যয় করছে কিন্তু এই জায়গাটাতে যেখানে মোটা দাগে গরিব মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে সেখানে সাবসিডি দেয়াটা খুব জরুরি ছিল। এটা নিশ্চিত না যে, সাবসিডি এলিমেন্ট করে যে রেটটা ঠিক করলো এটা কখনো কমবে বলে মনে হয় না এবং এটা একটা স্থায়ী বোঝা।

প্রত্যয় : সরকার ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তা ব্যবসায়ীসহ ক্ষুদ্র আকারের ব্যবসায়ী যারা এনজিও/এমএফআই থেকে স্বল্প ঋণ নিয়ে ব্যবসা করছেন সবার জন্যই প্রণোদনা দিয়েছেন– আপনার পর্যবেক্ষণ কি?

ড. এম. এ. বাকী খলিলী : প্রণোদনাটা প্রয়োজন ছিল। কারণ, যখন লকডাউন ছিল তখন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ঋণ আদায় করতে পারছিল না। সেক্ষেত্রে সরকার যে এনজিও/এমএফআইদের জন্য প্রণোদনা দিয়েছে এটা কিন্তু একটা কুশন হিসেবে কাজ করেছে এবং এটার দরকার ছিল।

প্রত্যয় : দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে এসএমই ঋণের গুরুত্ব কতখানি বলে আপনি মনে করেন? ব্যাংক, নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও এনজিও সেক্টরও এ খাতে ঋণ প্রদান করে থাকে। আপনার কোনো প্রস্তাবনা আছে কি?

ড. এম. এ. বাকী খলিলী : গুরুত্ব তো অনেক আছে। আমরা জানি না যে এর প্রভাব কতোটা কিন্তু আমরা নরমালি বলি, জিডিপিতে ২৫ থেকে ৩০% এর একটা অবদান এসএমই খাতের রয়েছে। যদিও প্রিসাইজ এস্টিমেশন অতেটা আসেনি। সরকারের একটা অ্যাসেসমেন্ট আমরা পাই যেটা ২৫%। সেই আলোকে অনেকে বলে যে এটা ৩০% এর মতো। এসএমইর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ব্যাংকগুলো ফাইন্যান্স করছে। তারা মূলত মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজে ফাইন্যান্স করছে বা অল্প কিছু স্মল এন্টারপ্রাইজকে ফাইন্যান্স করছে। আমি বিশেষ করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যাপারে কনসার্ন। সেক্ষেত্রে ব্যাংক পুরোপুরি তাদেরকে ঋণ সরবরাহ করতে পারবে না। কিছুদিন আগে সরকার এসএমই ফাউন্ডেশনকে ৩০০ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে। তারা মূলত একটা অর্গানাইজড স্মল সেক্টরকে নিয়ে কাজ করে। কিন্তু গ্রামে-গঞ্জে যে অসংখ্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা রয়ে গেছে সেই উদ্যোক্তা তো ব্যাংকের বাইরে। আমি আগেই বলেছি, ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত চাহিদা বেড়েছে কারণ, আপনারা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আমার কাছে মনে হয়, উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ঋণের সীমা বাড়িয়ে তাদেরকে আরো নেটওয়ার্কের আওতায় আনা। এটা আনলে দুটো জিনিস হবে– একটি হলো ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কারণে বিশেষ করে রুরাল এরিয়ায় একদিকে যেমন প্রোডাকশন বাড়বে, কর্মসংস্থান বাড়বে তেমনি দারিদ্র্য বিমোচনে বড় ভূমিকা রাখবে।

প্রত্যয় : ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা কি মূল ধারায় আসতে পারছে নাকি তাদের জন্য আরো স্পেশালাইজড কিছু করা দরকার বলে আপনি মনে করেন?

ড. এম. এ. বাকী খলিলী : হ্যাঁ। অনেক এমএফআই আছে যারা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের নিয়ে কাজ করে। কিন্তু যেভাবে দরিদ্র মানুষদের নিয়ে কাজ করছে মেইনল্যান্ডে, সেই অর্থে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা কিন্তু একটু পিছিয়ে আছে। যেমন হাওর এরিয়ার কথা বলি একটু ডিসকানেক্টেড। এরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। ওদের পোভার্টি লেভেল কিন্তু অনেক বেশি। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় গভর্নমেন্টের প্রোগ্রাম যাই থাকুক সেটা সাফিসিয়েন্ট কি না তা আমরা বুঝতে

পারছি না। তাদের জন্য দরকার টার্গেটেড প্রোগ্রাম এবং সেক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো একটি বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। এখন শুধু প্রবাহটা একটু বাড়িয়ে তোলা দরকার। যাতে তাদের দারিদ্র্য বিমোচনটা একটু দ্রুতভাবে করা যায়।

তবে একটা বিষয় আমি সবসময় বড় করে দেখি, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো যেটি করেছে সেটি হলো শিক্ষা। শিশুদের, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা। আমার কাছে মনে হয়, হাওর এলাকার আদিবাসীদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা নিয়ে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো যদি কাজ করে তাহলে দীর্ঘমেয়াদে এদের দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব হবে।

প্রত্যয় : রাজশাহীতে ওঁরাও উপজাতির একটি কলেজ পড়ুয়া কিশোরকে তার ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের কথা জানতে চাইলে জবাব দিতে পারেনি। আসলে সে তার লক্ষ্য নিয়ে কখনো ভাবেইনি। কী উত্তর দেবে খুঁজে পাচ্ছিলো না। ওদের এই বাধাটা, এটা কাটিয়ে ওঠার জন্য এনজিওরা কোনো উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারে বলে মনে করেন কি?

ড. এম. এ. বাকী খলিলী : আপনি যে ছেলেটির কথা বললেন, আমি মনে করি তার কাছে তথ্যের অভাব আছে। সামনে কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে এ তথ্য তার কাছে নেই। ভবিষ্যতের জন্য কোন তথ্য দরকার, কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে সেই তথ্যটা তাদের কাছে থাকা উচিত– এ জায়গাতে এনজিও/এমএফআই কাজ করতে পারে। সম্প্রতি একটি গবেষণার ফলাফলে দেখলাম, আদিবাসী ছেলেমেয়েরা শিক্ষায় পিছিয়ে আছে। এখানেও এনজিও সেক্টরের ব্যাপক কাজ করার সুযোগ আছে।

বুরো বাংলাদেশ অনেক পুরনো প্রতিষ্ঠান। নিশ্চয় আপনাদের কাছে অনেক তথ্য আছে যে এদের ছেলেমেয়েরা কি রকম শিক্ষিত হয়েছে এবং যারা শিক্ষা নিয়েছে সেই পরিবারগুলো কেমন আছে। আমি সবসময় বলি যে, ২০ বছরের বিনিয়োগে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব। কারণ, কোনো পরিবারের একটি ছেলে বা মেয়ে শিক্ষিত হলে, মানুষ হলে সেই পরিবার দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সময় আমি অনেক ছেলেমেয়েকে দেখেছি যারা ক্ষুদ্র ঋণী পরিবারের সদস্য এবং আমার ডিপার্টমেন্টে যারা ভর্তি হয়েছে তারা কোনো কোটার আওতায় ভর্তি হয়নি। সবাই নিজেদের মেধার জোরে। তারা আজ ব্যাংকসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে এবং ভালো অবস্থায় আছে। এই সুযোগটা তৈরি করার পেছনে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরাট অবদান রয়েছে।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ক্ষেত্রেও আমি একই কথা বলবো, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান টার্গেটেড ওয়েতে এগুতে হবে। টার্গেটেড ওয়ে ছাড়া সেখানে চলবে না। সরকার যেটি দেয় সেটি সাধারণ কর্মসূচির আওতায় দিচ্ছে। কিন্তু এখানে যদি এনজিও/এমএফআই টার্গেটেড কর্মসূচি নিয়ে আসে এবং শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে আসে তাহলে তাদের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

প্রত্যয় : সেক্ষেত্রে সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ পলিসিটা যদি আর একটু আলোর মুখ দেখে তাহলে আপনার কি মনে হয় না যে এই ধরনের ছেলেমেয়েদের উঠে আসার সম্ভাবনা আরো বাড়বে? কারণ তখন তারা হাতের কাছেই কোনো না কোনো সম্ভাবনার ক্ষেত্র খুঁজে পেতে পারে?

ড. এম. এ. বাকী খলিলী : অবশ্যই এবং আমি বর্তমান সরকারের প্রশংসা করি, কারণ প্রধানমন্ত্রী বলেন প্রতি জেলায় তিনি একটা ইউনিভার্সিটি করতে চান। এটা সরকারের জন্য করা সম্ভব হবে, কেননা এটা অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর হবে না। কিন্তু শিক্ষাকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সকলের দোরগোড়ায় নিয়ে যাবেন। এতে হবে কি এই শিক্ষাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য সুযোগগুলো সৃষ্টি হবে।

প্রত্যয় : ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনায় পিকেএসএফ বিভিন্ন এনজিওদের ঋণ প্রদান করে। অন্যদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি সহায়তায় অন্য ব্যাংকগুলোও 'ব্যাংক-এনজিও লিংকেজ' ঋণ সহায়তা দেয়। এই প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে আপনার পর্যবেক্ষণ তুলে ধরবেন কি?

ড. এম. এ. বাকী খলিলী : একটা স্বীকৃতি তো পিকেএসএফকে দিতেই হয়। ক্ষুদ্রঋণের প্রসারের ক্ষেত্রে পিকেএসএফ একটি বড় ভূমিকা রেখেছিল। এক সময় যখন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম ছিল তখন পিকেএসএফ প্রধান সাপ্লায়ার হিসেবে হোলসেল লেন্ডিং করত। এখন পিকেএসএফ চাইলেও সেভাবে ক্ষুদ্রঋণ দিতে পারবে না। গত এক দশক ধরে আমরা দেখছি যে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নিচ্ছে। এর কিছু ইতিবাচক দিক আছে।

আমার প্রস্তাবনা হলো– এক. সরকার বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে পারে ক্ষুদ্রঋণের জন্য। এতে সরকারের কন্ট্রিবিউশন থাকবে, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো কন্ট্রিবিউশন করবে, ব্যাংকগুলো সাবস্ক্রাইব করবে শেয়ার এমনকি দরিদ্র ঋণী তারাও এটাতে সাবস্ক্রাইব করতে পারে। এটা দিয়ে একটি বিশেষায়িত দারিদ্র্য বিমোচন ব্যাংক করা যায় যার কাজই হবে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে ঋণ সরবরাহ করা। আমার কাছে মনে হয় তখন এটা প্রো-পুওর অ্যাপ্রোজ থাকবে। এখন যেমন ব্যাংকগুলোর সঙ্গে ডিল করতে সমস্যা হয়, এই সমস্যাটা তখন অনেক কমে যাবে। আমার ডিজাইনে এটা ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে ফাইন্যান্স করবে। এই ব্যাংক মার্জিনাল প্রফিট করবে, হাজার হাজার কোটি টাকা প্রফিট করার কোনো দরকার নেই এদের।

দ্বিতীয় যেটি করতে পারে সেটি হলো, এমআরএ একটি ভূমিকা নিতে পারে। এমআরএ বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে ফাইন্যান্স করা বা দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প নিতে পারে লো-ইন্টারেস্ট রেটে। তাহলে ফান্ডের প্রবলেমগুলো দূর হবে।

তৃতীয়ত ব্যাংক যখন মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজে সাকসেসফুল হবে তখন কিন্তু আর এনজিওদের কাছে আসবে না। তখন একটা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে থাকতে হবে। আমি মনে করি অল্টারনেটিভ ইনস্টিটিউশনাল ফ্রেমওয়ার্ক হওয়া উচিত।

প্রত্যয় : আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক এবং একজন অর্থনীতিবিদ। আপনি কি মনে করেন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে ক্ষুদ্র অর্থায়ন সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন?

ড. এম. এ. বাকী খলিলী : নিশ্চই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্টে থাকাকালীন সময়ে আমি মাইক্রোফাইন্যান্স বিষয়ে একটা কোর্স চালু করেছিলাম। আমি বিশ্বাস করি ওটা এখনো আছে। ঢাকা ইউনিভার্সিটির ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজেও মাইক্রোফাইন্যান্স কোর্স পড়ানো হয়। আমি মনে করি যে, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধীনে যে সকল কলেজ আছে সেখানেও এটি পড়ানো উচিত। দুটি কারণে পড়ানো উচিত। এক হচ্ছে, ক্ষুদ্রঋণ অর্থনীতিতে একটি বড় অবদান রাখছে। আমাদের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে দেখেছি জিডিপিতে ১২%-১৮% অবদান রাখছে এ সেক্টর। এত বড় একটা সেক্টর যেখানে জিডিপিতে ১২% থেকে ১৮% অবদান রাখছে সেই সেক্টর সম্বন্ধে কেউ জানবে না এটা ঠিক না।

দ্বিতীয়টি হলো, ছাত্রদের পড়ানো উচিত এ কারণে যে, মাইক্রোফাইন্যান্স ইনস্টিটিউট এখন খুব অর্গানাইজড এবং এটি একটি ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট। সেক্ষেত্রে এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি রয়ে গেছে। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যার সম্যক জ্ঞান আছে তাকেই এখানে রিক্রুট করতে হবে। অতএব কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে– আমি মনে করি এ বিষয়ে পাঠদান করা উচিত। আরেকটি জিনিস বলি– আমাদের এখানে কিন্তু নলেজ সৃষ্টি হয় ক্ষুদ্রঋণের আর পশ্চিমা দেশে মাইক্রোফাইন্যান্সের ওপর ডিগ্রি প্রোগ্রামই আছে, আমরা পিছিয়ে আছি। তাই আমার কাছে মনে হয়, এটা চালু হওয়া উচিত এবং আমাদের এখানে একাডেমিক এডুকেশনের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রবর্তন করা উচিত।

প্রত্যয় : ৫০০ কোটি টাকা মূলধন থাকলে ব্যাংক এবং ১৫০ কোটি টাকা মূলধন থাকলে নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাহকদের কাছ থেকে অবাধে সঞ্চয় সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু যেসব এনজিও/এমএফআইয়ের মূলধন এর চেয়েও বেশি তারা "Public Savings" সংগ্রহ করতে পারে না। আইনের এই বৈষম্য নিয়ে আপনার মতামত জানতে চাচ্ছি?

ড. এম. এ. বাকী খলিলী : আদর্শিকভাবে আমি চাইব ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো পাবলিক ডিপোজিট মোবিলাইজ করুক। কিন্তু কতগুলো আইনগত দিক আছে। গ্রামীণ ব্যাংক যেমন পাবলিক ডিপোজিট মোবিলাইজ করতে পারে কারণ, ওখানে ইক্যুইটি শেয়ার হোল্ডিং আছে, দায়টা গ্রামীণ ব্যাংক নিয়েছে এবং তার একটা লিগ্যাল কভারেজ আছে। কিন্তু পাবলিক ডিপোজিট যদি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে নিতে হয় তাহলে তার আইনগত ভিত্তিটা থাকা দরকার। পাবলিক ডিপোজিট নিলে তার গ্যারান্টি দিতে হবে। তাই আমি মনে করি এটা সম্ভব কিন্তু

আইনগত দিকটা থাকতে হবে এবং এই পলিসিটা এমআরএ এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের করা উচিত।

প্রত্যয় : বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়নের সার্ভিস চার্জ প্রসঙ্গে অনেকেরই মন্তব্য এই হার ব্যাংক সুদহারের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু ব্যাংকের কার্যক্রম এবং এমএফআই খাতের কাজের ধারার মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। আপনার মূল্যায়ন ও প্রস্তাবনা কি?

ড. এম. এ. বাকী খলিলী : ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের দোরগোড়ায় গিয়ে সেবা দিচ্ছে, সেক্ষেত্রে ব্যাংকের চেয়ে তাদের সুদহার বেশি হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে এটা প্রতিযোগিতামূলকভাবে করতে হবে। কারণ দক্ষতা দিয়ে কিন্তু সুদহার কমানো সম্ভব। আগে যেমন ৫ হাজার টাকা ২০ জনকে দিলে ২০ বার ট্রানজেকশন হতো এখন ১ লাখ টাকা একজনকে দিলে ট্রানজেকশন প্রিরিয়ডটা কমে আসে। কাজেই আমি বলবো যে, দক্ষতা দিয়েই সুদহার কমানো সম্ভব। এখন যেমন এনজিওগুলোর ফ্ল্যাট ইন্টারেস্ট ২৪%, আমি চাইবো কোনো এনজিও স্বপ্রণোদিত হয়ে বলুক আমরা ২০% দেব। স্বপ্রণোদিত হয়ে করলে দক্ষতার সাথে সাথে কস্ট অব প্রোডাকশন লোন দেয়াটা কমে যাবে।

প্রত্যয় : দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রদানের ক্ষেত্রে বড় আকারের এমএফআই প্রতিষ্ঠানসমূহ তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এ সকল ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যাংক সুদহার কমনো যায় কি না– আপনার প্রস্তাবনা কি?

ড. এম. এ. বাকী খলিলী : আমি আশা করি একটা সময় দেশে দরিদ্র মানুষ থাকবে না। রাজনীতিবিদরা যেমন স্বপ্ন দেখে, ঠিক আমিও তেমনি স্বপ্ন দেখি দেশে দরিদ্র মানুষ থাকবে না। যদিও সম্ভাবনা খুব কম। কারণ, যে কারণে দরিদ্র মানুষ সৃষ্টি হয় তার অনেকগুলো দেখি বিভিন্ন জায়গায়। যখন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ শুরু করেছিল তখন দারিদ্র্যের হার ছিল প্রায় ৬৮%। সেখান থেকে কমতে কমতে এটি এখন ২৪% এ চলে এসেছে, যদিও করোনার কারণে একটু বেড়েছে। ৬০ এর ঘর থেকে ২০ এর ঘরে এসেছে। এর পুরোটাই কি সরকারের কর্মকাণ্ডের ফল? না। আমি মনে করি একটি অংশ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের।

ধরুন এনজিও/এমএফআই প্রতিষ্ঠানগুলোর সদস্য সংখ্যা ৩ কোটি। সরকারের আদমশুমারি অনুযায়ী যদি লোক গণনা ১৬ কোটি ঠিক থাকে তাহলে মোট জনসংখ্যার ৫ ভাগের এক ভাগ দারিদ্র্যমুক্ত করতে পেরেছে এনজিওগুলো। তার মানে দারিদ্র্য বিমোচনে এনজিওদের একটা বড় অবদান রয়ে গেছে। যদিও দুঃখজনক হলো সরকার অনেক সময় এটা বুঝতে চায় না। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষেত্র কিন্তু প্রচুর। গ্রামীণ এলাকায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির বড় ভূমিকা আছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ফাইন্যান্স করার জন্য কোটি কোটি টাকার চাহিদা আছে, সেক্ষেত্রে এনজিওদের কাজ করতে হবে। সামাজিক উন্নয়নে এনজিওদের কাজ করার সুযোগ আছে।

২০০৮ সালে যে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল তখন কিন্তু বাংলাদেশে এর প্রভাব পড়েনি। কারণ, রুরাল ইকোনমিক রিজিয়নগুলো এখানে খুব বেশি। আর এই রিজিয়ন্সে এনজিও সেক্টরের বড় ভূমিকা আছে। আমি মনে করি, ক্ষুদ্রঋণের পরিধি বাড়বে, সক্ষমতা বাড়বে। তাই ক্ষুদ্রঋণের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার ন্যূনতম কোনো সন্দেহ নেই।

প্রত্যয় : আপনি বলেছেন যে, সার্ভিস চার্জ যদি আরো কমিয়ে আনা যায় তাহলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী আরো বেশি লাভবান হবে। সেক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংকের মতো সক্ষমতা যে সমস্ত এনজিও/এমএফআই প্রতিষ্ঠানগুলোর আছে তাদেরকে আইনগত ভিত্তি দিয়ে ব্যাংকিং লাইসেন্স দেয়া যায় কি না?

ড. এম. এ. বাকী খলিলী : অবশ্যই যায়। গ্রামীণ ব্যাংকের ইক্যুইটি আছে, ওনারশিপ আছে, ঋণীরা আইনগতভাবে মেম্বার। ডিভিডেন্ড পায় কি পায় না সেটি পরের কথা, এটার একটি চরিত্র হলো, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন হিসেবে তাকে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে। আরেকটি জায়গা হলো সরকারি রেটের মতো লেন্ডিং ইন্টারেস্ট ডিক্লাইন ব্যালেন্স কম আছে। আমি মনে করি কিছু মাইক্রোফাইন্যান্স ব্যাংক হওয়া উচিত কিন্তু আমি বলবো এ ব্যাপারে কম বাণিজ্যিকিকরণ করতে হবে। দেখতে হবে অবজেক্টিভটা পূরণ হচ্ছে কি না, কোথায় কাজ করছে। আমি চাই না ইন্ডিয়ার মতো হোক। ব্র্যাকে যিনি ছিলেন, চন্দ্র শেখর, তিনি বন্ধন ব্যাংক করেছেন, সারা ইন্ডিয়াতে তাদের ব্রাঞ্চ। আমি গিয়েছি সেখানে। আমি চাই যে অবজেক্টিভটা অর্জন করতে হবে। যাতে হুট করে না করা হয়, আগে পলিসি ঠিক করতে হবে কোন এরিয়ায় কাজ করবে। আপনাকে কমার্শিয়াল ব্যাংকিং অপারেশন করতে দেয়া হলো আর আপনি রুরাল এরিয়া থেকে উঠে চলে আসলেন শুধু লাভের দিকটা চিন্তা করে।

আমি চাইব যে ব্যাংক হোক, রুরাল এরিয়াতে থাকুক, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ফাইন্যান্স করুক। রুরাল ইকোনমির গ্রোথ হোক। কমার্শিয়াল ব্যাংক হওয়ার দরকার নেই, এটা হওয়া উচিত দরিদ্রদের জন্য বিশেষায়িত ব্যাংক। এমন ব্যাংক অন্যান্য দেশেও হচ্ছে কিন্তু অন্যান্য দেশের নেতিবাচক দিকগুলো আমাদের পরিহার করতে হবে। এজন্য আমি মনে করি এমআরএর একটা পলিসি দরকার। চিন্তা করতে হবে ব্যাংক হলে সেটি এমআরএ'র অধীনে থাকবে, না বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে। তখন ২০% রিজার্ভ রাখতে হবে। তার মানে ১০০ টাকা ডিপোজিট মবিলাইজ করলে ৮০ টাকা আয় করতে পারবে। অনেক রেগুলেশনের মধ্যে কাজ করতে হবে। রেগুলেশনের একটা কস্ট আছে। এই সমস্ত জিনিসগুলো চিন্তা করে আমি চাইবো এমআরএর অধীনে মাইক্রোফাইন্যান্স ব্যাংক হোক।

কিন্তু বর্তমানে এমআরএ'র সেই সক্ষমতা নেই। আমি বলছি যখন, তখন আপনারা লিখলেও কোনো অসুবিধা নেই যে, এমআরএ'র সেই সক্ষমতা নেই মাইক্রোফাইন্যান্স ব্যাংক পরিচালনা করার। আমি চাই এমআরএকে শক্তিশালী করে ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে স্পেশাল কিছু করা উচিত।

> **ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের দোরগোড়ায় গিয়ে সেবা দিচ্ছে, সেক্ষেত্রে ব্যাংকের চেয়ে তাদের সুদহার বেশি হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে এটা প্রতিযোগিতামূলকভাবে করতে হবে। আগে যেমন ৫ হাজার টাকা ২০ জনকে দিলে ২০ বার ট্রানজেকশন হতো এখন ১ লাখ টাকা একজনকে দিলে ট্রানজেকশন প্রিরিয়ডটা কমে আসে। কাজেই আমি বলবো যে, দক্ষতা দিয়েই সুদহার কমানো সম্ভব।**

প্রত্যয় : বুরো বাংলাদেশ এর প্রকাশনা প্রত্যয় ম্যাগাজিনটি আপনি দেখেছেন। এখানে যে ধরনের কনটেন্ট থাকে তা সঠিক পথে আছে কি না বা আর কি করলে ম্যাগাজিনটিকে জনগণের কাছে নেয়া যাবে বলে আপনি মনে করেন?

ড. এম. এ. বাকী খলিলী : আমি প্রত্যয়ের আগের সংখ্যাগুলো পড়েছি এবং আমার কাছে ভালো লেগেছে। আপনি বলেছেন যে বিষয়বস্তু খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে কি না। এটা মূলত নির্ভর করছে কোন ধরনের পাঠকদের টার্গেট করা হচ্ছে। প্রত্যয়ের মাধ্যমে যদি চেঞ্জ আনতে চান, প্রচার চান তাহলে ম্যাটার করবে স্টেক হোল্ডার অ্যান্ড পলিসি মেকার। তাদের জন্য কিছু সিরিয়াস জিনিস আপনাকে রাখতে হবে। আমি চাইবো যে এই ম্যাগাজিনটিতে প্রান্তিক মানুষের তথ্য থাকবে, তাদের অর্জন-ব্যর্থতা থাকবে। তাদের সাফল্য আমরা বেশি জানি না।

আমি চাইবো ঋণীর সফলতা, ঋণী পরিবারের ছেলেমেয়েদের সফলতার গল্পগুলো এখানে উঠে আসুক। তার সঙ্গে সিরিয়াস বিষয় তো কিছু থাকবেই। তাহলে দুটো পারপাস সার্ভ করবে। একটি হলো, যখন তাদের সফলতা বা ব্যর্থতার কারণগুলো নিয়ে কথা বলবেন তখন কিন্তু তাদের গল্পগুলো আপনি তুলে ধরছেন। অন্যরাও এই তথ্যগুলো তুলে নিতে পারবে, জানতে পারবে তাদের সফলতা বা ব্যর্থতার কি কারণ রয়েছে। আমি মনে করি প্রত্যয় যে কাজটি করছে এটি অধিকাংশ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে নেই। তাদের সিডিএফ আছে, নেটওয়ার্ক আছে কিন্তু এ ধরনের প্রকাশনা নেই। আমি মনে করি এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি আরো বিস্তৃত পরিসরে হোক, একাডেমিক ইনস্টিটিউশনে হোক। যাতে তাদের কোর্সগুলো পড়ানোর জন্য এটা তথ্যের উৎস হিসেবে থাকে। আমি প্রত্যয়ের সফলতা কামনা করি।■

দিবালোক সিংহ

নির্বাহী পরিচালক, দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র-ডিএসকে

স্বাধীনতার ৫০ বছরে দরিদ্র মানুষের স্বপ্নসাধ পূরণ হয়নি

দেশের অন্যতম বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন ডিএসকে এর প্রধান নির্বাহী দিবালোক সিংহ একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা দেশখ্যাত রাজনীতিবিদ কমরেড মণি সিংহ। ছোটবেলা থেকেই প্রখর মেধাবী দিবালোক সিংহ ১৯৮৪ সালে রাশিয়া থেকে এমবিবিএস পাসের পর দেশে ফিরে ঢাকায় একটি হাসপাতালে যোগদান করেন, এ সময় শহরের বস্তিবাসীদের চিকিৎসাহীন মানবেতর জীবন তাঁর হৃদয়ে দারুণ মর্মপীড়া জাগায়। তিনি উপলব্ধি করেন এসব দরিদ্র অসহায় বস্তিবাসীদের জীবনমান উন্নয়নসহ তাদের চিকিৎসার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এ জন্য তিনি কয়েক বন্ধুকে নিয়ে তেজগাঁও রেল স্টেশনের কাছে কয়লার বস্তিতে 'নিরাময় ফ্রি ফ্রাইডে ক্লিনিক' শুরু করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে তাঁর নেতৃত্বেই গড়ে ওঠে দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (DSK) নামের এই এনজিও/এমএফআই।

বর্তমানে এটি ১৭ জেলার ১১৬টি উপজেলায় বিস্তৃত রয়েছে। প্রায় ৮,৪০,০০০ মানুষের কাছে তারা স্বাস্থ্যসেবাসহ আর্থিক ঋণ সহায়তা প্রদান করছে। ডিএসকে দরিদ্র, দুঃস্থ ও অসচ্ছল মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবা খাতে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ১৯৮৮ সালের বন্যা মুহূর্তে ডিএসকে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় দুঃস্থ বস্তিবাসীদের ফ্রি চিকিৎসা প্রদান করে। সেই ধারাবাহিকতাকেই এ প্রতিষ্ঠানটি নেত্রকোনার দুর্গাপুরে গড়ে তুলেছে ডিএসকে মাতৃসদন ও ল্যাবরেটরি। বর্তমানে এটি হাসপাতালে রূপান্তরিত হয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা শহরসহ জামালপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, সাতক্ষীরা, যশোর, বগুড়া, বাগেরহাট এবং কক্সবাজারে সংস্থার ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম রয়েছে।

প্রত্যয়কে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে ডা. দিবালোক সিংহ যা বলেন তা এখানে উপস্থাপন করা হলো:

প্রত্যয় : প্রথমেই জানতে চাচ্ছি, কোন চিন্তা-ভাবনা থেকে আপনি দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (DSK) প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আপনারা দীর্ঘ প্রায় ৩৩ বছর ধরে স্বাস্থ্যসেবা, হাসপাতাল, ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন, দারিদ্র্য নিরসন, নারীর ক্ষমতায়ন ও মাইক্রোক্রেডিটসহ বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছেন। আপনাদের সফলতা সম্পর্কে বলুন।

দিবালোক সিংহ : দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রায় তিন দশক পেরিয়ে গেছে। আমি রাশিয়ার একটি মেডিকেল কলেজ থেকে চিকিৎসক হিসেবে ডিগ্রি নিয়েছি। যার ফলে আমি রোগী দেখতে পারি, মানুষের চিকিৎসা করতে পারি। একটা সময় আমার কাছে মনে হয়েছিল যে, বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক কাঠামো, অর্থনৈতিক অবস্থা, রাষ্ট্রীয় কাঠামো পরিবর্তনের এবং দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের যে স্বপ্ন দেখে আমরা বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিলাম, স্বাধীনতার ৫০ বছর পেরিয়ে গেলেও বাংলাদেশের দরিদ্র সাধারণ মানুষের সেই স্বপ্নসাধ পূরণ হয়নি, স্বাধীনতার স্বাদ তারা পাচ্ছে না।

১৯৮৪ সালে যখন আমি রাশিয়া থেকে পড়ালেখা করে দেশে আসি তখন আরো খারাপ পরিস্থিতি ছিল। আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক অনেক বস্তি ছিল। সেখানে অনেকেই মানবেতর জীবনযাপন করতো, যা এখনো অনেকাংশে রয়ে গেছে। তখন আমার কিছু বন্ধু ভালো প্রতিষ্ঠানে চাকরি করত, আমি একটা হাসপাতালে ছিলাম। চিন্তা করলাম তাদের জন্য কি করা যায়? যদিও আমাদের তখন কোনো তহবিল ছিল না। যদি কেউ আমাদের তহবিল দেয় তাহলে তাদের জন্য কিছু করতে পারব। তখন এক বন্ধু বলল, আমাদের যে পেশাগত দক্ষতা-যোগ্যতা আছে সেটি নিয়ে আমরা তাদের কাছে যেতে পারি। আমার আরেক ডাক্তার বন্ধুসহ আমরা ৩/৪ জন মিলে উদ্যোগ নিলাম। প্রথমে আমরা বস্তিতে যাওয়া আসা শুরু করলাম। অনেক গরিব মানুষ চিকিৎসা পাচ্ছে না। তাদেরকে আমরা চিকিৎসা সহযোগিতা করি। এভাবেই ছিল আমাদের শুরুটা। তেজগাঁওয়ে রেল স্টেশনের কাছে কয়লার বস্তি নামে একটা বস্তিতে প্রথমে কাজ শুরু করি। নাম দিলাম নিরাময় ফ্রি ফ্রাইডে ক্লিনিক। এছাড়া তেজগাঁওয়ের বেগুনবাড়িতে আরো একজন আমাদের একটা জায়গা দিল, সেখানে আমরা সপ্তাহে ১ দিন বসতাম। বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভরা ডাক্তারদের কাছে এসে দেখা করে ওষুধ দিয়ে যেত স্যাম্পল হিসেবে। সেখান থেকে আমরা কিছু ওষুধ নিয়ে যেতাম দুঃস্থ দরিদ্র রোগীদের দেয়ার জন্য। এভাবেই কাজটা আমরা শুরু করি।

এভাবে বেশ কয়েক বছর আমরা সেখানে কাজ করি। সে সময় তেজগাঁওয়ে যে সকল কারখানার শ্রমিক ছিল তারাও আমাদেরকে উৎসাহিত করত। নাবিস্কোর মোড়ে ট্রেড ইউনিয়নের একটা অফিস ছিল। তাদের সাথেও আমাদের একটা যোগাযোগ স্থাপিত হলো। তারা তাদের অফিস ব্যবহার করার জন্য আমাদেরকে অনুমতি দিল। সপ্তাহে ১ দিন শুক্রবার আমরা সেখানে যেতাম।

আমার কিছু অগ্রজ শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। দরিদ্র এই মানুষদের সহযোগিতার জন্য তারা ওষুধপত্র ও টাকা-পয়সা সহায়তা দিতেন। তারা বললেন, এটা এভাবে বেশিদিন চলবে না। কারণ, প্রত্যেকেরই জীবনের একটা ধাপ আছে, এখন তরুণ, তারপর মধ্য বয়স, তারপর বৃদ্ধ বয়স। তোমরা এখন যেটা করছ কিছুদিন পর হয়তো সেটা করা সম্ভব হবে না। এছাড়া কেউ যদি সহযোগিতা করতে চায় তাহলে একটা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকলে ভালো হয়। তখন মানুষ সেটার উপর আস্থা স্থাপন করতে পারবে। এই পরামর্শ পাওয়ার পর আমরা একটা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করি। এভাবেই ১৯৮৮ সালে আমাদের দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

প্রত্যয় : প্রথমদিকে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। পরবর্তীতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কীভাবে ফান্ড অর্গানাইজ করলেন?

দিবালোক সিংহ : আমাদের কমিটি গঠনের পর বিভিন্ন বিদেশি দাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করি। ১৯৯১ সালে যে ভয়াবহ সাইক্লোন হয় তখন বিভিন্ন দূতাবাস ধীরে ধীরে আমাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা দেয়া শুরু করলো। আমরা যখন প্রথমে বস্তিবাসীর জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যের জন্য গেলাম তখন তারা একটা প্রসঙ্গ নিয়ে আসলো যে, আপনারা যেটা করছেন ভালো তবে এখানে পানির সমস্যাটা অনেক বেশি। তখন বস্তিতে ওয়াসার কোনো বৈধ লাইন ছিল না। সে সময় আমাদের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী ওয়াসায় চাকরি করতেন। তিনি বললেন, আপনাদের কমিটির সকলকে নিয়ে আমাদের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে দেখা করুন।

আমাদের যুক্তিটা হলো, এই বস্তিবাসীরা তো কোনো না-কোনোভাবে ওয়াসার পানি ব্যবহার করছে। পরোক্ষভাবে অন্যজনের কাছ থেকে বেশি দামে পানি কিনছে। সেই সুবাদে আমরা এই পানি পয়:নিষ্কাশনের সাথে জড়িত হয়ে পড়লাম। প্রথম দিকে আমরা সমস্যাটা বুঝতে পারিনি। আমরা ভাবলাম পানি সমস্যা সমাধানে একটি টিউবওয়েল বসিয়ে দেই। কিন্তু ঢাকা শহরে পানির লেয়ার অনেক নিচে। যার ফলে শ্যালো টিউবওয়েল যে এখানে কাজ করে না এটা আমাদের জানা ছিল না। আমরা টাকা-পয়সা যোগাড় করে টিউবওয়েল বসালাম কিন্তু পানি আর বের হলো না, টাকাটাই জলে গেল। আমরা ওয়াসার পেছনে লেগে থাকলাম। তখন আমাদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ পরে যিনি বাংলাদেশ সরকারের আইনমন্ত্রী হয়েছিলেন। প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপিকা নাজমুন নাহার। আমাদের অফিস কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তিনি তার বাসার একটি কক্ষ আমাদের দিয়েছিলেন।

এক দিন ব্যারিস্টার শফিক সাহেবসহ আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ওয়াসার এমডি'র কাছে গেলাম। এমডি গ্রুপ ক্যাপ্টেন নুরুল ইসলাম সাহেবকে আমাদের প্রয়োজনীয়তার কথা বিস্তারিত বোঝালাম। তিনি বললেন, আমার বিধিতে এদেরকে পানি দেয়ার কোনো এখতিয়ার নেই। তবে আপনাদের জন্য ব্যতিক্রমভাবে কয়েকটি কানেকশন আমি সেখানে দেবো। কিন্তু কোনো কারণে যদি তারা বিল বকেয়া করে তাহলে আপনাদের সেই বিল দিতে হবে। আমরা রাজি হলাম। তারপর থেকে শুরু হলো পানি ও পয়:নিষ্কাশন, যা এখনো চলছে।

প্রত্যয় : আপনার কি মনে পড়ে প্রথম কোন প্রতিষ্ঠান বা দাতা সংস্থা আপনাদের রিমার্কেবল ফান্ড প্রদান করেছিল?

দিবালোক সিংহ : এটা ছিল নেদারল্যান্ডস অ্যাম্বেসি ও একটি এনজিও, ১৯৯০/৯২ সালে।

প্রত্যয় : আপনারা তো প্রথমে শুরু করলেন স্বাস্থ্যসেবা, পরে পানি ও পয়:নিষ্কাশনসহ মাইক্রোফাইন্যান্স যোগ হলো। এটা কোন চিন্তা থেকে করলেন? আরেকটি হচ্ছে শিক্ষা নিয়ে আপনাদের কোনো কাজ আছে কি না এবং সেটি কি ধরনের?

দিবালোক সিংহ : তখনকার সময়ে একটা ধারণা ছিল যে বিদেশ থেকে যেসব সাহায্য-সহযোগিতা আসে তা লুটপাট হয়ে যায়। আমরাও যখন এই কাজটা করার চিন্তা করছি তখনও এই প্রচারটা ছিল যে বিদেশ থেকে দরিদ্র মানুষের জন্য টাকা আসে যা নয়-ছয় হচ্ছে। তখন আমাদের একটা চিন্তা হলো যে বিদেশ থেকে যে সাহায্য-সহযোগিতা আসে তার সথে আমরা যদি যুক্ত থাকি তাহলে তো আর আমাদের কাছে যেটা থাকবে সেটা নয়-ছয় হবে না। এই চিন্তা থেকে আমরা যোগাযোগ করি, যদিও কাউকে খুব একটা চিনি না। গুণমানসম্পন্ন প্রকল্প প্রস্তাব লেখার ব্যাপারে আমাদের কোনো দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা ছিল না। যে কারণে আমরা খুব সফল হতে পারছিলাম না। ছোটখাটো কিছু কাজ পেলেও বড় ফান্ড পাচ্ছিলাম না।

আশির দশকে বিশেষ করে ১৯৮৩ থেকে ১৯৯০ সময়টাতে মাঝেমধ্যে টিভিতে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এর সাক্ষাৎকার প্রচার করা হতো। তিনি কি করছেন, তার চিন্তা ভাবনা কি এসব। মানুষ জানতো যে তিনি লাখ লাখ মানুষকে ঋণ দিচ্ছেন, সেই ঋণ নিয়ে মানুষ খুব সফল, তাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ভালো হচ্ছে। সেই সব প্রচারণায় আমরাও খুব আকৃষ্ট হলাম। আমরা ভাবলাম যে যেহেতু তহবিল জোগার করতে পারছি না তাহলে এটা তো ভালো ব্যবস্থা যে, আমরা যদি তাদেরকে ঋণ তহবিল দিতে পারি তাহলে তারা নিজেদের ভাগ্য নিজেরা গড়ে তুলতে পারবে। তারা নিজেরা আয় করে আবার শোধ দিয়ে দেবে। তো গ্রামীণ ব্যাংকের এই ঋণ দেয়ার ব্যাপারটা আমাদের মাঝে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। এটা করলে তো আমাদেরকে আর অনুদানের পেছনে ঘুরতে হয় না, কারণ অনুদানটা তো এক সময় শেষ হয়ে যাবে।

এরপর আমাদের মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংক সম্বন্ধে জানার একটা আগ্রহ তৈরি হলো। তখন গ্রামীণ ব্যাংকে গিয়ে তাদের কার্যক্রম দেখার এবং বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে

জানার চেষ্টা করি। অধ্যাপক খালেদ শামস নামে এক ভদ্রলোক মালয়েশিয়াতে এপিডিসিতে বড় চাকরি করতেন। তিনি গ্রামীণ ব্যাংকের সাথে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ওই বড় চাকরি ছেড়ে এখানে চলে আসেন। তখন আমরা গ্রামীণ ব্যাংকে তাঁর অফিসে গেলে তিনি আমাদের সাক্ষাৎ দেন। আমরা আমাদের চিন্তাটা তাকে বললাম, আপনাদের এখানে লক্ষ লক্ষ লোক ঋণ পাচ্ছে, স্বাবলম্বী হচ্ছে, আমরাও বস্তিবাসীদের জন্য এরকম করতে চাই। সে জন্য আপনাদের কাছ থেকে ধারণা নিতে এসেছি। তখন গ্রামীণ ব্যাংকের বস্তিবাসীদের নিয়ে কোনো কার্যক্রম ছিল না। তারা গ্রামের মানুষদের নিয়েই কাজ করত। তাদের চিন্তাটা ছিল এরকম, আমরা যদি গ্রামের মানুষদের স্বাবলম্বী করতে পারি তাহলে তারা আর শহরে আসবে না, বস্তিও হবে না।

জাতিসংঘ গ্রামীণ ব্যাংককে একটি তহবিল দিয়েছিল এই শর্তে যে, যারা গ্রামীণের মডেল বাংলাদেশ ছাড়া অন্য দেশে বাস্তবায়িত করতে চায় তাদেরকে গ্রামীণ ব্যাংক এই তহবিল দেবে। ওই প্রজেক্টে ট্রেনিংও ছিল এবং ক্যাপিটালও ছিল।

বলা হলো, দ্বিতীয় ধাপ এলে বাংলাদেশি এনজিওদেরকেও এই তহবিলের কিছু অংশ দেয়া যাবে। প্রথমে এটা ছিল না। তখন তিনি বললেন, কিছুদিনের মধ্যে আমরা বাংলাদেশি কিছু এনজিওকে ডাকবো, আপনাদের নাম-ঠিকানা-ফোন নম্বর রেখে যান।

পরে ড. ইউনূস সাহেব আমাদেরকে গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমের ওপর ব্রিফিং দেন। ওনাদের পক্ষ থেকে আমাদেরকে একটা প্রজেক্ট দিলেন। ঋণ তহবিলসহ কয়েক লক্ষ টাকা, কম্পিউটার এবং আরো অনেক কিছু। সেই থেকেই আমাদের শুরু। সেই সুবাদে প্রথম ক্ষুদ্রঋণের ফান্ড পেলাম গ্রামীণ ব্যাংক থেকে।

প্রত্যয় : এখন মাইক্রোক্রেডিটের যে তহবিল সেটা কি আপনারা কোনো ব্যাংক থেকে নেন নাকি দাতা বা অন্য সোর্স থেকে নেন?

দিবালোক সিংহ : না। এখন পরিস্থিতি অন্যরকম। এ বছর আমরা সাড়ে ৩শ' কোটি টাকা নেব ব্যাংক থেকে। আর দেড়শ' কোটি টাকা নেব পিকেএসএফ থেকে। সদস্যদের সঞ্চয় আছে ৩শ' কোটি টাকার ওপরে। আমাদের নিজস্ব ইক্যুইটি আছে ২শ' কোটি টাকার ওপরে। এটা হলো আমাদের এখনকার হিসাব। জিরো থেকে এ পর্যায়ে আসা। এখন আমরা বৈদেশিক তহবিল থেকে মুক্ত। এমআরএ এর নীতিমালা অনুযায়ী আমরা আমাদের প্রফিটের ১৫% পর্যন্ত সামাজিক কাজে ব্যয় করতে পারি এটা আইনসিদ্ধ। সেই প্রফিট থেকে ছোট ছোট হলেও আমরা ৩টি হাসপাতাল পরিচালনা করছি। আমাদের সদস্যদের মেধাবী ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বৃত্তি দিচ্ছি। গত বছর বৃত্তি পেয়েছে ৭শ' জন এবং এটি ক্রমবর্ধমান। এ বছর আমরা বাজেট রেখেছি দেড় কোটি টাকা। আমরা হসপিটাল পরিচালনার জন্য নিজস্ব মাইক্রোফাইন্যান্স থেকে খরচ করছি ১ কোটি ২০ লাখ টাকা, এটা কারো দান নয়। মাইক্রোফাইন্যান্সে এ মুহূর্তে আমাদের ১শ' ৮৯টি শাখা রয়েছে। গত অর্থবছরের ৩০ জুন পর্যন্ত আমাদের আউটস্টান্ডিং হলো ৮৫৭ কোটি টাকা।

প্রত্যয় : ব্যাংকগুলো থেকে যখন আপনারা প্রাথমিকভাবে ঋণ চাইলেন তখন ব্যাংকগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল?

দিবালোক সিংহ : এখন যে পরিস্থিতি আর তখনকার পরিস্থিতির মধ্যে অনেক পার্থক্য। তখন ব্যাংকাররা মাইক্রোফাইন্যান্স মার্কেটে টাকা দিলে কোনো কিছু না করেই পুঁজি এবং সুদ দুটোই পেয়ে যাবে এটা বুঝতে পারেনি। এখন বুঝতে পেরেছে এবং বুঝতে পারার ফলে ঋণ দেয়ার জন্য তারা নিজেরা এগিয়ে আসছে।

প্রত্যয় : আপনাদের পরিচালিত হাসপাতাল এবং কমিউনিটি ক্লিনিক সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি?

দিবালোক সিংহ : মূলত আমাদের হাসপাতালে দরিদ্র মানুষদের সেবা দেই, তবে মধ্যবিত্তরাও আসতে পারে এতে কোনো বাধা নেই। কারণ, হাসপাতালটা একদম বিনা পয়সায় চলছে না। আমাদের একটা নীতিমালা আছে, যদি আমাদের সদস্য বা সদস্যদের পরিবারের কেউ (মোট ৬জন) অসুস্থ হয়ে ঐ বছরে হাসপাতালে ভর্তি হয় তাহলে তারা দশ হাজার টাকা অফেরতযোগ্য অনুদান পাবে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসার জন্য। গত অর্থবছরে আমরা এ খাতে ব্যয় করেছি প্রায় পৌনে তিন কোটি টাকা। আমাদের ১৮৯টা শাখা থেকে যে চাহিদা আসে সে অনুযায়ী আমরা দিয়ে দেই। আমাদের ঢাকার হাসপাতালটি ৩০ বেডের, দুর্গাপুরেরটি ১৫ বেডের এবং গাজীপুরেরটি ১০ বেডের।

প্রত্যয় : দুর্গাপুরে যে হাসপাতালটি আছে সেটি থেকে আদিবাসীরাও তো সেবা পাচ্ছে।

দিবালোক সিংহ : আদিবাসী বিষয়ক কিছু প্রকল্প আমরা বিভিন্ন সময় নিয়েছিলাম, এখনো চলমান আছে। ফলে সে সমস্ত প্রকল্পে তারাও যুক্ত থাকে। যুক্ত থাকার কারণে যদি কোনো স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজন হয় তখন সেটা তারা নিয়ে থাকে।

প্রত্যয় : আপনি ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশনের রূপরেখা প্রথমেই বলেছেন। এটাকে কীভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার চিন্তা করছেন?

দিবালোক সিংহ : জাতিসংঘ ২০১০ সালে পানি ও পয়:নিষ্কাশন সেবাকে মানবাধিকার হিসেবে ঘোষণা করে। আমাদের এখানে সাধারণ দরিদ্র জনগণ যারা শহর এলাকায় থাকে বা বড় শহরে থাকে তারা সাধারণ, বিভিন্ন বস্তি এলাকার। সেখানে পানি সরবরাহ ব্যবস্থাটা খুব সংকুচিত। ফলে পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে কীভাবে সহজ করা যায় সে জন্য আমরা একটা মডেল দাঁড় করিয়েছি। বস্তিবাসীদের মূল বক্তব্য হলো তাদের পানি দরকার। দ্বিতীয় হলো পানিটা সহজে কীভাবে পাওয়া যায়; সাধারণভাবে যদি মার্কেট থেকে কিনতে হয় তাহলে সেটার যে দাম আর ওয়াসার পানির যে দাম– এ দুটোর মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। অর্থাৎ বাজারের দামটা বেশি, ওয়াসার দাম সেই তুলনায় কম। আমরা এই জিনিসটা ওই সময় ওয়াসাকে বুঝিয়েছিলাম যে, ঢাকা শহরে আপনাদের পানি ছাড়া আর কারো পানি নেই। ঢাকা শহরে যে কোনো সোর্সই থাকুক না কেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আপনাদের পানিই তাদেরকে ব্যবহার করতে হচ্ছে। সরাসরি পেলে আপনার দামে পাচ্ছে এবং দামটা আপনার তহবিলে জমা হচ্ছে। কিন্তু পরোক্ষ হলে আপনার পানি হয়তো একজন আনছে, সে টাকা দিচ্ছে বা দিচ্ছে না কিন্তু সে অধিক দামে এসব বস্তিবাসী মানুষের কাছে পানি বিক্রি করছে।

তাহলে সহজ হলো প্রত্যক্ষভাবে যদি তারা আপনার গ্রাহক হয় তাহলে আপনি আপনার দাম পেয়ে গেলেন, তারা সার্ভিসটা পেল। এই যুক্তিটা ওয়াসার পছন্দ হয়েছে এবং এটিই আমাদের ডিএসকে মডেল যে আমরা আইনসঙ্গতভাবে পানি বস্তিবাসীর কাছে সরবরাহ করছি। ফলাফল যেটা হয়েছে, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে যত বস্তিবাসী আছে প্রত্যেক বস্তিতে ডিএসকের নাম বললে চিনবে। কারণ প্রত্যেক বস্তিতে আমরা ঢুকেছি পানি সরবরাহ করার জন্য। দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা আইনসঙ্গতভাবে পানি সরবরাহ

দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালিত নেত্রকোনার দুর্গাপুরে ডিএসকে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

করছি। আমরা আমাদের কৌশলগত পরিকল্পনা অনুযায়ী কয়েকটি জায়গায় কাজ করি। যেমন উপকূলীয় এলাকা, হাওর এলাকা, বস্তিবাসী, দুর্গম এলাকা। ঢাকার বাইরে আমরা টিউবওয়েল, ডিপ টিউবওয়েল, শ্যালো টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। একটা ফিল্টার আছে যেটা লবণাক্ত এলাকায় ব্যবহার করা হয়, সেটাও আমরা দিচ্ছি। যদি পাইপড ওয়াটার প্রয়োজন হয় সেটা দিচ্ছি, যদি ডিপ টিউবওয়েল বসিয়ে সোলার প্যানেল দিয়ে পানি ওঠাতে হয় সেটাও আমরা করে দিচ্ছি।

প্রত্যয় : এ জন্য কি কোনো সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ করেছেন?

দিবালোক সিংহ : দুটি উপায়ে এই কাজগুলো হচ্ছে। একটি হলো, যদি দাতাদের প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করি তখন সেটা দাতাদের টাকায় বাস্তবায়ন করা হয়। সেখানে আমরা সাধারণভাবে বলি যে, আপনারা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটা তহবিল করেন। যে টাকাটা এখানে ইনভেস্ট হবে তার ৫% থেকে ১০% রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাখেন, এটা আমরা নেব না। যদি কোনো সমস্যা হয় তখন এই তহবিল থেকেই সমস্যার সমাধান করা যাবে। এটাকে আমরা বলি অপারেশনাল মেন্টেইনেন্স ফান্ড। যেটা আমরা প্রত্যেক প্রজেক্টেই করে থাকি। আরেকটা জিনিস আমরা করি, যেকোনো প্রজেক্ট ডিএসকে থেকে করা হলে সেখানে একটা কমিউনিটি মোবিলাইজেশন করে থাকি নারীদের নিয়ে। নারীদের ক্ষমতায়নের জন্যই এটা করে থাকি। আমাদের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের প্রায় ৯৭%-ই মহিলা।

প্রত্যয় : অস্ট্রেলিয়া ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশনের জন্য ফান্ড দেয়। আপনারা কি এটা ব্যবহার করেন?

দিবালোক সিংহ : না। আমরা অস্ট্রেলিয়ান ফান্ড সরাসরি ব্যবহার করি না। আমাদের দীর্ঘদিনের সহযোগী হলো পানি ও পয়:নিষ্কাশনের জন্য 'ওয়াটার এইড'। বিভিন্ন জায়গায় তারা এ ধরনের ফান্ড সিকিউর করতে পারে। সেই সূত্রে আমরা অস্ট্রেলিয়ান ফান্ডও ব্যবহার করেছি।

প্রত্যয় : আপনার পিতা প্রয়াত মণি সিংহ ছিলেন এ দেশের একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ। তিনি গরিব-দুঃখী মানুষের জন্য রাজনীতি করতেন। আপনি রাজনীতিতে অংশ না নিয়ে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা গড়ে তুলেছেন। সেক্ষেত্রে আপনার পিতার আদর্শ বাস্তবায়নে ডিএসকে কীভাবে ভূমিকা পালন করছে বলে মনে করেন?

দিবালোক সিংহ : আমাদের দেশে অনেক মানুষ বৈষম্যের শিকার। অল্পসংখ্যক লোক অনেক বেশি ধনী আর বেশিরভাগ লোক অনেক দরিদ্র। এদের মধ্যে পার্থক্যও বিশাল। এই পার্থক্য দূর করতে হলে আসলে আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থারই পরিবর্তন প্রয়োজন। কিন্তু সেটা তো এখন বললে কালকে হচ্ছে না। কিন্তু মানুষের জীবন তো চলমান। এই দৃষ্টিভঙ্গিটা আমার ভেতর কাজ করেছে যে, আমরা আপাতত মানুষকে কিছু সংস্কারমূলক সেবা দিলে সে কিছুটা তো মুক্তি পাবে। কিছুটা তো সুবিধা হবে। এই সুবিধা যদি আমরা দিতে পারি তাতে কিছুটা উপকার তো হলো। রাজনীতির বাইরে গিয়ে আমরা যখন প্রথমে শুরু করেছিলাম তখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ ক্ষমতায় না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের জন্য কি কিছুই করার নেই! কখন ভালো পাওয়ার আসবে, যারা দরিদ্রদের জন্য কাজ করবে সেই অপেক্ষায় না থেকে আমরা অন্তত সংস্কারমূলক কিছু কাজ তো করতে পারি। অর্থাৎ রাজনীতির বাইরে থেকেও সামাজিক সংগঠন করে মানুষের জন্য কাজ করা যায়, তাদেরকে কিছুটা হলেও সহযোগিতা করা যায়। সুতরাং ওই অর্থে আমার বাবার যে রাজনীতি সেই রাজনীতির সাথে এটা সাংঘর্ষিক বলে আমি মনে করি না বরং পরিপূরক।

আমার বাবার চিন্তা ছিল, একটা বৈষম্যহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তৈরি করা। যেটার জন্য তিনি সারাজীবন দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন, অনেকবার জেল খেটেছেন। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি প্রবাসী সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন।

'৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের সময় বাংলাদেশের রাজনীতিতে ৪টা দল ভূমিকা পালন করেছে। ১. আওয়ামী লীগ, ২. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মওলনা ভাসানী), ৩. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফ্ফর আহমেদ) এবং আরেকটি হলো কমিউনিস্ট পার্টি যারা আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে ভূমিকা পালন করেছে। এই দলগুলোর নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে।

প্রত্যয় : এনজিও সেক্টরে আপনারা ক্ষুদ্র অর্থায়ন, কৃষিঋণ, মোবাইল ব্যাংকিং, রেমিটেন্সসহ বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রমেও ভূমিকা রাখছেন। ডিএসকে এর ডিজিটালাইজেশন নেটওয়ার্ক কতটুকু শক্তিশালী বলে মনে করেন?

দিবালোক সিংহ : বাংলাদেশে আমরা যে সমস্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান আছি, কারিগরিভাবে আমরা যত বেশি ডিজিটাইজ হতে পারব, তত বেশি আমাদের প্রতিযোগিতার মঞ্চে যে শক্তি সেটা বজায় থাকবে। এটা যদি বজায় রাখতে না পারি তাহলে আমাদের ক্ষুদ্রঋণের বাজারে যে প্রতিযোগিতা সেখানে টিকে থাকা যাবে না। সুতরাং আমাদের পুরো কর্মসূচিটাই ডিজিটাইজড। অর্থাৎ একটা সফটওয়্যারের ভিত্তিতে এটা চলে। দিন শেষে দেশের প্রতিটি শাখায় আদায় কত, ডিসবার্জমেন্ট কত, সঞ্চয় কত, সমস্ত তথ্য আমাদের কাছে চলে আসছে এবং সফটওয়্যার থাকার ফলেই এটি সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। তবে এখন আরেকটা জিনিস চলে এসেছে–ডিজিটাল ফিল্ড অ্যাপ্লিকেশন। ডিজিটাল ফিল্ড অ্যাপ্লিকেশন বলতে বোঝানো হচ্ছে যে, আমরা ডিজিটাল ফিল্ড ক্রেডিট দিতে পারি কি না। কোনো টাকার ট্রানজেকশন থাকবে না। মাইক্রোফাইন্যান্সে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ব্যবহার যত বেশি করা যাবে, ব্লক চেইন মেকানিজম যত বেশি ব্যবহার করা যাবে তত বেশি খরচ কমবে। বাংলাদেশে একটা সমালোচনা হলো যে, যারা মাইক্রোফাইন্যান্স করে তারা এত বেশি চার্জ করে যে, জনগণের জন্য এটা দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। আমাদের প্রতিষ্ঠানে আমরা গত বছর সিদ্ধান্ত নিয়ে সুদের হার কমিয়ে দিয়েছি। এখন সেটা ১১.৭৫% যেটা আগে ছিল ১২.৫০%।

আবার সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে সুদের হার বাড়িয়ে দিয়েছি। সবাই দেয় ৬%, আমরা দেই ৬.২%। ফলে ক্ষুদ্রঋণের ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করছি আমাদের প্রতিষ্ঠানের

পুরো প্রোগ্রামটা যাতে ডিজিটাইজড থাকে এটা আমরা করেছি সফটওয়্যারের মাধ্যমে এবং আগামীতে আমাদের গ্রাহক যাতে ডিজিটালি সংযুক্ত হতে পারে সে ব্যবস্থাটা করছি।

যারা এখন এজেন্ট ব্যাংকিং করে তারা একটা ডিভাইস ব্যবহার করে সেই ডিভাইস নিয়ে তারা গ্রাহকের কাছে চলে যাচ্ছে। সেখানে গ্রাহকের এন্ড্রয়েট ফোনে ডিভাইসটি সংযুক্ত করলে ওই ফোনের স্ক্রিনে সেই ব্যক্তির কত টাকা আছে, কত টাকা ঋণ আছে, কত সঞ্চয় আছে সমস্ত তথ্য দেয়া যায়। এই পদ্ধতি এজেন্ট ব্যাংকগুলো ব্যবহার করছে। আমরাও চিন্তা করছি যে এ পদ্ধতি আমাদের মেইনস্ট্রিমে করতে পারি কি না। বিকাশের সাথে এ নিয়ে আমাদের কথাবার্তা চলছে। তাদের সাথে একটা নেগোসিয়েশনে আছি যে তারা যদি ডিজবার্সমেন্টে যায় তাহলে তারা যে খরচ নেয় সেটা কে দেবে? গ্রাহকরা এই খরচটা দিতে আগ্রহী নয়।

প্রত্যয় : আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে আপনারা কীভাবে অর্থনৈতিক সেবা প্রদান করছেন? তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এই সেক্টরের আরো কিছু করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন কি না?

দিবালোক সিংহ : প্রথম কথা হলো বাংলাদেশে বাঙালিরাই ৯৯%। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মোটাদাগে ৫০ লাখ লোক আছে। প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা, রীতিনীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ আছে। মূলত: বৈচিত্র্যের মধ্যেই উন্নয়ন। পাকিস্তানিরা এক সময় আমাদেরকে ঔপনিবেশিক কায়দায় শোষণ করত। এমনকি গণহত্যার ভেতর দিয়ে আমাদেরকে উচ্ছেদই করে দিতে চেয়েছিল। আমরা সেই জাতি যারা লড়াই করে, সংগ্রাম করে, মুক্তিযুদ্ধ করে তাদের কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছি। আমাদের এখানে যারা দুর্বল জনগোষ্ঠী তাদেরকে তো আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। যে আদর্শের ভেতর দিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি এটা সে আদর্শের বিরোধী। সুতরাং আমাদের আদিবাসী জনগোষ্ঠী যারা আছে তাদের ভাষা, রীতিনীতি, জমিজমা ইত্যাদি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেটা আমাদেরকে অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে।

আড়াই হাজার বছর আগে তারা এখানে ছিল। তারপর এসেছে দ্রাবির। এরা হলো তামিল। তারপর মঙ্গোলিয়া– চীন থেকে জাপান পর্যন্ত এরা হলো মঙ্গোলীয়। চাকমা, গারো মঙ্গোলীয়। শেষে আসলো আর্য। যারা মধ্য এশিয়া থেকে এসেছে। এদের সবার মিশ্রণে বাঙালি জাতি গঠিত হয়েছে এবং সেই বাঙালি জাতির ইতিহাস ১২শ' বছরের পুরনো।

প্রত্যয় : পিছিয়ে পড়া নৃ-গোষ্ঠীকে নিয়ে এনজিও সেক্টর কোনো একটা ধাপে কিছু কি করতে পারে? যেটা তাদেরকে একটু হলেও সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, চিকিৎসা বাসস্থানের ব্যাপারে ওপরে ওঠাবে?

দিবালোক সিংহ : এখানে প্রায়োগিকভাবে দুই ধরনের ঘটনা ঘটছে। একটি হলো প্রথমত তারা প্রান্তস্থিত, তারপর তারা শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে এবং খুবই দরিদ্র। এই যে পরিস্থিতিটা চলছে সে ব্যাপারে যদি সরকারের বিশেষ কোনো দৃষ্টি না থাকে তাহলে এটা থেকে বের হয়ে আসা মুশকিল। সরকারের একটি ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট আছে, যেটা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের অধীনে। সেই ডিপার্টমেন্টে প্রতিবছরই আদিবাসীদের জন্য কিছু তহবিল দেয়া হয়। এর উদ্দেশ্য হলো যারা খুব অসহায়, দরিদ্র, নিস্ব তাদেরকে কিছু সহযোগিতা করা। এটা তাদের কাছে আর পৌঁছাতে পারে না। এখানে কিছু সরকারি অসাধু কর্মকর্তা এবং কিছু কিছু আদিবাসী নেতার যোগসাজশে এই তহবিলটা লুটপাট করে নিয়ে যাচ্ছে। সরকারি দলে যারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি আছেন তারা এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে পারেন।

প্রত্যয় : প্রত্যেক বছর এনজিওরা যে স্কলারশিপ দেয় সেখানে অন্তত ৫ জন আদিবাসীকে কি স্কলারশিপ দেয়া যায়? যাদের লেখাপড়ায় আগ্রহ আছে কিন্তু অর্থনৈতিক সাপোর্ট নেই। আমরা কি এই কাজে আদিবাসীদেরকে একটু অগ্রাধিকার দিতে পারি না?

দিবালোক সিংহ : আমরা যে স্কলারশিপ দেই সেখানে একটা নীতিমালা আছে এবং সেখানে আদিবাসী একটা পয়েন্ট। আমরা আদিবাসীদের জন্য দুর্গাপুরে একটা হোস্টেল পরিচালনা করি। শুধু আদিবাসী ছেলেরাই সেখানে থাকতে পারে। খাওয়া তাদের, থাকার ব্যবস্থা আমাদের। আদিবাসীদের পরিস্থিতির যদি উন্নতি করতে হয়, আমরা যেহেতু বাংলা ভাষায় কথা বলি সেখানে একটা কালচারের ডমিনেন্স আছে। সেখানে যদি তাদের ভাষার একটা প্রটেক্টেড ব্যবস্থা না থাকে সরকারিভাবে তাহলে কিন্তু তাদের ভাষা আর থাকবে না, বিলীন হয়ে যাবে।

আদিবাসীদের একটা অংশ হলো পার্বত্য চট্টগ্রামে। তাদের অধিকার আদায়ের জন্য পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হয়েছে, একটা তহবিল নিয়মিত বরাদ্দ হচ্ছে। সেটা সবাই পাচ্ছে কি পাচ্ছে না সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। কিন্তু সমতলে যে আদিবাসীরা বাস করে তাদের জন্য এমন আলাদা কোনো ব্যবস্থা নেই। এক্ষেত্রে তাদের জন্য যদি আলাদা বাজেট ব্যবস্থাসহ তাদেরকে সামাজিক সুরক্ষা সেবার আওতায় আনা হয় এবং বাজেটে টাকা নির্ধারণ করে দেয়া হয় তহালে এগুলোকে আমরা কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে পারি।

প্রত্যয় : আমাদের দেশে যদি ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে এর ফর্মেটটা কেমন হওয়া উচিত– এটি কি এমএফআইদের জন্য সোর্স অব ফান্ড ব্যাংক নাকি ভারতের বন্ধন ব্যাংকের মতো ব্রাঞ্চ করে ক্রেডিট দেবে–আপনার অভিমত কি?

দিবালোক সিংহ : এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলোর একটা সামাজিক মিশন আছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি করা হয়েছিল যাতে দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের অবস্থার কিছুটা হলেও সহনশীল করা যায়, তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। যদি আমরা শুধু ব্যাংকের ব্যবস্থাপনাতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের অংশাটাকে সেই প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাই তাহলে সেটা সে অনুযায়ী কাজ করবে। কিন্তু এই জায়গায় সতর্ক থাকতে হবে যে, যে সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আমরা এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিলাম সেটা যাতে ভুলে না যাই।

প্রত্যয় : আপনি কি ধরনের রাষ্ট্র আশা করেন?

দিবালোক সিংহ : আমি একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আশা করি।■

ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও

অধ্যক্ষ, নটর ডেম কলেজ, ঢাকা

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর একজনকে শিক্ষিত করা মানে পুরো একটি গ্রামকে আলোকিত করা

ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও নটর ডেম কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন ২০১২ সালে তার পূর্বসূরি ফাদার বেঞ্জামিন কস্তার মৃত্যুর পর। অধ্যক্ষ হবার আগে তিনি উপাধ্যক্ষের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও এর জন্ম ১৯৬২ সালে গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার দরিপাড়া গ্রামে। পিতা স্বর্গীয় গোপাল রোজারিও এবং মা স্বর্গীয় আগ্নেশ গমেজ। তিনি ১৯৭৮ সালে তুমিলিয়া বালক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি, ১৯৮০ সালে নটর ডেম কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ১৯৮২ সালে বিএ পাস করেন। তিনি ১৯৯৯ সালে দর্শন শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর ও ২০০৫ সালে একই বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন ফিলিপিন্স থেকে। হেমন্ত পিউস রোজারিও ফ্রান্স থেকে পরিচালিত হলিক্রস সম্প্রদায়ের যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হন ১৯৮৯ সালে। যাজকীয় দায়িত্বের অংশ হিসেবে তিনি কাজ করেছেন দেশের বিভিন্ন চার্চ বা মিশনগুলোতে। নটর ডেম কলেজের দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষক হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু হয় ফিলিপিন্সের সান্তো টমাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর। দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নটর ডেম কলেজের বিভিন্ন বিষয় এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও পিছিয়েপরা জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য এই কলেজের বিশেষ উদ্যোগগুলো নিয়ে প্রত্যয়ের সাথে কথা হয় ড. ফাদার হেমন্তের।

প্রত্যয়: নটর ডেম কলেজ দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর একটি। আপনি ২০১২ সাল থেকে নটর ডেম কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও এই কলেজটির সাথে যুক্ত আছেন দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে। এই কলেজ সম্পর্কে কিছু বলুন।

ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও: নটর ডেম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৯ সালে। দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব ছিলো। এ কারণে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের ক্যাথলিক চার্চকে অনুরোধ করে মানসম্মত উচ্চশিক্ষার জন্য এ অঞ্চলে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার। সরকারের অনুরোধে তৎকালীন আর্চ বিশপ লরেন্স গ্রেনার হলিক্রস সম্প্রদায়কে আহ্বান জানান এগিয়ে আসার। তার ঐ আহ্বানে সাড়া দিয়ে হলিক্রস সম্প্রদায় ঢাকার লক্ষীবাজারে আগে থেকেই বিদ্যমান সেইন্ট গ্রেগরিজ হাইস্কুলের কয়েকটি শ্রেণিকক্ষ নিয়ে স্কুলটির বর্ধিত অংশ হিসেবে সেইন্ট গ্রেগরিজ কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। সে সময় মূলত দুটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। একটি ছেলেদের জন্য, অন্যটি হলিক্রস নামে মেয়েদের জন্য। পরে ১৯৫৪ সালে ছেলেদের কলেজকে মতিঝিলে স্থানান্তর করে নাম দেওয়া হয় নটর ডেম কলেজ। আমাদের হলিক্রস সম্প্রদায়ের তিনটি শাখা

আছে- ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টার। ব্রাদাররা অনেক আগে থেকেই শিক্ষা বিতরণের কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন। তারা অনেকগুলো হাইস্কুল ও কারিগরি স্কুল পরিচালনা করছিলো। আর আমরা ফাদাররা মিশন বা প্যারেন্টস লেভেলে কাজ করি। নটর ডেম কলেজ ছিলো এই অঞ্চলে ফাদারদের জন্য প্রথম উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। উত্তর আমেরিকার নটর ডেম কলেজ থেকে ফাদাররা এসে এই কলেজের সাথে সম্পৃক্ত হন। নটর ডেম কলেজের বর্তমান এই ক্যাম্পাসের জমিটি আমাদের হলিক্রস সম্প্রদায় নিজস্ব তহবিল থেকে ক্রয় করেছিলো। পরবর্তীতে আইনি বাধ্যবাধকতার জন্য সরকারের কাছে বিক্রি করা হয় এবং সরকার পুনরায় জমিটি হলিক্রসকে লিজ প্রদান করে।

প্রত্যয়: হলিক্রস সম্প্রদায়টা আসলে কি?

ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও: হলিক্রস হলো ফ্রান্সভিত্তিক একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। ফরাসি বিপ্লবের পর ফ্রান্সে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও ধর্মীয় শিক্ষার বড় একটি ঘাটতি তৈরি হয়। এই স্খলন থেকে তরুণদের রক্ষা করার জন্য ফাদার বাসিল মরো ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টার এই তিনটি শাখা নিয়ে হলিক্রস পরিবার গড়ে তোলেন, যার মূল উদ্দেশ্য ছিলো ফ্রান্স তথা ইউরোপে প্রাতিষ্ঠানিক ও নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো। পরবর্তীতে এই কার্যক্রম উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ভারত ও আফ্রিকায় সম্প্রসারিত হয়। ইউরোপে সরকার পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেশি হওয়ায় ইউরোপের তুলনায় বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলেই আমাদের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এখন বেশি। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই হলিক্রস সম্প্রদায় দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দিয়ে নৈতিক মূল্যবোধ ও শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় নটর ডেম নামে বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। সেই নামেই এখানে নটর ডেম কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে এই নটর ডেম বা নতর দাম একটি ফরাসি শব্দ যার অর্থ মাতা মেরী। এ কারণেই আমাদের কলেজের প্রবেশ পথেই মাতা মেরীর একটি প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছে।

প্রত্যয়: নটর ডেম কলেজের সাফল্য উল্লেখ করার অপেক্ষা রাখে না। আপনাদের প্রতিষ্ঠানের এই সাফল্যের পেছনে কোন উদ্যোগগুলো বেশি ভূমিকা পালন করেছে?

ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও: সারা বিশ্বে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনায় আমাদের মূলমন্ত্র একটিই। সেটা হলো শৃঙ্খলা। প্রতিষ্ঠানে সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখা, শিক্ষা ব্যবস্থায় অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করা এবং আনন্দের সাথে শিক্ষা অর্জন করার সুযোগ আমাদের মূল অগ্রাধিকার। আমরা বিশ্বাস করি, শিক্ষার্থীরা যখন আনন্দ নিয়ে শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পাবে তখন তাদের মধ্যে পরীক্ষা ভিতি থাকবে না, ক্লাসে উপস্থিত হতে অনীহা থাকবে না। তারা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হবে একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, সেটা হলো জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জন করা। অর্থাৎ শৃঙ্খলা ও শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবেশ আমাদের সাফল্যের পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

প্রত্যয়: শিক্ষার্থীদের মধ্যে আপনারা নৈতিক শিক্ষা কীভাবে সঞ্চারিত করেন?

ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও: আমরা দুটো পদ্ধতি অবলম্বন করি। প্রথমটি হলো, নৈতিক শিক্ষার আলাদা ক্লাসের ব্যবস্থা আছে। দুই বছরে ১৫টি স্বতন্ত্র মূল্যবোধ নিয়ে ১৫টি ক্লাস হয়। অর্থাৎ প্রতিটি ক্লাসের বিষয়বস্তু আলাদা। যেমন দেশপ্রেম, সামাজিক দায়বদ্ধতা, সময়ানুবর্তিতা, স্বাস্থ্য, শৃঙ্খলা, ভাতৃত্ববোধ ইত্যাদি। প্রতিটি ক্লাসে তিনজন করে শিক্ষক উপস্থিত থাকেন। লক্ষ্য করলে দেখবেন, আমাদের কলেজে কোন মারামারি কিংবা কলহ নেই। এখানে সবাই সবাইকে সম্মান করে, সঠিক সময়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থী ক্লাসে উপস্থিত হয়, নিয়মিত ক্লাস করে। ছাত্র-শিক্ষক সবার জন্য একই নিয়ম প্রযোজ্য। কলেজের শিক্ষার্থীদের বয়স ১৬ থেকে ১৮। এই বয়সে এ ধরনের শৃঙ্খলাবোধ তাদের জীবনের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতেও প্রভাব ফেলে। আমরা এই বিষয়টিকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে দেখি। আরেকটি হলো, সহশিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আমাদের কলেজে ২৫টি ক্লাব আছে। প্রতিটি ক্লাবে এক থেকে দুজন মডারেটর থাকে। এই ক্লাবগুলো সাড়া বছর অসংখ্য অনুষ্ঠান করে, জাতীয় ইভেন্টগুলোতে অংশগ্রহণ করে। অনেক আন্তর্জাতিক ইভেন্টেও তারা অংশগ্রহণ করে। এই ক্লাবগুলোর কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে সৃজনশীলতা, নেতৃত্ব ও ভাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে। পরিবেশ রক্ষার কার্যক্রমেও এই ক্লাবগুলো অংশগ্রহণ করে। আমরা এ বছর দেশের আটটি বিভাগে পরিবেশ সম্মেলন আয়োজন করার উদ্যোগ নিয়েছি। প্রতিটি সম্মেলনে ২০টি কলেজকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ইতোমধ্যে ৬টি বিভাগের সম্মেলন শেষ হয়েছে। রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য কলেজগুলোর মধ্যেও আমরা আমাদের সহশিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করছি।

প্রত্যয়: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সন্তানদের উচ্চশিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আপনার প্রতিষ্ঠান থেকেই শুরু। তাদের সহায়তার জন্য আপনারা কি ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং ভবিষ্যতে আরো নতুন কোন উদ্যোগ গ্রহণের পরিকল্পনা আপনাদের আছে কি না?

ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও: আমাদের কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো তারা অভাবী, পিছিয়ে পড়া কিংবা সুবিধাবঞ্চিত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমাদের প্রতিষ্ঠানে তাদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেয়া। কিন্তু সরকার এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল বা মেধার ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তির যে নীতিমালা ঘোষণা করেছিলো সেই নীতিমালায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কিংবা গ্রামের দরিদ্র ছেলেদের ভর্তি করার সুযোগ তেমন ছিলো না। কারণ আমাদের কলেজের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ ছাত্রই আসে গ্রাম ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী থেকে। তারা এমনিতেই সুবিধাবঞ্চিত। ফলে মূল ধারার শিক্ষার্থীদের মতো অতোটা ভালো ফলাফল এসএসসি পরীক্ষায় তারা করতে পারে না। তাই আমরা যদি আমাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে ছাত্র ভর্তি না করি তাহলে এই শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ দেয়া সম্ভব হবে না। এ কারণে আমরা শিক্ষাবোর্ড

কলেজের প্রবেশ মুখে নতর দাম বা মা মেরী'র কোলাজ চিত্র।

নটর ডেম কলেজে শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করার সুযোগ রয়েছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল ছাত্রদের। দিনে সর্বোচ্চ তিন ঘণ্টা কাজ করতে পারে তারা। মজুরি দেওয়া হয় ঘণ্টা হিসেবে। রাজশাহীর সিমুল সরেন, শেরপুরের জর্জ মৃ এবং বরিশালের হেরি গোমেজ এমনই তিন শিক্ষার্থী। আর এভাবে যারা শ্রম দিয়ে নিজেদের লেখাপড়ার খরচ বহন করে তাদের দেখভালের জন্য আছে একজন সুপারভাইজারও। কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকোনমিক্সের ছাত্র খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর সোহেল নংপ্রট (ডান থেকে দ্বিতীয়) তেমনই একজন সুপারভাইজার।

ও মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেই, কিন্তু অনুমতি পাইনি। পরে আমরা হাইকোর্টে রিট করি এবং রিট চলাকালীন কোর্টের রায় নিয়ে আমাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে ছাত্র ভর্তি অব্যাহত রাখি। তিন বছর আগে হাইকোর্টের চূড়ান্ত রায় আমাদের পক্ষে যায় এবং মন্ত্রণালয় থেকেও আমাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে ভর্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার অনুমতি প্রদান করা হয়। এর ফলে পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের নটর ডেম কলেজে পড়ালেখার সুযোগ আমরা দিতে সক্ষম হচ্ছি। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য আমরা বিশেষ কোন কোটা রাখিনি, কিন্তু তাদের ভর্তির জন্য সামগ্রিকভাবে আবেদনের যোগ্যতাকে শিথিল করেছি। অর্থাৎ মানবিক বিভাগে ন্যূনতম গ্রেড ৩, বাণিজ্য বিভাগে ৪ এবং বিজ্ঞান বিভাগে ৫ থাকলে সকল জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীরাই আবেদন করতে পারবে। কিন্তু এই যোগ্যতা নিয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেবার পর শুধু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীরাই ভর্তির জন্য বিবেচিত হবে। মূলধারার অন্যান্য শিক্ষার্থীদের তাদের সমকক্ষদের সাথে মেধার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতা করতে হবে। সহজ কথায়, ন্যূনতম গ্রেড নিয়ে সবাই আবেদন করতে পারবে, কিন্তু ন্যূনতম গ্রেড নিয়ে ভর্তির জন্য বাছাই প্রক্রিয়ায় আসবে শুধু পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীরা।

প্রত্যয়: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীরা সাধারণত অর্থনৈতিকভাবেও পিছিয়ে থাকে। তাদের জন্য কি বিশেষ কোন উদ্যোগ আপনাদের আছে?

ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও: হ্যাঁ, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আমরা সচেতন। নটর ডেম কলেজ কোন দেশি-বিদেশি অনুদানে চলে না। এই কলেজের যাবতীয় ব্যয় নিজস্ব অর্থায়নে বহন করা হয়। অন্যান্য ছাত্রদের মতো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ছেলেদেরও বেতন দিয়েই পড়ালেখা করতে হয়, তারা আমাদের হোস্টেলেই থাকে। আমরা তাদের জন্য ক্যাম্পাসে কাজ করে অর্থ উপার্জন করার ব্যবস্থা রেখেছি। তারা দিনের বিভিন্ন সময় এবং বিশেষ করে ছুটির দিনে কলেজ ক্যাম্পাসে বিভিন্ন কাজ করে দেয়, এর বিনিময়ে আমরা ঘণ্টা হিসেবে মজুরি দেই। নিজেদের উপার্জনের টাকা দিয়েই তারা পড়ালেখার খরচের অনেকটাই বহন করতে পারে। তবে এই সুবিধাটা শুধু নৃগোষ্ঠীর ছেলেদের জন্যই নয়, অন্য জাতি-গোষ্ঠীর অতি দরিদ্র ছাত্রদের জন্যও প্রযোজ্য। এমনকি যারা আমাদের হোস্টেলে থাকে না তারাও কাজ করে অর্থ উপার্জনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। তবে কারা এই সুযোগ পাবে তা কলেজ কর্তৃপক্ষ আগেই যাচাই করে দেখে। এ জন্য মূল্যায়ন পরীক্ষা নেয়া হয়। সারা দেশ থেকে কয়েকশ ছাত্রকে কাজের সুযোগ দেয়া হয়। সেখান থেকে যাদের কাজ করার মানসিকতা আছে তাদেরকেই কেবল এই সুবিধার আওতায় ভর্তি করা হয়। এই সংখ্যা ১২০ থেকে ১৩৫ জন হয়ে থাকে।

প্রত্যয়: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলো কী ধরনের উদ্যোগ নিতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও: শিক্ষায় বিনিয়োগের মুনাফাই সর্বোত্তম মুনাফা। আমরা এ কথা বিশ্বাস করি। এই কারণেই দেখবেন, যেখানেই হলিক্রস সম্প্রদায়ের মিশন আছে সেখানেই একটি-দুটি করে স্কুল বা কলেজ আছে। এমনকি কোন কোন স্থানে মিশন প্রতিষ্ঠার আগেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেমন টাঙ্গাইলের মধুপুরের পীরগাছায়। আমাদের ব্রাদাররাই এই প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা করে থাকে। সুতরাং আমি মনে করি, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের জন্য শিক্ষার সুযোগকে আরো প্রসারিত করার উদ্যোগ নিতে পারে। এর চেয়ে বড় বিনিয়োগ আর কিছু হয় না।

প্রত্যয়: প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার পাশাপাশি নটর ডেম কলেজ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ছাত্রদের সাংস্কৃতিক উন্নয়নে বিশেষ কোন ভূমিকা পালন করে কিন?

ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও: আমাদের এখানে সাংস্কৃতিক ক্লাব আছে। এই ক্লাবের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। তাদের নিজস্ব গান, নাচ ও সাংস্কৃতিক উৎসব করার সুযোগ এখানে রয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারিতে আমরা সকল নৃগোষ্ঠীর ছাত্রদের একত্র করে তাদের ভাষায় কথা বলার আয়োজন করি। তবে বিশেষ কোন গবেষণা করার সুযোগ আমাদের হয়নি।

প্রত্যয়: বুরো বাংলাদেশসহ দেশের অনেক এনজিও-এমএফআই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি?

ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও: অনেক এনজিও আছে যারা অনুদান সংগ্রহ করে, সেটা ঋণ হিসেবে বিনিয়োগ করে এবং সেখান থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করে। তবে সব এনজিও একরকম নয়। বুরো বাংলাদেশ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের জন্য অনেক বড় পরিসরে কাজ করে, বিশেষ করে গারোদের জন্য সেটা আমি জানি। আমি এ ধরনের কাজের জন্য বুরো বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানাই।■

গারো সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে

বুরো বাংলাদেশের সুদূরপ্রসারী ভূমিকা

দেশের পিছিয়ে থাকা নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ এনজিও/এমএফআই সেক্টরের অনেক প্রতিষ্ঠানই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এদের মধ্যে বুরো বাংলাদেশ, ব্র্যাক, আশা, আশ্রয়, ডিএসকে, ওয়ার্ল্ড ভিশন অন্যতম। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন উদ্যোগের পাশাপাশি এনজিও খাতের অনেক প্রতিষ্ঠানই দেশের পাহাড়ি ও সমতলের নৃগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে কাজ করছে। এক সময় যা ছিল শুধুই বন এখন সেখানে গারো সম্প্রদায়ের নারীদের পরিশ্রমী হাতে ফলছে আনারস, কলা, কচু, পেঁপেসহ নানা অর্থকরী ফসল। তাদের জীবনমানের উন্নয়নসহ স্বাস্থ্য শিক্ষার উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে এনজিওদের কার্যক্রম।

বুরো বাংলাদেশ এর দেশব্যাপী শাখার সংখ্যা ১৩০০ এর বেশি। এর মধ্যে বেশ কিছু শাখা চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, বৃহত্তর সিলেট, দিনাজপুর, রাজশাহী, রংপুর ও বৃহত্তর ময়মনসিংহের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলে। বৃহত্তর ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা, শেরপুর, জামালপুর ও ময়মনসিংহের গারো, গাজং, বংনীসহ বেশ কিছু নৃগোষ্ঠীর মানুষের বাস। এদের মধ্যে গারো এবং হাজংদের সংখ্যাই বেশি। বুরো বাংলাদেশ যেহেতু দারিদ্র্য বিমোচনসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে সেহেতু এই ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীও তাদের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

এর মধ্যে টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলায় গারো নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অধিক। প্রত্যয় টিম বিভিন্ন এলাকায় সরেজমিন ঘুরে এবং তাদের অনেকের সাথে আলাপ-আলোচনায় যে বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে তা এখানে উপস্থাপিত হলো :

গ্রাম বেরিবাইদ, উপজেলা মধুপুর

গত ১৬ সেপ্টেম্বর আমরা টাঙ্গাইলের মধুপুরের বেরিবাইদ গ্রামে যাই। এখানে বুরো বাংলাদেশের ১৩৪নং কেন্দ্রে রুলিসন চিরানের বাড়িতে প্রায় ২০/২৫ জন গারো নারীর সাথে কথা হয়। এই কেন্দ্রে সদস্যের সংখ্যা ৯৪ জন হলেও অধিকাংশই কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। প্রত্যয় টিম এর কথা শুনে তাদের মধ্যে কয়েকজন উপস্থিত হয়েছেন।

বাড়িতে ঢুকেই ভালো লাগলো- মাটির ঘর। নিকানো উঠোন। বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে তারা বসেছিলেন। আমরা যেতেই সাদরে গ্রহণ করে বসতে দিলেন। বললেন, বুরো বাংলাদেশ আমাদের আত্মার আত্মীয়। কেন্দ্র প্রধান নিনীসা রিসিল বললেন, প্রথমে ১৫/২০ জন সদস্য নিয়ে শুরু করেছিলেন, এখন সদস্য সংখ্যা ৯৪ জন। তিনি বললেন, বুরো বাংলাদেশ এর ঋণ সহায়তা নিয়ে তারা গরু ছাগল হাঁস-মুরগি পালন, কৃষি ক্ষেত্রে কলা, আনারস, ধান, আদা, কচু চাষ করছেন। শুকরও পালন করছেন অনেকে। কেন্দ্র প্রধান শুরুতে ৫০০০ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন, বর্তমানে তার ঋণের পরিমাণ দেড় লাখ টাকা। তিনি এই ঋণ দিয়ে দোকান ও কৃষি কাজে খাটিয়েছেন। তিনি জানান, গারো সম্প্রদায়ের নারী ও পুরুষ উভয়েই পরিশ্রমী।

তারা জানান বুরো বাংলাদেশ শুধু ঋণ প্রদানই করে না– তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীবন মান উন্নয়নেও নানা পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে। তাদের এখানকার অনেক পরিবারের ছেলে মেয়েরাই শিক্ষিত হচ্ছে। তার নিজের ১ ছেলে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করে চাকরি করছে। তার ছেলের বৌ নিকিতা নকরোম ভূয়াপুর মনোয়ারা প্যারা মেডিকেলের ৪র্থ বর্ষের ছাত্রী।

এই গ্রামের গারো পল্লীতে এখন প্রায় প্রতি বাড়িতেই বিল্ডিং, টিনের ঘর দেখা

মধুপুরের বেরিবাইদ গ্রামের রুলিসন চিরানের বাড়িতে নৃতাত্ত্বিক গারো সম্প্রদায়ের নারীরা তাদের সুখ-দুঃখ, সমস্যা ও স্বপ্নের কথা বলছিলেন। পরিশ্রমী এই নারীরা বললেন, বুরো বাংলাদেশ আমাদের আত্মার আত্মীয়। তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে গারো সম্প্রদায়ের অসংখ্য মানুষ আর্থিক স্বচ্ছলতাসহ উন্নত জীবন যাপনের সুযোগ পাচ্ছে।

যায়। তারা জানালো, তাদের এক সময় খুব কষ্টের দিন ছিল। মাটির বেড়া, ওপরে ছনের চালা। জংলী আলু তুলে সিদ্ধ করে খেতো। এখন তিন বেলা ভাত, মাছ-মাংস-ডিম খেতে পারছে। সেই আর্থিক সক্ষমতা তাদের এসেছে। প্রতি বাড়িতেই টিউবওয়েলের বিশুদ্ধ পানি, স্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন। এটি সম্ভব হয়েছে বুরো'র সহায়তা ও তাদের পরিশ্রমের ফলে।

একজন জানালো, আগে ঝাড়-জঙ্গলে থেকে আমাদের শরীর গন্ধ করতো। এখন তা হয় না। আমাদের মেয়েরাও এখন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভালো পোশাক পড়ে, গায়ে পারফিউম মাখে। জীবন-যাপন সম্পর্কে সচেতন। শুধু আর্থিক উন্নয়নই নয়, বুরো বাংলাদেশের নানামুখী কর্মসূচির মাধ্যমে আমাদের সার্বিক উন্নয়ন ঘটছে।

তিনি আরো বলেন, এক সময় আমাদের জমি অন্যেরা কৌশলে দখল করে নিয়েছে। আমাদের শিক্ষার অভাব ছিল। এখন কেউ ফাঁকি বা জালিয়াতি করতে পারে না। এ জন্যই আমরা বুরো বাংলাদেশকে আমাদের আত্মার আত্মীয় মনে করি।

স্বল্প সুদে শিক্ষা ঋণ

উপস্থিত অনেকেই তাদের সন্তানদের পড়াশোনার সহযোগিতায় সহজ শর্তে এবং স্বল্প সার্ভিস চার্জে শিক্ষা ঋণ প্রদানের অনুরোধ জানালো। বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা এই ঋণের প্রত্যাশী। তারা জানান, মেধাবী হয়েও অর্থাভাবে অনেকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায় না।

জমি রেকর্ডভুক্ত করার দাবি

মিতালী নকরেকসহ বেশ ক'জন জানালো, আমরা এখন সচেতন। অতীতে পূর্ব পুরুষরা জমি রেকর্ড করার কথা কেউ ভাবেনি। ফলে বন বিভাগ আমাদেরকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করে। কিন্তু আমরা তো বন উজাড় হোক চাই না– বন বনই থাকুক। বন থাকলেই আমরা থাকব। কারণ, আমরা বনের অধিবাসী। আমাদের বাড়ি জমি রেকর্ডভুক্ত করে দিক সরকার– এটা আমাদের আদিবাসীদের অধিকার। বনকেই আমরা নিরাপদ আশ্রয় মনে করি।

নানা পেশায় গারো নৃগোষ্ঠী

গারো নৃগোষ্ঠীর শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের অধিকাংশই এখন মধুপুর অঞ্চলের বাইরে। এই নৃগোষ্ঠীর ছেলে-মেয়েরা মেডিকেল কলেজসহ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে পড়ারও সুযোগ পেয়েছে। পেশা হিসেবে স্বল্প শিক্ষিত মেয়েদের অনেকে বিউটি পার্লারে কাজ করছে। কেউ কেউ ঢাকা ও সিলেটসহ বড় বড়

পীরগাছা সাধু পৌলস প্রাথমিক বিদ্যালয়, যা খ্রিস্টান মিশনারী চালিত। এ স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে রয়েছেন মেবুল মোনালিসা দারু। স্কুলটিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বর্তমানে ১২০। প্রত্যয় টিমকে এই কোমলমতি শিশুরা জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে শোনায়। প্রাণবন্ত এই শিশুদের দেখে মনে হচ্ছিল একটি ফুলের বাগান।

বুরো বাংলাদেশ প্রতিবছরই বেথেনী আশ্রমের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। সেই অর্থে হাসপাতালের চিকিৎসা সামগ্রী, কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দেয়া হয়। ডেলিভারির ক্ষেত্রে স্বচ্ছল রোগীদের নিকট থেকে ৫০০ টাকা নেয়া হয়। দরিদ্রদের থেকে কোনো ফি নেয়া হয় না।

শহরে পার্লারের স্বত্বাধিকারী। এখানে উপস্থিত পূর্ণিমা সিমলা বিএসএস অনার্স, সুইটি সিমসাং কলেজে পড়ছেন। রুমা নামের একজন এসএসসি পাস করে ঢাকার শীর্ষ পর্যায়ের পার্লার পার্সোনাতে কাজ করছেন।

বুরো বাংলাদেশে কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন স্তরে প্রায় ২ শতাধিক গারো নৃগোষ্ঠীর সদস্য চাকরি করছেন। অন্যান্য এনজিও, প্রশাসন এবং পুলিশ বিভাগেও তাদের অনেকে চাকরি করছেন।

স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি

গারো নৃগোষ্ঠীর অনেকেই এখন স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করছেন। এদের একজন জস্টিনা নকরেক মধুপুর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।

এনজিওদের প্রতি কৃতজ্ঞতা

গারো নৃগোষ্ঠীর প্রায় প্রত্যেকেই তাদের এই উন্নয়নের পেছনে মিশনারী ও সরকারের কিছু উন্নয়ন কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করেন। একই সাথে তারা বলেন, বুরো বাংলদেশ ও অন্যান্য এনজিওরা আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বলেই আমরা অন্ধকার থেকে আলোতে আসতে সক্ষম হয়েছি।

জলছত্র এক উন্নত জনপদ

মধুপুরের জলছত্র এক সময় ছিল গজারি বনসমৃদ্ধ গভীর জঙ্গল। ছিল হিংস্র বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল। প্রতিকূল অবস্থার সাথে লড়াই করেই বাস করতেন গারো জনগোষ্ঠী। এখন এটি এক উন্নত জনপদ। খ্রিস্টান মিশনারীর উদ্যোগে এখানে ১৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় এবং মিশনারী স্কুল রয়েছে। রয়েছে জলছত্র মিশনারী হাসপাতাল। জলছত্র মিশনারী স্থাপিত হয়েছে ১৯৫৩ সালে। প্রতি শুক্রবার এখানকার চার্চে প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। মধুপুর অঞ্চলে গারো অধিবাসীর সংখ্যায় প্রায় ১১০০০। পীরগাছা সেন্ট পৌলস হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়েছে ১৯৭২ সালে। উপজাতীয় খ্রিস্টান ছাড়াও অন্য সম্প্রদায়ের ছাত্ররাও এই স্কুলে পড়ার সুযোগ পায়। জলছত্র মিশনারী হাসপাতালটি কুষ্ঠ রোগ নিরাময়ের জন্য বিখ্যাত। এলাকার চিকিৎসা ক্ষেত্রে এই হাসপাতালটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

বেথেনী আশ্রম হাসপাতাল ও বুরো বাংলাদেশ

পীরগাছা বেথেনী আশ্রমে একটি ছোট আকারের হাসপাতাল রয়েছে। এতে সব ধর্মের লোকই চিকিৎসার জন্য আসেন। বিশেষ করে এ হাসপাতালটিতে প্রসূতি নারীদের যত্ন এবং সন্তান প্রসবে অধিক সহায়তা করা হয়। দূর-দূরান্ত থেকে এখানে প্রসূতি নারীরা আসেন। এখানকার ডাক্তার দেখে যদি বুঝতে পারেন ডেলিভারি স্বাভাবিক হবে তাহলে এখানেই সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা করা হয়। দুজন নার্স রয়েছেন, একজন হান্না দালবত এবং আরেকজন কেকেলিসিতা নকরেক।

বুরো বাংলাদেশ প্রতিবছরই এই হাসপাতালটির জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। সেই অর্থে হাসপাতালের চিকিৎসা সামগ্রী, কর্মচারীদের বেতন ভাতা দেয়া হয়। ডেলিভারির ক্ষেত্রে স্বচ্ছল রোগীদের নিকট থেকে ৫০০ টাকা নেয়া হয়। দরিদ্রদের থেকে কোনো ফি নেয়া হয় না। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানালেন, বুরো বাংলাদেশ এখানকার প্রয়োজন অনুযায়ী ৪ কিস্তিতে আর্থিক অনুদান প্রদান করে।

মিশন থেকে ক্যান্সার রোগী, হার্টের রোগী, স্ট্রোক, প্যারালাইজড রোগী ও কিডনি রোগীদের উচ্চতর চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট হাসপাতালে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়।

ফাদার লরেন্স রিবেরু, সিএসসি, পাল পুরোহিত
পীরগাছা সেন্ট পৌলস ক্যাথলিক মিশন, মধুপুর

মধুপুরের পীরগাছা সেন্ট পৌলস ক্যাথলিক মিশনের পাল পুরোহিত ফাদার লরেন্স রিবেরু, সিএসসির গ্রামের বাড়ি ঢাকার কালিগঞ্জের রাঙামাটিয়া গ্রামে। তিনি তুমিলিয়া বালক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৯০ সালে এসএসসি, ঢাকার নটরডেম কলেজ থেকে ১৯৯৩ সালে এইচএসসি এবং ১৯৯৫ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি 'ফাদার' হবার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত বনানী মেজর সেমিনারীতে অধ্যয়ন করেন। তিনি উর্বানিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে থিওলজিতে ডিগ্রি লাভ করেছেন। তিনি বরিশাল চার্চ, গৌরনদী, বান্দবানের থানচিতে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ফিলিপিন্সেও পড়াশোনা করেছেন।

হাসিখুশি প্রাণবন্ত ফাদার লরেন্স রিবেরু ২০১৭ সালে পীরগাছার এই মিশনের দায়িত্ব নিয়ে আসেন। ২০১৯ সাল থেকে তিনি ফাদার এর দায়িত্ব পালন করছেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা মানবধর্মে বিশ্বাসী এবং মানব সেবাই আমাদের বড় সেবা। তিনি বলেন, আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দরিদ্র মানুষের সেবাসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা অথবা পরামর্শ প্রদান করা।

এক প্রশ্নের জবাবে ফাদার লরেন্স দৃঢ়তার সাথে বলেন, 'বিগত ক'বছর ধরেই বুরো বাংলাদেশ এর সার্বিক কার্যক্রম ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ হয়েছে। আমার পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, বুরো বাংলাদেশও দারিদ্র্য নিরসনসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিবেদিতপ্রাণ একটি প্রতিষ্ঠান। তারাও মানব সেবার সাথে সম্পৃক্ত।' সেদিক থেকে মিশনারীদের কার্যক্রমের সাথে তাদের কাজের অনেক মিল।

ফাদার লরেন্স রিবেরু, সিএসসি, পাল পুরোহিত
পীরগাছা সেন্ট পৌলস ক্যাথলিক মিশন, মধুপুর

মার্টিন মৃ
জয়েনশাহী আদিবাসী উন্নয়ন পরিষদ নেতা

তিনি বলেন, বুরো বাংলাদেশ এর নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন ভাই এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের সেবায় ব্রতী হয়েছেন যা আমরা ধর্মীয় আবরণে করে থাকি। তিনি সত্যিই একজন মানবদরদী মানুষ। ফাদার লরেন্স আরো বলেন, বুরো বাংলাদেশ এর সার্বিক সহায়তায় মধুপুরসহ দেশের অন্যান্য স্থানের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর হাজার হাজার মানুষ আজ উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত হতে পারছে। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠানে নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর অসংখ্য তরুণ-তরুণীদের চাকরি দিয়েছেন। তিনি বলেন, বুরো বাংলাদেশসহ এনজিও সেক্টরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহায়তা না পেলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়ন কঠিন হয়ে যেতো।

মার্টিন মৃ
জয়েনশাহী আদিবাসী উন্নয়ন পরিষদ

মধুপুর নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অন্যতম নেতা ছনিয়া গ্রামের মার্টিন (মিহির) মৃ বললেন, তৎকালীন পাকিস্তান আমলে আদিবাসী গারো সম্প্রদায় উচ্ছেদ আতঙ্কের মধ্যে পড়ে। তখনই গঠিত হয় জয়েনশাহী আদিবাসী উন্নয়ন পরিষদ। মার্টিন (মিহির) মৃ বর্তমানে এই পরিষদের একজন নেতা। কথা প্রসঙ্গে মার্টিন বললেন, আদিবাসীরা একসময় খুব পিছিয়ে ছিল। বর্তমানে আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। তিনি জানান, ১৯৬২ সালে জলছত্র মিশনের মাধ্যমে এখানে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও চিকিৎসার শুরু। সে সময় ফাদার হোমরিক ছিলেন মানবাধিকার বিষয়ে সোচ্চার। মার্টিন মৃ জানান, কারিতাস আদিবাসীদের বিশুদ্ধ পানি পানের ব্যবস্থা গ্রহণে টিউবওয়েল, টানা পাম্প এবং উন্নত মানের টয়লেটের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। নামমাত্র অর্থে স্যালো মেশিন সরবরাহ করেছে। তিনি বলেন, পরবর্তী পর্যায়ে দেখলাম বুরো বাংলাদেশসহ আরো কয়েকটি এনজিও আদিবাসীদের উন্নয়নে বেশ ভূমিকা রাখছে। এনজিওরা যদি ক্ষুদ্রঋণসহ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ না নিত তাহলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকাংশ সদস্যের টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়তো।

তিনি বলেন, আমাদের আদিবাসীদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। অনেকেই গ্রাম থেকে শহরে চলে গেছেন। বর্তমানে ১৬টি জনবসতি নেই। তিনি বলেন, আমরা আদিবাসীরা এখনো বনবিভাগের কাছে খুব অসহায়। আদিবাসীদের অনেকের জমিই রেকর্ডভুক্ত হয়নি। আদিবাসীদের পৈতৃক আরওআর ভুক্ত জমির রেকর্ড না দেয়ায় সবাই আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটায়।

তিনি বলেন, এ ব্যাপারে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি দেয়া দরকার। তিনি আরো বলেন, আমরা বনবাসী। বনবাসীরা কখনো চায় না বন উজাড় হোক।

বুরো বাংলাদেশ প্রসঙ্গে মার্টিন (মিহির) মৃ বলেন, অনেক এনজিওর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবসায়িক হলেও বুরো বাংলাদেশ এর দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। এ প্রতিষ্ঠানটি ক্ষুদ্রঋণসহ অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানেও সহায়তা দিয়ে থাকে। তিনি বলেন, এনজিওদের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম আছে বলেই আদিবাসীরা এখন আগের চেয়ে স্বচ্ছল। তারা এনজিওদের নিকট থেকে পড়াশোনা ও চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে।■

শিক্ষা ও অবকাঠামো উন্নয়নের অংশ হিসেবে বুরো বাংলাদেশের অর্থায়নে মধুপুরের কাকরাইদ উচ্চ বিদ্যালয়ে নির্মিত একটি ভবন।

গারো নৃগোষ্ঠীর কৃতি সন্তান

বীর মুক্তিযোদ্ধা চিন সাংমা

মধুপুর উপজেলাধীন গভীর বনের ভেতরের একটি গ্রাম ধরাটি পূর্বপাড়া। এই গ্রামেরই এক বীর মুক্তিযোদ্ধা চিন সাংমা, যিনি পিছিয়ে থাকা আদিবাসী সম্প্রদায়ের হয়েও দেশ মাতৃকার স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন, অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছেন। তিনি এখন নেই, কিন্তু তাঁর বিজয় পতাকা আকাশে উড্ডীন।

প্রত্যয় টিম বুরো বাংলাদেশ এর মধুপুরের কাকরাইদের সিএইচআরডি থেকে যখন এই বীর মুক্তিযোদ্ধার বাড়ির দিকে যাত্রা করে তখন বিকেল হয়ে গেছে। গভীর বনের ভেতর দিয়ে পাহাড়ি রাস্তায় কিছুদূর গাড়িতে যাওয়ার পর আঁকাবাঁকা হলুদ মাটির পথ। কখনো টিলার ওপর আবার কখনো নিচের দিকে এবড়ো খেবড়ো এই পথ। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হওয়ায় বেশ পিচ্ছিল– যে কোনো মুহূর্তে ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। প্রায় ২ কিলোমিটার হেঁটে পাওয়া গেলো বীর মুক্তিযোদ্ধা চিন সাংমার বাড়ি।

চিন সাংমা জন্ম নেন ১২ আগস্ট ১৯৫১ এবং ২০১৯ সালের ১ অক্টোবর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। একজন সহজ-সরল সৎ, কর্মঠ মানুষ ছিলেন চিন সাংমা। জানা গেছে, মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গর্ব করতেন তিনি, কিন্তু অহঙ্কার করতেন না। নিকোনো প্রশস্ত উঠোন। বেশ বড় তিনটি টিনের ঘর। বাড়ির অন্যরা কাজে গিয়েছেন। উপস্থিত রয়েছেন চিন সাংমার এক নাতনি অন্তরা নকরেক। জিজ্ঞেস করতেই বললো 'চিন সাংমা ছিলেন আমার মাতামহ। আমাকে খুব স্নেহ করতেন, লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগী হতে বলতেন। তিনি ছিলেন খুবই ভালো মানুষ। অন্তরা আরো জানালো তার কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনেছি।' অন্তরা নকরেক আমাদের এই মহান বীর মুক্তিযোদ্ধার কবরের নিকট নিয়ে যান। আমরা শ্রদ্ধাবনত হই।

জীবিতাবস্থায় চিন সাংমা ছিলেন একজন দিনমজুর। বেশ পরিশ্রমী ছিলেন তিনি। তাঁর পাওয়া মুক্তিযোদ্ধা ভাতা এখন তার ৪ মেয়ের মধ্যে ভাগ হয়। একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এ বাড়িতে একটি বিল্ডিং হওয়ার কথা। একজন জানালো যে, এই বাড়িটি বন বিভাগের জমির ওপর হওয়ায় তা করা হচ্ছে না। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে বাজারে দেখা। তারা আমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, বীর মুক্তিযোদ্ধার বাড়িটি অন্তত রেকর্ড সম্পত্তি হিসেবে দেয়ার ব্যবস্থা করা হোক। পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে ফেরার পথে বাজারে দেখা হয়।

উল্লেখ্য বীর মুক্তিযোদ্ধা চিন সাংমা বুরো বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।■

গারো নৃ-গোষ্ঠীর গর্বিত মুক্তিযোদ্ধা চিন সাংমা'র দুই মেয়ে রানিকা সাংমা ও রানিতা সাংমা। ধরাটি গ্রাম থেকে রাতে ফেরার পথে স্থানীয় একটি বাজারে বসে কথা হয় তার দুই কন্যার সাথে। তারা জানালেন, বাবার মুক্তিযোদ্ধার ভাতা দুই বোনই পাচ্ছিলেন সমান ভাগে। তবে কাগজপত্রের জটিলতায় এক বোনের টাকার অংশ আটকে আছে কয়েক মাস ধরে।

গারো নৃগোষ্ঠীর কৃতি সন্তান

বীর মুক্তিযোদ্ধা ফালগীন দালবৎ

মধুপুরের কুড়াগাছা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের পূর্ব ধরাটি গ্রামের ফালগীন দালবৎ ছিলেন ৭১ এর একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। দেখতে উঁচু লম্বা ফালগীন দালবৎ এতোটাই শক্তিশালী ছিলেন যে, আড়াই মনের বস্তা কিংবা একটা শ্যালো মেশিন একাই মাথায় তুলে নিতে পারতেন। এ কারণেই কাদেরিয়া বাহিনীর প্রধান কিংবদন্তি মুক্তিযোদ্ধা বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম তাঁকে ডাকতেন পালোয়ান বলে। ফালগীন দালবৎ কর্মজীবনে ছিলেন দিনমজুর, তিনি ছিলেন খুব সাহসী। মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী তাঁকে দিয়ে যুদ্ধের অতিরিক্ত ভারী বোঝা বহন করাতেন এবং ফালগীনও সানন্দচিত্তে বলতেন– 'একাই পারব'।

ফালগীন দালবৎ মধুপুরের কোম্পানি কমান্ডার কাজী নুরুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন কোম্পানিতে ছিলেন। তিনি গারো পাহাড়ের তুরায় মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নেন। কথা প্রসঙ্গে ফালগীন দালবৎ পালোয়ানের জামাতা জন্টু দালবৎ জানান, প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত তার পরিবার মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। তিনি জীবিতাবস্থায়ও তা পাননি। এ নিয়ে তার খুব শোক-আফসোস ছিল না। বলতেন, যুদ্ধ করেছি দেশের জন্য। সরকার যদি মনে করে ভাতা দেবে, তাহলে খুশির ব্যাপার। তিনি বলেন, গারো আদিবাসী ৪ জন মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে এই গ্রামের চিন সাংমা, জলছত্রের অমল সাংমা এবং কোনাবাড়ির ধীরেন সাংমা এই তিনজন নিয়মিত ভাতা পাচ্ছেন। এ ব্যাপারে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর প্রত্যয়ন ও সুপারিশসহ আনুষঙ্গিক কাগজপত্র জমাও দেয়া হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ভাতার ব্যবস্থা হয়নি।

২০১৭ সালের ২৮ জানুয়ারি ফালগীন দালবৎ মারা গেলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ১ লাখ টাকা অনুদান প্রদান করেন। জন্টু দালবৎ জানান, সেই টাকায় তারা শ্বশুর ফালগীন দালবৎ ও শাশুড়ি রাসনি নকরেক এর কবর বাঁধাই করে দিয়েছেন।

ফালগীন দালবৎ এর মেয়ে মেরুন নকরেক ও স্বপ্না নকরেক তাঁদের মুক্তিযোদ্ধা পিতার প্রকৃত সম্মান ও ভাতা দাবি করেন। তারা বলেন, বর্তমান সরকার মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার। এই সরকারের সময় এটা পাওয়া উচিত। একইসাথে তারা নিজেদের বাড়ির জমি রেকর্ডভুক্ত করার দাবি জানান।

উল্লেখ্য, ফালগীন দালবৎ ছিলেন বুরো বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন এর বন্ধু বীর মুক্তিযোদ্ধা ফালগীন দালবৎ পালোয়ানের নাতিন জামাই দুর্জয় সাংমা বুরো বাংলাদেশে কর্মরত।■

বীর মুক্তিযোদ্ধা ফালগীন দলবৎ-এর দুই কন্যা মেরুন নকরেক ও স্বপ্না নকরেক। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় বাড়ির পেছনের আনারস বাগানে বাবার কবর দেখাতে পারেননি তারা। অন্ধকারে আনারস বাগানে চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ। বাড়ির উঠানে বড়োসড়ো একটি দোকান আছে তাদের, অনেকটা পাহাড়ি রেস্তোরাঁর মতো, এখানে বসেই কথা বলেছি আমরা। দুই বোন আমাদের আপ্যায়ন করেছেন চা-বিস্কুট ও পান-সুপারি দিয়ে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা অনুপ মারাক

৭১-এর নৃশংস হত্যাযজ্ঞের জন্য পাকিস্তানিদের ক্ষমা চাওয়া উচিত

মহান মুক্তিযুদ্ধে নৃ-তাত্ত্বিক গারো সম্প্রদায়ের দেশপ্রেমিক তরুণরাও অংশ নিয়েছিল দেশকে শত্রুমুক্ত করতে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অস্ত্রহাতে। তাঁদেরই একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা অনুপ মারাক। বাবা মৃত জুগেশ রাকসাম ও মা মৃত চারুবালা দিও। নিজ জন্মস্থান শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ীর বরুয়াজনি গ্রামে। গারো সমাজব্যবস্থা মাতৃতান্ত্রিক হওয়ায় অনুপ মারাক বৈবাহিক সূত্রে এখন মধুপুরের ধরাটি গ্রামে বাস করছেন তাঁর স্ত্রীর বাড়িতে। তাঁর স্ত্রীর নাম লতিকা থাম্বুসান মৃ।

১৯৭১ সালে তিনি হালুয়াঘাট পাপিয়াজুরি হাই স্কুলের এসএসসির ছাত্র ছিলেন। এ সময় পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ হালুয়াঘাটের প্রত্যন্ত পাহাড়ি জনপদেও আছড়ে পড়ে। এরপর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে অন্য অনেকের সাথে অনুপ মারাকও যুদ্ধে অংশ নেয়ার অভিপ্রায়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে যান। তিনি স্কুল জীবনেই ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। সীমান্তের ওপারে তাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন ছিল। এর মধ্যে তাঁর মেসোমশাই অনুকূল মারাক তাকে নিয়ে সরাসরি ভারতের তুরার বাঙ্গিয়াপাড়ার মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে যান। তুরার রংনাবাগ সেন্টারে মুক্তিযুদ্ধের জন্য তিনি ট্রেনিং গ্রহণ করেন এবং ট্রেনিং শেষে প্লাটুন কমান্ডার ডা. উইলিয়াম মারাক এর নেতৃত্বে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে মুক্তিযুদ্ধ করেন। তাদের গ্রুপে ৩০ জন সদস্য ছিল। স্বাধীনতার পর তিনি হালুয়াঘাট পাপিয়াজুড়ি হাই স্কুল থেকে এসএসসি পাস করেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা অনুপ মারাক চট্টগ্রাম শহরের একটি মিশনারি হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। তিনি সেখানে বাইবেল স্কুল পালক এর দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘ কর্মজীবন শেষে তিনি বর্তমানে অবসর গ্রহণ করেছেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা অনুপ মারাক এবং লতিকা থাম্বুসান মৃ'র তিন পুত্র। বড় ছেলে রুয়েল দিও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে খুলনার একটি বাইবেল স্কুলে দায়িত্ব পালন করছেন। দ্বিতীয় শ্যামা দিও চট্টগ্রামের একটি ব্যান্ড দলের সাথে যুক্ত এবং তৃতীয় ইপাক্সা দিও একটি গির্জার পালকের দায়িত্ব পালন করছেন।

উল্লেখ্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা অনুপ মারাক ও তার পরিবার ব্যাপ্টিস্ট খ্রিস্টান।

প্রত্যয় টিম ৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ধরাটিতে তাঁর বাড়ি পৌঁছলে তিনি নিজেও খুব আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। বিকেলের হলুদাভ আলোয় প্রকৃতিও ছিল বেশ আনন্দ উজ্জ্বল। নিকোনো সুন্দর ঝকমকে উঠোনে বসেই কথা বললাম এই প্রবীণ বীর মুক্তিযোদ্ধার সাথে।

প্রত্যয় : মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আপনি সেই মহান মুক্তিযুদ্ধের একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান। মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনি কোথায় পড়াশোনা করতেন?

অনুপ মারাক : আমি তখন শেরপুর জেলার হালুয়াঘাট থানার পাপিয়াজুরি হাই স্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষার্থী। এর আগে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আমিও জয়বাংলা স্লোগান দিয়ে নৌকার প্রার্থীর পক্ষে মিছিল করেছি, বাড়িতে-বাড়িতে গিয়ে ভোটের ক্যাম্পিং করেছি। সারা দেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নৌকা বিজয়ী হলো। আনন্দ মিছিল করলাম। আমরা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের মানুষ। ভাবলাম, এখন আমরা সমান অধিকার নিয়ে এদেশে বাস করার সুযোগ পাব। কিন্তু না, তৎকালীন ইয়াহিয়া সরকার শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা না দেয়ায় সমগ্র দেশ জ্বলে উঠলো। আমরাও বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ঘরে ঘরে দুর্গ তৈরির প্রস্তুতি নিলাম। এর মধ্যেই বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হলেন। শুনলাম ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকা শহরে হাজার হাজার মানুষ মেরেছে। বাড়িঘর, ইউনিভার্সিটি সব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছে। এর মধ্যেই জানতে পারলাম বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা দেশের সর্ব উত্তর সীমানার বাসিন্দা। আমাদের পাশেই ভারত। ইতোমধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়েছে যে দলে দলে মানুষ আশ্রয় ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে ইন্ডিয়া যাচ্ছে। জানলাম, মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়েছে। আমরাও এখান থেকে এক দল ছাত্র-যুবক এপ্রিলের শেষ দিকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতের মাটিতে পা রাখলাম।

প্রত্যয় : আপনারা প্রথম কোথায় গেলেন?

অনুপ মারাক : খবর পেলাম তুরার বারাঙ্গিপাড়ায় মুক্তিবাহিনী রিক্রুটমেন্ট করা হচ্ছে। সেখানে আমার এক মেসোমশাই অনুকুল মারাক ছিলেন। তিনি আমাদের তুরায় নিয়ে যান। আমরা জঙ্গল পাহাড়ের মানুষ। তুরায় আমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি।

প্রত্যয় : আপনি সাধারণ একজন ছাত্র হয়েও সশস্ত্র মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে তুরা গেলেন– এর পেছনে মূলত কোন বিষয়টি কাজ করেছে?

অনুপ মারাক : আমরা স্কুলের ছাত্র হিসেবে প্রতিবছরই ২১ শে ফেব্রুয়ারি, ৫২ এর ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে শহীদ দিবস পালন করতাম। তখন থেকেই আমরা জানতাম যে, পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে আমরা পূর্ব পাকিস্তানিরা প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা পাইনি। আমরা ব্রিটিশ শাসন থেকে রেহাই পেলেও পিন্ডি আমাদের শাসন করছে, শোষণ করেছে। আমাদের অধীন করে রেখেছে। সে সময় আমি ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়ি। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু যখন ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার কথা বললেন, তখন শরীরে এক ধরনের আবেগ অনুভূত হলো। ভাবলাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এর জন্য যদি জীবন বাজি রাখতে হয় তাই করব। সেই চেতনা থেকেই নিজেকে যুদ্ধের জন্য তৈরি করছিলাম।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু যখন ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার কথা বললেন, তখন শরীরে এক ধরনের আবেগ অনুভূত হলো। ভাবলাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এর জন্য যদি জীবন বাজি রাখতে হয় তাই করব। সেই চেতনা থেকেই নিজেকে যুদ্ধের জন্য তৈরি করছিলাম।

প্রত্যয় : মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের পর আপনাদের কোথায় কি ধরনের ট্রেনিং দেয়া হয়েছে?

অনুপ মারাক : এটা সবারই জানা যে, পাকিস্তানি আর্মি তখনকার সময়ে বেশ শক্তিশালী আর্মি ছিল। তাদের বিরুদ্ধে আমরা সাধারণ মানুষ যাদের কোনো ট্রেনিং নেই বা অল্প সময়ের ট্রেনিং নিয়ে তারা কীভাবে লড়ব? সে জন্য ইন্ডিয়ান আর্মি আমাদেরকে গেরিলা ট্রেনিং প্রদান করে যাতে আমরা পাকিস্তানি আর্মিকে নানাভাবে কৌশলে পর্যুদস্ত করতে পারি।

আমাদের তুরার রঙ্গাবাগ ট্রেনিং ক্যাম্পে ব্রিজ ভাঙার এবং গেরিলা কায়দায় কীভাবে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে ক্ষিপ্রতার সাথে আক্রমণ করব সেই ট্রেনিং দেয়া হয়। ইন্ডিয়ান আর্মির একজন মেজর বলেন, তোমরা দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছো আর ওরা দখলদার– মনের দিক থেকে তোমাদের শক্তি বেশি, ওরা পরাজিত হবেই। এই মনের জোর নিয়েই আমরা ট্রেনিং শেষে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছি।

প্রত্যয় : আপনি কি কি অস্ত্র চালনা শিখেছিলেন?

অনুপ মারাক : গ্রেনেড চার্জ করা, ব্রিজ ধ্বংস করার জন্য কি কি করতে হবে তা শেখানো হয়েছিল। এ ছাড়া এসএমজি, এসএলআর, এলএমজি চালনাও শেখানো হয়েছিল।

প্রত্যয় : ট্রেনিং মুহূর্তে বিশেষ কোনো স্মৃতি মনে আছে?

অনুপ মারাক : জঙ্গলে ট্রেনিং হতো। বেশ কঠিন ট্রেনিং। গভীর জঙ্গল। আমাদের চলাচলের রাস্তায় হাতির পাল রাস্তা ধরে আসতো- শত শত হাতি। তখন রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলে লুকাতে হতো। তা না হলে হাতির পায়ের নিচে পিষ্ট হতে হতো। একবার ট্রেনিংয়ের সময় আমাদের এক মুক্তিযোদ্ধার চোখে জোঁক ঢুকে যায়। সেই জোঁক টেনে বের করতে প্রয়োজন ছিল চিমটার। তা না থাকায় জঙ্গলের দুই কাটা এক করে তারপর তা আনা হয়। কিন্তু একটি চোখ বেশ জখম হয়ে যায়।

প্রত্যয় : আপনারা প্রথম কোন যুদ্ধে অংশ নিলেন?

অনুপ মারাক : আমরা ময়মনসিংহের সীমান্ত অঞ্চল পাথরঘাটার দমনিকুড়ায় পাকিস্তানি আর্মিদের একটি ক্যাম্পে আক্রমণ চালাই। সেটি ছিল খুবই দুর্ভেদ্য। প্রথমে আমরা আক্রমণ করি পরে ইন্ডিয়ান আর্মি আমাদের সহায়তায় আক্রমণ চালিয়ে যায়। এই যুদ্ধে আমরা জয়ী হই। বেশ ক'জন পাকিস্তানি আর্মি মারা যায়। আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে পাক আর্মিরা ক্যাম্প ছেড়ে চলে যায়।

প্রত্যয় : আপনারা এক গ্রুপে কতোজন ছিলেন? এর মধ্যে আপনাদের সম্প্রদায়ের কতোজন ছিল?

অনুপ মারাক : আমরা ৩০ জনের এক প্লাটুন ছিলাম। আমাদের প্লাটুন কমান্ডার ছিলেন ডা. উইলিয়াম মারাক। ৩০ জনের মধ্যে ১৫ জন ছিলাম হাজং ও গারো সম্প্রদায়ের। আমরা বেশ সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে থেকেছি। মুক্তিযুদ্ধের সেই সময়টার কথা কোনোদিন স্মৃতি থেকে মুছবে না। কি কষ্টই না করেছি। অনেক সময় দুই দিন ধরে শুধু পানি খেয়ে থাকতে হয়েছে। হঠাৎ যদি কোথাও একটু চিড়া-মুড়ি পেতাম সবাই এক মুঠো করে খেয়ে নিতাম। কি তৃপ্তি যে ছিল সেই খাবারে।

প্রত্যয় : আপনারা অনেক অপারেশনেই গিয়েছেন। এর মধ্যে কাউকে হারাতে হয়েছে?

অনুপ মারাক : জ্বী হাঁ। নালিতাবাড়ী অপারেশনের সময়। পানিহাটিতে যুদ্ধ চলছিল। সেই ভয়াবহ যুদ্ধে আমরা পাক আর্মিদের অ্যাম্বুশের মুখে পড়ে যাই। এটা ছিল ডিসেম্বর মাস। এই যুদ্ধে আমাদের সহযোদ্ধা গুলিবিদ্ধ হন। আমি তাকে বাঙ্কার থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি। পরে সে মারা যায়। তার এই মৃত্যু আমাকে গভীর যন্ত্রণা ও কষ্ট দেয়।

প্রত্যয় : মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আপনি দেশ-মাতৃকার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের একজন। বর্তমান বাংলাদেশ সম্পর্কে আপনার অনুভূতি কি?

অনুপ মারাক : বর্তমানে দেশে বেশ উন্নয়ন হচ্ছে। গ্রাম পর্যায়েও আপনি উন্নয়নের ছোঁয়া দেখতে পাবেন। এই যে মধুপুরের ধরাটি এসেছেন একদম পাকা রাস্তায়। বিদ্যুৎ আছে প্রতি বাড়িতেই। বাংলাদেশের কোনো মানুষকে এখন আর অনাহারে থাকতে হয় না। পড়াশোনার হার বাড়ছে। স্বাস্থ্যসেবা বেড়েছে। মানুষের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। অর্থনৈতিকভাবে আমরা নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছি। পদ্মা সেতুর মতো বৃহৎ প্রকল্প আমরা

নিজেরা করতে সক্ষম হয়েছি। ভবিষ্যতে উন্নত দেশে পরিণত হবো আশা করা যায়। আমি এ জন্য বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রত্যয় : দেশের কোন কোন বিষয় আপনাকে মর্মপীড়া দেয়, কষ্ট পান?

অনুপ মারাক : সবকিছুই ভালো চলছে। কিন্তু ঘুষ-দুর্নীতির বিষয় আমাকে বেশ কষ্ট দেয়। দেশে সন্ত্রাস-রাহাজানি কষ্ট দেয়। ধর্ষণের মতো ঘটনা কষ্ট দেয়। আমি মনে করি এগুলো দূর করতে পারলে আমাদের মতো সুন্দর দেশ আর কোথাও পাওয়া যাবে না। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি বারবার ঈশ্বরকে বলেছি– 'আমাকে রক্ষা করো তোমার জন্য কাজ করব'। আমি সেভাবে কাজের চেষ্টা করছি, মানুষের সেবা করে যাচ্ছি।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়লো– 'ঈশ্বর দাউদকে বলেছিল– ঘুষ দুর্নীতি করো না। অনুসারীদেরও এ থেকে বিরত রেখো।' কিন্তু আমাদের দেশে এখন সবকিছুতেই দুর্নীতির ছোঁয়া দেখা যায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একার পক্ষে প্রতিরোধ সম্ভব নয়। সকলকেই সচেতন হতে হবে।

প্রত্যয় : আপনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী দেশে হত্যাযজ্ঞ, নারী নির্যাতনসহ দেশকে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে, রাষ্ট্রীয়ভাবে সেই পাকিস্তান এখন বন্ধুপ্রতীম দেশ– আপনার মন্তব্য কি?

অনুপ মারাক : আমাদের রাষ্ট্রীয় নীতি অনুযায়ী যেকোনো রাষ্ট্র যারা আমাদের ক্ষতি করবে না এবং আমাদের সার্বভৌমত্ব মেনে সম্পর্ক রাখবে সবার সাথেই বন্ধুত্ব হতে পারে। তবে পাকিস্তানি সরকার ও সে সময়ের সেনবাহিনী যে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ ও ধর্ষণ এদেশে চালিয়েছে তার জন্য অবশ্যই আমাদের কাছে তাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত।

প্রত্যয় : আপনি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্য হয়েও মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছেন। আপনারা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা কি কোনো বৈষম্যের শিকার?

অনুপ মারাক : এটা ঠিক যে, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী যাকে আমরা আদিবাসী বলি, সেই আদিবাসী সম্প্রদায়ের সন্তান হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারায় আমি সত্যিই গর্বিত। বর্তমানে দেশে যে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজমান ও ধারাবাহিক উন্নয়ন চলছে সেক্ষেত্রে আমরা কোনো বৈষম্য দেখি না। তবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চাকরি ক্ষেত্রে আরো সুযোগ দেয়া উচিত।

প্রত্যয় : দেশে বুরো বাংলাদেশসহ এনজিওদের সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

অনুপ মারাক : দেখুন, আমাদের বাইবেলে আছে মানুষের সেবার মধ্যে ঈশ্বরের সেবা রয়েছে। এনজিওরা মানুষের সেবায় কাজ করছে, সুতরাং তাদের এই কার্যক্রমকে আমি শ্রদ্ধা করি। এ প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন সাহেব দেশের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করার পাশাপাশি আমাদের মধুপুরে গারো সমাজের উন্নয়নেও অবদান রেখে চলেছেন– এ জন্য তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। ঈশ্বর সবার মঙ্গল করুন।

প্রত্যয় : একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নতুন প্রজন্মের প্রতি আপনার প্রত্যাশা কি?

অনুপ মারাক : তাদের কাছে আমার একটিই প্রত্যাশা, দেশপ্রেমিক হতে হবে এবং ভালো নাগরিক হতে হবে।■

গারো মা ও শিশু

গারো পাহাড় ভারতের মেঘালয়ে। লুসাইদের মতো গারোরাও নাম নিয়েছে পাহাড় থেকে কিংবা পাহাড়কে দিয়েছে নিজেদের নাম। গারোদের ভাষা আচিক, আদি ধর্ম সাংসারেক আর জাতি সত্তা মান্দি। মান্দি অর্থ মানুষ। মান্দিরা মাতৃতান্ত্রিক। মা সমাজ-সংসারের প্রধান। এটা সাংসারেক রীতি। ১৮৯২ সালে অধিকাংশ গারো খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করার পরও এই রীতি এখনো বিদ্যমান। ফলে গারো শিশুদের পরিচয় নির্ধারিত হয় মায়ের বংশ পরিচয়ে আর সম্পত্তির জন্মগত অধিকার শুধু কন্যা সন্তানের। মায়ের কন্যা সন্তান যদি নাও থাকে তবুও ছেলে সন্তান বিবেচিত হয় না উত্তরাধিকারী হিসেবে। তবে মা চাইলে পুত্র সন্তানকে উইলের মাধ্যমে সম্পত্তির অংশ দিতে পারেন।

এই গারো সমাজে বিগত দুই দশকে অল্প অল্প করে হলেও কিছু পরিবর্তন এসেছে। মেয়েদের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনে ছেলেরা এগিয়ে গেছে অনেকদূর। গারো মেয়ে ও ছেলে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছে সমান তালে। অনেক গারো ছেলেই এখন বিয়ের পর স্ত্রীর বাড়িতে না উঠে স্ত্রীকেই উঠিয়ে নিয়ে আসছেন নিজের বাড়িতে। পুত্র সন্তানকে সম্পত্তি প্রদান করার প্রবণতাও বাড়ছে মায়েদের মধ্যে। পাশাপাশি প্রযুক্তি ক্ষেত্রেও বেড়েছে গারোদের অংশগ্রহণ। মধুপুর শালবনের গহীনে এখন খুঁজলে পাওয়া যায় অসংখ্য ফ্রিল্যান্সার। মান্দি নৃগোষ্ঠীর এ এক অসম্ভব সুন্দর সাফল্য। তাই বলাই যায়, ছবির এই গারো শিশুরাও এক দিন শিক্ষার আলোতে আলোকিত করবে ওদের সমাজ ও দেশকে।

ধীরামণি মৃ

মধুপুর গড়ের প্রত্যন্ত অংশে গারোদের একটি গ্রাম ধরাটি। এ গ্রামের পথ ধরেই হেঁটে যাচ্ছিলাম প্রয়াত দুই বীর মুক্তিযোদ্ধা চীন সাংমা ও ফালগিন দলবৎ পালোয়ানের বাড়িতে। বৃষ্টিভেজা ধরাটির মেঠোপথ কাদাজলে সয়লাব। সরু পাকা রাস্তা থেকে কাদাজলের রাস্তায় যখন নামবো তখন আমাদের উল্টো দিক থেকে হেঁটে আসছিলেন এক গারো নারী। পিঠে লাকরির ঝুড়ি। তিনি কাছে আসতেই বুঝতে পারলাম দূর থেকে ঝুড়িটিকে হালকা ভাবাটা ভুল ছিলো। ঝুড়িওয়ালী এই নারীর নাম ধীরামণি মৃ। তবে এত ভারী বোঝা নিয়ে কাঁচা পথ ধরে তিনি যেভাবে হেঁটে আসছিলেন তা মোটেই ধীরগতি ছিলো না। তিনি কাছে আসার পর একটা ছবি তোলার আবদার করলাম, তিনি সায় দিলেন। মাতৃতান্ত্রিক গারো জনগোষ্ঠীর নারীরা সংসার ও সমাজের সব দায়িত্বই পালন করেন। ফলে তারা কর্মঠ ও শ্রমে নিরলস। নারী হয়েও যে একটি জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেওয়া যায় তা এই ধীরামণি মৃ'র মতো গারো নারীরা প্রমাণ করেছেন ঘরে ও ফসলের ক্ষেতে।

ধীরামণিকে বিদায় দিয়ে আমরা যখন ধরাটির গহীনে এগুতে শুরু করলাম তখন নিজেকে বেশ লজ্জিত মনে হচ্ছিলো। কারণ ঐ লাকরির ঝুড়ি আমার পিঠে চাপিয়ে দিলে ধরাটির কাদাজলে ধরাশায়ী হওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিলো না।

প্রতিবেদন

সাঁওতাল-ওঁরাওদের আত্মার আত্মীয়

আশ্রয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. আহসান আলী ১৯৯০ সালে দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাঁওতালদের নিয়ে তাঁর পিএইচডি গবেষণার কাজ করতে গিয়ে উপলব্ধি করেন এই নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা দরিদ্র, অসহায় এবং শিক্ষাবঞ্চিত। সে সময়েই তিনি সিদ্ধান্ত নেন, এই জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কিছু একটা করা দরকার। সেই ইচ্ছা থেকেই তিনি 'আশ্রয়' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অনুভব করেন, এদের ধর্ম, ভাষা আলাদা; বাঙালিদের ভাষা তারা ঠিকভাবে বোঝেন না, আবার তাদের ভাষাও মূলধারার বাঙালি সমাজ সেভাবে বুঝতে পারে না। এক সময় তাদের জমি ছিল– অভাব থাকায় ও শিক্ষা না থাকায় প্রতারণা করে অগ্রসর শ্রেণী তাদের সম্পত্তি লিখে নিয়েছে। ফলে তাদের অধিকাংশই স্রেফ মজুরে পরিণত হয়েছে।

সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর অনেকে বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণ নিলেও মূলত সম্প্রদায়গতভাবে তারা কোনো ঋণ নেয়াকে পছন্দ করে না। পূর্ব পুরুষের জমি নানাভাবে বেহাত হয়ে পড়ায় এই জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই হতদরিদ্র। তাদের আয়ের প্রধান উৎসই এখন মজুরি খাটা, নারী-পুরুষ উভয়েই অন্যের জমিতে কাজ করে থাকে। এখন অনেকেই আশ্রয়, বুরো বাংলাদেশ, ব্র্যাক, আশা, ওয়ার্ল্ড ভিশনসহ এনজিওদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়ে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উন্নত জীবন যাপন সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। বর্তমানে আশ্রয় এর সদস্য সংখ্যা প্রায় ৬৫ হাজার। ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ১৯ হাজার। এর মধ্যে আদিবাসী ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ৬২০০। ইতোমধ্যে আশ্রয় থেকে সাঁওতাল ও ওঁরাও সম্প্রদায়ের অনেকেই ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে গরু-ছাগল পালন করছে। তারা সাধারণত ১০ হাজার টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করেছে। ব্যবসায়িক ঋণও নিয়েছে কেউ কেউ। অনেকে মৎস্য চাষের সাথেও জড়িত।

নওগাঁর ওঁরাও পল্লী

নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার কুসুম শহর গ্রামটি নামে শহর হলেও এখনো অজপাড়া গাঁ। পাকা রাস্তা থেকে নেমে গ্রামের ভেতর ওঁরাও পল্লী। এখানে ২৫/৩০ ঘর ওঁরাও এক সাথে বসবাস করে। বাড়িঘর কাঁচা মাটির, ওপরে টিনের ছাউনি। দু'একজনের ঘর পাকা ওয়াল করা।

কথা হলো শ্রীমতি খয়ার সাথে। বাবা জিতেন খয়া, মা ভারতী খয়া, স্বামী অমল এক্কা। অভাব এবং সচেতনতার অভাবে স্কুলে যাওয়া হয়নি। ১৯৮৮-৯৯ সালে জোয়ানপুর বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র থেকে নাম স্বাক্ষর এবং গণনা করা শিখেছেন। ২০২১ সালে আশ্রয় এর সদস্য হন। শুরুতে ২০ হাজার টাকা ঋণ নেন। নিজের সঞ্চয় থেকে আরো কিছু যোগ করে ১টা গরু এবং বাছুর কেনেন।

আশ্রয় এর আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন কর্মসূচি এবং সচেতনতার আওতায় শ্রীমতি খয়াদের জীবন মানের অনেক পরিবর্তন এসেছে। ২ ছেলে লেখাপড়া করছে। বড় ছেলে রবিন এক্কা স্থানীয় কলেজে ডিগ্রি প্রথম বর্ষের ছাত্র এবং ছোট ছেলে স্কুলে অধ্যয়ন করছে।

শ্রীমতি খয়া জানালেন, অতীতের চেয়ে তাদের জীবনযাত্রার মানের অনেক উন্নয়ন ঘটেছে– যার মূলে রয়েছে আশ্রয় এনজিও। তিনি বলেন, আমাদের কাছে আশ্রয়ই হচ্ছে বড় আত্মীয়।

শ্রীমতি অনিতা রানী

শ্রীমতি অনিতা রানী জানালেন তাদের বিঘা দেড়েক জমি নিজস্ব, আরো ১ বিঘা জমি চুক্তিভিত্তিক নিয়ে ধান চাষ করছেন। আড়াই বিঘা জমির জন্য তিনি ২৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন। ৩ ফসলি জমি। তিনবার ধান হয়। নিজেদের প্রয়োজনীয় ধান রেখে ৮০ হাজার টাকার ধান বিক্রি করেছেন। এর আগে ৪০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলেন তা শোধ করেছেন। আশ্রয় এর এই ক্ষুদ্রঋণ সহায়তায় তাদের উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে।

রীনা তিগগা, স্বামী শ্যামল এক্কা

২০২১ সালে রীনা তিগগা ও স্বামী শ্যামল এক্কা আশ্রয় থেকে ৩০ হাজার টাকা ঋণ নেন এবং তা পরিশোধ করে ২০২২ সালে ৬০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এ টাকায় গরু কিনেছেন এবং ফসলের জমিতে কাজে লাগিয়েছেন। নিজেদের ১ বিঘা এবং বন্ধক নিয়েছেন ৩ বিঘা।

রীনা তিগগা জানান, আশ্রয় তাদের পাশে আছে বলেই তারা স্বচ্ছলতার মুখ দেখতে পারছেন। তাদের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটেছে। তিনি বলেন, 'আমরা

দারিদ্রতার কারণে শিক্ষিত হতে পারিনি, কিন্তু সন্তানদের পড়াচ্ছি। তাদের ৩ মেয়ে ২ ছেলে। ২ মেয়ের বিয়ে হয়েছে। ২ ছেলে ও ১ মেয়ে পড়াশোনা করছে। এক ছেলে এসএসসি দেবে, আরেক ছেলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ও ছোট মেয়ে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী।' তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, ফসল ফলাতে আমাদের টাকার প্রয়োজন হয়। সে সময়টিতে এনজিওরা কাছে না দাঁড়ালে আমরা চাষ করতে পারতাম না। ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠানো বন্ধ হয়ে যেতো।

দেওলাপাড়ার ওঁরাওগণ

দেওলাপাড়ার ওঁরাও জনগোষ্ঠীর প্রায় ২১/২২ জন সদস্যের সাথে কথা হয়। ওঁরাওরা সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী। রীনা তিগগা বললেন, আমরা ধর্ম দিয়ে মানুষকে বিচার করি না। আমরা মানুষকে ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি, সে যে ধর্মেরই হোক।

পত্নীতলার ডোহানগর সাঁওতাল পল্লী

অর্পা হাসদা, স্বামী শিপন মুরমু। অর্পা দিনাজপুর সরকারি কলেজে বোটানিতে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। স্বামী শিপন মুরমু ডিপ্লোমা করেছে। ৬ মাস হয় বিয়ে হয়েছে। ৩ মাস হলো ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছে আশ্রয় থেকে। ৫৫০ টাকা করে কিস্তি প্রদান করেন। তিনি ঋণের টাকায় বকনা বাছুর কিনেছেন। অর্পার চোখে-মুখে আনন্দের ঝিলিক। অতীতের কথা মনে করে তিনি বলেন, এক সময় আমাদের সমাজে শিক্ষিত মানুষ ছিল না বললেই চলে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সম্প্রদায়ের অনেক ছেলে-মেয়ে স্কুল-কলেজে পড়ছে।

এপ্রিলা হেমব্রম

এপ্রিলা হেমব্রম, স্বামী রাফায়েল বাসকি। ডোহানগরের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের এই নারী এইচএসসি পাস। তাদের বাচ্চাটি এখনো ছোট। যে কারণে চাকরি করার সুযোগ হয়নি। এখন অবশ্য বাচ্চার স্কুলে যেতে হয়। বাচ্চা বড় হলে তিনি চাকরির চিন্তা করছেন। স্বামী রাফায়েল বাসকিও এইচএস-সি পাস। একটি কোম্পানিতে চাকরি করছেন।

এপ্রিলা হেমব্রম একজন কর্মঠ নারী। চাকরি করতে না পারলেও স্বাধীন-ভাবে কাজ করার সুযোগ করে নিয়েছেন। তিনি আশ্রয় থেকে ৩৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে গরু কিনেছেন। নিজ সন্তানের পাশাপাশি গরুটির প্রতিও যত্নবান তিনি। এখন তাকে মাসে ৪ হাজার টাকা কিস্তিসহ ৫০০ টাকা সঞ্চয় জমা দিতে হয়। তিনি বলেন, এই সঞ্চয় হঠাৎ দুর্দিনে আলোর দিশা দেখাবে। তিনি আশাবাদী গরুটি ৮০/৯০ হাজার টাকায় বিক্রি করতে পারবেন।

সীতা হেমব্রম

সীতা হেমব্রম, স্বামী এলিয়াস মুরমু। পিতার দারিদ্রতা তাকে পড়াশোনা করতে দেয়নি। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ুয়া সীতাকে বেশ চটপটে ও বুদ্ধিবৃত্তিক বলে মনে হলো। জানালো, সাঁওতালদের খবর কেউ নেয় না। তবে আশ্রয়সহ কিছু কিছু এনজিও আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা আমাদের কর্মস্থানের জন্য ঋণ দিচ্ছে। আমরা যে মানুষ, এ দেশের নাগরিক, আমাদের অধিকার রয়েছে ভালোভাবে বেঁচে থাকার, সেই সচেতনতা তারা জাগিয়েছে। কিন্তু সরকার কিংবা স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের খুব একটা সহযোগিতা পাওয়া যায় না। এর বড় প্রমাণ এই পল্লীতে ঢোকার রাস্তা ভাঙাচোরা, কাদায় পরিপূর্ণ। সীতা আশ্রয় থেকে ১ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে ২টি পুকুর লিজ নিয়েছেন। তিনি আশাবাদী, এতে তার লাভ হবে এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরবে।

দীপালী হেমব্রম

দীপালী হেমব্রম, স্বামী নিক্যুল মারডি। সাঁওতাল নৃগোষ্ঠীর দীপালী হেমব্রম পড়াশোনা করেছেন দশম শ্রেণী পর্যন্ত। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে আর পড়তে পারেননি। তিনি মনে করেন, পিছিয়ে পড়া এই জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারের আলাদাভাবে উদ্যোগ নেয়া দরকার। পড়াশোনা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া উচিত। তিনি বলেন, সাঁওতালরা পরিশ্রমী। অন্যের জমিতে মজুর খাটে। এখানে মজুরি হিসেবে ছেলেদের ৫০০ টাকা এবং মেয়েদের ৩০০ টাকা দেয়া হয়। তিনি এ বৈষম্যের অবসান চান। তিনি আরো বলেন, আমাদের দখলীসত্বের জমি রেকর্ডভুক্ত করে দেয়া হোক।

রীতা মারদী

রীতা মারদী, স্বামী কাজল হেমব্রম। রীতা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে মিশন স্কুলে। স্বামী কাজল হেমব্রম একটি বিস্কুট ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন। দুজনে কাজ করায় তারা অন্যদের চেয়ে সচ্ছল। রীতা মারদী আশ্রয় থেকে ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন। তিনি মনে করেন, এনজিওলো দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করছে বলেই তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারছেন। রীতা বলেন, আমাদের শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়া উচিত। পাশাপাশি কর্মসংস্থানের উদ্যোগ সৃষ্টিতে এনজিওদের আরো বেশি বেশি কাজ করা প্রয়োজন।

সেলিনা সরেন

সেলিনা সরেন, স্বামী সয়লান মাগতি। তারা দুজনেই কৃষিকাজের সাথে সম্পৃক্ত। সেলিনা সরেন এখনো আশ্রয় থেকে কোনো ঋণ নেননি। তবে তিনি আশ্রয়ের সঞ্চয়ী সদস্য। প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে সঞ্চয় করেন। তিনি বলেন, আশ্রয় আমাদের গরিবের ব্যাংক। এখানে নিরাপদভাবে লেনদেন করতে পারি।

বিউটি কিসকু

বিউটি কিসকু, স্বামী রুবিন মারডি। বিউটি কিসকু এসএসসি পাস করেছে। বিউটি আশ্রয় থেকে ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন। তিনি অধিক ঋণ নিয়ে উদ্যোক্তা হবার চিন্তা করছেন।

শান্তনী মুরমু

শান্তনী মুরমু, স্বামী নিখিল সরেন। শান্তনী মুরমু এসএসসি পাস করেছেন। তিনি ৮০ হাজার টাকা নিয়ে স্বামীর দোকানে বিনিয়োগ করেছেন। এতে তাদের আয় ভালো হচ্ছে। শান্তনী মুরমু বলেন, আমরা এখনো অনেক পিছিয়ে আছি। সরকার বাঙালি গৃহহীনদের জন্য বিল্ডিং করে দিচ্ছেন, সেই সুবিধা আমাদের জন্যও দেয়া উচিত।

অলিভিয়া

অলিভিয়া মারডি, স্বামী নিকেশ হাজদা। স্বামী একজন কৃষি শ্রমিক। অলিভিয়া মারডির পৈতৃক বাড়ি দিনাজপুর। তারা দুজনেই পরিশ্রমী। তারা মনে করেন এনজিওরা পিছিয়ে পড়া সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর আত্মার আত্মীয়।

বুলবুলি কিসকু

বুলবুলি কিসকু। স্বামী ডিডু মারডি। বুলবুলি কিসকু অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। তাদের ২ মেয়ে। স্কুলে যাচ্ছে। ডিডু মারডি কৃষিকাজের সাথে জড়িত। বুলবুলিও। বুলবুলি আশ্রয় থেকে ৩০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে এবং নিজের টাকা মিলিয়ে একটি গরু ক্রয় করেছেন। বুলবুলি আশাবাদী এই গরু তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন এনে দেবে।

সোনালী টুডু

সোনালী টুডু, স্বামী জগেশ মুরমু। তাদের ১ ছেলে ১ মেয়ে। কৃষিকাজের সাথে সম্পৃক্ত। তাদের শিশুরা মিশনারী স্কুলে পড়ে। তারা ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন আশ্রয় থেকে। একটি গরু কিনে পালন করছেন। বড় হলে বেশি দামে বিক্রির আশা করছেন।

সুমিতা বেয়রা

সুমিতা বেয়রা, স্বামী হান্দ্রিরাস মুরমু। কৃষিকাজের সাথে সম্পৃক্ত। তাদের ১ ছেলে ১ মেয়ে। ছেলে মিশনারী স্কুলে ক্লাস নাইনে এবং মেয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। তারা আশ্রয় থেকে ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছে।

তেরেজিনা সরেনা

তেরেজিনা সরেনা, স্বামী সুনীল টুডু। কৃষিকাজের সাথে সম্পৃক্ত। তেরেজিনা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন। তারা আশ্রয় থেকে ৪৮ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন। গরু পালন করছেন। তাদের মেয়ে দশম শ্রেণীর ছাত্রী।

পর্যবেক্ষণ

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষেরা খুব সরল প্রকৃতির। তাদের মধ্যে খুব বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। সম্প্রদায়গতভাবে এই নৃগোষ্ঠীর মানুষ ঋণ গ্রহণ পছন্দ করে না। তারা মনে করে দিন মজুরি করে যা পাওয়া যাবে তাই দিয়েই আহার জুটবে। এটাকে তারা ঈশ্বরের কৃপা বলেন। মিশনারীর সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় এখানকার দরিদ্র ছেলে মেয়েরা বিনা অর্থে মিশনারীতে পড়ার সুযোগ পায়। কিন্তু উচ্চাশা বা সেরকম স্বপ্ন না থাকায় অধিকাংশই উচ্চ শিক্ষা নেন না বা নেয়ার সুযোগ পান না। তবে এখন তারা বেশ সচেতন। তাদের অনেকেরই অভিযোগ, বর্তমান সরকার তাদেরসহ দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিলেও স্থানীয়ভাবে তারা বঞ্চিত। বিশেষ করে তাদের বাসস্থানের জন্য দেয়া জায়গা দিন দিন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে। এক্ষেত্রে তারা সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের সহায়তা প্রত্যাশা করেন। যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরিতে তাদের সুযোগ দেয়ার অনুরোধও করেন তারা।

এনজিও সম্পর্কে ধারণা

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষদের সাথে কথা বলে জানা গেল, মিশনারীর পরেই তারা যাদেরকে আত্মার আত্মীয় মনে করেন তারা হলো এনজিও। তাদের কথা এনজিওরা তাদের পাশে আছে বলেই তারা শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ নিরাপদ জীবন যাপন করতে পারছেন।

এনজিও এবং মাতৃত্বকালীন ভাতা

ডোহানগর সাঁওতাল পল্লীর নারীরা জানালেন, তারা মাতৃত্বকালীন ভাতা থেকে বঞ্চিত। অথচ সরকার প্রসূতি মা ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতের লক্ষে ৪ বছর মাসিক ৮০০ টাকা হারে এই ভাতা প্রদান করে থাকে। তারা জানালেন যে তারা শুনেছেন ডরপ নামে একটি এনজিও শুরুতে দুস্থ ও অসহায় মায়েদের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা চালু করেছিল যা পরবর্তীতে সরকারি কর্মসূচি হিসেবে আরো বিস্তৃত আকারে প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু তারা দুস্থ ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও এই পল্লীর কোনো প্রসূতি নারী তা পাননি বলে জানালেন। তারা সুষ্ঠুভাবে এই ভাতা প্রদানের দাবি করেছেন।■

রাজশাহী বিভাগের সমতলের নৃগোষ্ঠীসমূহের ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং বিকাশের লক্ষ্যে ২০০৩ সালে সরকার 'রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কালচারাল একাডেমি' প্রতিষ্ঠা করে। একাডেমির গবেষণা কর্মকর্তা বেনজামিন টুডু জানালেন, নিজস্ব সাংস্কৃতিক উৎসবসহ এখানকার সাঁওতাল-ওঁরাওরা মহান স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, বঙ্গবন্ধুর শাহাদৎ বার্ষিকীও পালন করে থাকে। টুডু বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃগোষ্ঠীর মতো বাজেটে সমতলের নৃগোষ্ঠীর জন্যও বরাদ্দ রাখা উচিত। একাডেমি প্রাঙ্গনে নৃগোষ্ঠীর শিল্পীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে।

ওঁরাও : ইএসডিও'র কল্যাণে উন্নয়নে

পাকা সড়ক থেকে নেমে প্রায় ২ কিলোমিটার আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে যে গ্রামটিতে এসে গাড়ি থামলো তার নাম ভাতগাঁও। এটি ঠাকুরগাঁওয়ের আউলিয়াপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের একটি গ্রাম। এই গ্রামের অন্যান্যের সাথে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী ওঁরাওদের প্রায় ২৫টি পরিবারের বাস। গ্রামের একপাশে ওঁরাওদের বাড়িঘর। তারা নিজেরাই জানালেন, তাদের জমির অধিকাংশই ছিল খাস জমি। এ জমিগুলো এক সময় স্থানীয় প্রভাবশালী জোতদারদের দখলে ছিল। তারা এসব জমিতে দিন মজুরিতে খাটতেন। ভীষণ কষ্টে একবেলা-অর্ধবেলা আহার জুটতো। অনেক সময় মাটির নিচে প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন এক ধরনের তিতা আলু খেয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি মেটাতে হতো। লেখাপড়ার সুযোগ ছিল না, অসুস্থতায় চিকিৎসার কথা ভাবতেই পারতো না তারা। বলা যায়, মানবেতর এক জীবনযাপন ছিল তাদের।

তারা যখন দারিদ্র্যের সমুদ্রে নিমজ্জিত, যখন লড়াই করার সামর্থ্যও হারিয়ে ফেলেছেন এসব মানুষ, ঠিক সে সময়েই ইকো সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। তাদের দিন বদলের আশ্বাস দেয় এবং তাদের লড়াইকে নিজেদের লড়াই হিসেবেই গ্রহণ করে। ইএসডিও এর সহযোগিতায় ওঁরাওরা খাস জমির বরাদ্দ লাভ করে। এখন তারা বাড়ির মালিক, জমির মালিক।

ইএসডিও এর কর্মকর্তা দেবাশীষ ওঁরাওদের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ওঁরাওরা ধর্মে খ্রিস্টান। তাদের বাইর বাড়িতে পাটি বিছিয়ে রাখা ছিল। পাশে আমাদের জন্য ছিল চেয়ার। আমরা চেয়ারে না বসে তাদের সাথে পাটিতেই বসলাম। ওরা বেশ আন্তরিকতার সাথে তাদের পরিচয় দিল। তাদের ভাষায় প্রত্যেকেই বললো স্বাগতম। এ গ্রামটিতে প্রায় ২০/২৫টি পরিবারের বাস। অন্যরা কাজে ব্যস্ত থাকায় পুরুষ-মহিলা মিলে ১১/১২ জন উপস্থিত ছিলেন। যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে– জেসপিনা পান্না, সেলিনা লাকরা, সুমিত্রা টপ্য, বারতিলা এক্কা, দিপ্তি তপনো, রিতা তিকী, বিনা মিনজ, পাস্কোলিনা মিন্‌জ, কলম্বস মিন্‌জ, পাত্রাস মিন্‌জ, লরেন্স লাকড়া।

লক্ষ্য করলাম তাদের বাড়িঘরের যেমন উন্নতি ঘটেছে, তাদের পোশাক পরিচ্ছদেও বেশ পরিবর্তন এসেছে। তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়েছে। স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাদের একজন জেসপিনা পান্না বললেন, ইএসডিও'র সহায়তায় তাদের আর্থিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। তিনি গরু ও হাঁস-মুরগি পালন করছেন। এক সময় তারা ভূমিহীন ছিলেন, এখন তাদের নামে খাস জমি রেজিস্ট্রি বরাদ্দ পাওয়ায় নিজেদের বাড়ি হয়েছে।

পান্না জানালেন, পুরুষ ও নারী সবাই কর্মঠ। এক সময় দিনমজুরি খাটতেন, পারিশ্রমিক ছিল খুবই কম। আগে ১০ টাকা পেতেন, এখন ২শ' টাকা পাওয়া যায়। এখন গরু পালন ও অন্যান্য আয়বর্ধনমূলক কাজ করে প্রতিটি পরিবারেরই আয় বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন আর একবেলা দুবেলা না খেয়ে থাকতে হয় না।

পাত্রাস মিন্‌জ বললেন, হামাদের ঘর গুলান সব খড়ের ছাউনি ছিল। টিউবওয়েল ছিল না। মাটির কুয়া থেকে পানি আনতে হইতো। এখন সব হয়েছে। এক সময় পেটের ক্ষুধায় মাটি থেকে তিতা আলু তুলে খেতাম, এটি ছিল ভাতের মতোই প্রধান খাদ্য। এখন আর তা খেতে হয় না। ঈশ্বর আমাদের সব দিছেন।

মুক্তিযুদ্ধেও তারা ভূমিকা রেখেছেন। তাদের একজন মুক্তিযোদ্ধা রুবেন মিনজ, এখন মৃত। তার পরিবার এখন মুক্তিযোদ্ধা ভাতা পাচ্ছে। গ্রামের সুমিত্রা টপ্যা এইচএসসি পাস করেছেন, তিনি কাজী ফার্মস এ চাকরি করেন। লরেন্স লাকড়া ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছেন। তিনিও চাকরি করেন। তাদের সমৃদ্ধ ধান ক্ষেত, গরু পালন, সবজি ক্ষেত দেখে মনে হলো তারা বাস্তবিকই নিজেদের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন এবং এই সাফল্যের কৃতিত্ব ইএসডিও এর সদস্যদেরও।

এদের মধ্যে সাবিনা টপ্যা তাঁত শিল্পের সাথে জড়িত। তার ১০টি তাঁত আছে, ১০ জন তাঁত কর্মী আছেন। তিনি পাপোস তৈরি করে বাজারজাত করেন। ৮টি পরিবারের এখনো জমি নেই। ইএসডিও তাদের জন্য খাস জমি বরাদ্দের চেষ্টা করছে। ওঁরাওদের কেউ কেউ গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ২০/৩০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন বলে জানান।

তাদের দেখে মনে হলো, পিছিয়ে থাকা ওঁরাও জনগোষ্ঠীর এই উন্নয়ন বলে দিচ্ছে বাংলাদেশ সত্যিই স্থায়ী উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এর উন্নয়নে এনজিও/এমএফআইরা সহযোগিতা দিচ্ছে।■

শান্তনী মূর্মু

সাঁওতাল নারী শান্তনী মূর্মু একজন এনজিও কর্মী। গত দুই বছর ধরে কাজ করেন রাজশাহীভিত্তিক এনজিও আশ্রয়ের সিস্টার হিসেবে। পদবি সিস্টার হলেও ক্ষুদ্রঋণ ও সঞ্চয় নিয়ে কাজ করাই তার প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব। সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাঁওতাল ও ওঁরাওদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গত কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে আশ্রয়। ফলে একজন সাঁওতাল হিসেবে আশ্রয়ে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন শান্তনী। তাছাড়া সাঁওতাল ও ওঁরাও নারীরাও খুব সহজেই মিশে যায় তার সাথে। এতে কাজ করতেও সুবিধে হয় তার। তবে শান্তনী মনে করেন, দরিদ্র সাঁওতাল সম্প্রদায়কে নগদ ঋণ দেওয়ার পরিবর্তে যদি গবাদি পশু কিনে দেওয়া যেত তাহলে এই নৃ-গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন আরো ত্বরান্বিত হতো। কারণ হিসেবে নগদ অর্থ অনেকেই অপচয় করেন।

শান্তনী মূর্মু'র একটিই সন্তান, পড়ে তৃতীয় শ্রেণিতে। স্বামীকে নিয়ে তিনি বসবাস করেন নওগাঁ জেলার পত্নীতলা ইউনিয়নের বড় চাঁদপুর গ্রামে।

রবিন এক্কা

গ্রামের নাম কুসুম শহর হলেও শহরের ছিটেফোঁটা নেই এখানে। নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার এই গ্রামটা দরিদ্র ওঁরাওদের। এই গ্রামেরই ছেলে রবিন এক্কা। পড়ে স্থানীয় একটি ডিগ্রি কলেজে। কলেজে বেতন দিতে হয় না, বিনামূল্যে বইও পেয়েছে কলেজ লাইব্রেরি থেকে। আমরা যখন কুসুম শহর গ্রামে রবিনদের বাড়িতে যাই সে তখন চারা ধানের আঁটি নিয়ে ক্ষেত থেকে বাড়ি ফিরেছে। দুপুরে খেয়ে আবারও ফিরবে ক্ষেতে। রবিনদের কৃষিপ্রধান গ্রামের ওঁরাও পরিবারগুলো বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আশ্রয়ের ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে ধান চাষে বিনিয়োগ করে। সেই ধান বেচেই চলে তাদের সংসার। তবে সবারই যে নিজের জমি আছে তা নয়, অন্যের জমিতে বর্গাচাষি হিসেবেও কাজ করে ওঁরাওরা। লেখাপড়া করে কী হতে চায় এর জবাবে কিছুই বলতে পারেনি রবিন এক্কা। একটু ভেবে উত্তর দিতে বলেছিলাম। তবুও সে বলতে পারেনি তার জীবনে লক্ষ্য। সে শুধু জানে তাকে এভাবেই ধানের আঁটি নিয়ে ক্ষেতে যেতে হবে। ওকে দেখে মনে হলো, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া রবিনদের স্বপ্ন থাকলেও তা উবে যায় বাস্তবতার খরতাপে। কিন্তু আমাদের সামান্য একটু উদ্যোগ বাঁচিয়ে রাখতে পারে রবিন এক্কাদের স্বপ্নগুলোকে।

ছবির গল্প

এই তিন ওঁরাও নারীর বাড়ি নওগাঁয়। মাঝের জন ভিন গ্রামের, দুই পাশের দুজনের বাড়ি পাশাপাশি। কিন্তু নওগাঁ, রাজশাহী কিংবা ঠাকুরগাঁও- যে জেলাই হোক না কেন ওঁরাওদের আর্থ-সামাজিক চিত্র অভিন্ন। তারা দরিদ্র। স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ অপ্রতুল। আমরা ঢাকা থেকে গিয়েছি, কিন্তু এই তিন নারীর কেউই ঢাকা শহর দেখেননি। রাজশাহী শহরে গিয়েছেন জীবনে বড়জোর এক কিংবা দুবার। আর মাঝের জন্য তো বলেই ফেললেন, ভোটার কার্ডের জন্য ছবি তোলা ছাড়া এর আগে কোন ক্যামেরার সামনেই তিনি দাঁড়াননি।

ভিটেমাটির অধিকার পেলেই খুশি হাজংরা

উত্তর-পূর্ব ভারত ও বাংলাদেশের একটি জাতি হাজং। গারো পাহাড়ের পাদদেশসহ ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর সিলেট অঞ্চলে তাদের আদিবাস। তবে প্রধান বসবাস শ্রীবর্দি, ঝিনাইগাতি, হালুয়াঘাট, ধোবাউড়া, নালিতাবাড়ি, সুসং দুর্গাপুর, কলমাকান্দা ও বিরিশিরি এলাকায়। এ দেশে তাদের সংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার। তারা উত্তর বার্মা থেকে ভারতের কামরূপ জেলার 'হাজেয' নামক স্থানে বসতি স্থাপন করে। এ জন্যই তাদের নাম হাজং হয়েছে। হাজং গারো ভাষার একটি শব্দ যার অর্থ 'পোকা'। গারো পাহাড়ের ঠিক নিচেই সৌন্দর্যমণ্ডিত এক জনপদ সুসং পরগনা। এখানে বয়ে গেছে পাহাড়ি স্রোতস্বিনী সোমেশ্বরী। যদিও এখন তার স্রোতধারা অনেক ক্ষীণ। সোমেস্বরীর পূর্ব-উত্তর পাশ ঘিরেই গারো পাহাড় এবং তার পাদদেশের সমতল ভূমি হচ্ছে ফসলের অপরূপ ভাণ্ডার। হাজং জনগোষ্ঠীই এ অঞ্চলে প্রথম বসতি গড়ে তুলে চাষবাস শুরু করে। তারা বেশ পরিশ্রমী এবং কৃষিকাজে বেশ দক্ষ। এ জন্য পাহাড়ি গারোরা এই পাহাড়তলির জনগোষ্ঠীর নাম দিয়েছিল হাজং অর্থাৎ চাষের পোকা। গারো ভাষায় হা অর্থ মাটি আর জং অর্থ পোকা। এই জনগোষ্ঠী কৃষিতে দক্ষ বলেই গারোরা তাদের নাম দেয় হাজং।

তবে সুসং পরগনার নিসর্গ প্রকৃতির হাজংদের মতে, হাজং শব্দের অর্থ প্রস্তুত হওয়া, সঞ্চিত হওয়া বা সংগঠিত হওয়া। অর্থাৎ সাজ করা। সংগঠিত হওয়ার জন্য সাজা। ভাষাগত কারণে সাজং হয়ে গেছে হাজং। অতীতে রাজা জমিদারদের দমন-অত্যাচারে তারা বারবার ছত্রভঙ্গ হয়েছে আবার সংগঠিত হয়েছে বলেই এই উপজাতিদের নাম হাজং। নেত্রকোনা জেলার গারো পাহাড় সংলগ্ন বেশ কটি উপজেলায় হাজংরা বিভিন্ন গ্রামে বাস করছে। এদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। তবে তারা মূলত বাংলা ভাষী। তারা নিজেদের মধ্যে নিজ ভাষায় কথা বলে। তবে তাদের লিখিত কোনো ভাষা বা বর্ণমালা নেই। বংশ পরম্পরায় শ্রুত হয়ে এই ভাষা অবিকৃত ও মৌলিক রয়েছে। হাজং ভাষার সাথে বাংলা ভাষার অনেক মিল। হতে পারে বাংলা ভাষীদের সাথে বসবাসের ফলে আদিকাল থেকেই এটি ঘটছে। যেমন আমি তোমাকে ভালোবাসি– এই বাক্যটি তারা উচ্চারণ করে– ময় তগে ভালবাচে। কোথাও ধান কাটে– তারা বলে কুমায় ধানে কাতু বা কোথায় বাঁশি বাজে কে তাদের ভাষায় বলা হয় কুমায় বাঁছি বাজে। অর্থাৎ এই শব্দ উচ্চারণগত কারণে তা হাজংদের ভাষায় পরিণত হয়েছে। এটি বাংলা ভাষার আঞ্চলিকতায় লক্ষ্য করা যায়। যেমন, আমাদের বাড়ি আসবেন– এই কথাটি ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষায় হয়ে যায়– 'আঙ্গ বাইত আহুন যে'।

পোশাকে-আশাকে হাজংরা আলাদা। এখন তারা বাঙালিদের পোশাকে অভ্যস্ত হলেও নারীরা 'পাথিন' পড়ে। পাথিন বিভিন্ন রঙের সংমিশ্রণে তাঁতে বোনা ডোরাকাটা মোটা কাপড়। তাদের বাড়িতে সৃষ্টিকর্তাকে প্রণাম জানানোর জন্য ছোট 'দেওঘর' রয়েছে। প্রধান খাদ্য ভাত। বিন্নি চালের ভাত এবং শুটকি মাছ তাদের প্রিয়। হাজং সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছেলেরা। স্ত্রীর অনুমতিক্রমে হাজংরা দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারে। একই গোত্রে হাজংদের বিয়ে নিষিদ্ধ। তারা মনে করে একই গোত্র হচ্ছে ভাই বোন। তারা ১৭টি গোত্রে বিভক্ত। হাজংরা হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী।

হাজংরা সংঘবদ্ধভাবে বাস করে– বলা হয় পাড়া। পাড়া প্রধান হচ্ছে 'গাঁওবুড়া'। আর কয়েকটি পাড়া মিলে হয় গ্রাম। গ্রাম প্রধানকে বলা হয়

মোড়ল। তাদের সমাজে গাঁওবুড়া এবং মোড়লের প্রভাব অনেক। যিনি জ্ঞানেগুণে বিচক্ষণ তাঁকে মোড়ল বানানো হয়। আবার কয়েকটি গ্রাম মিলে হয় একটি 'চাকলা' বা 'জোয়ার'। আর এই চাকলা বা জোয়ারের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে পরগণা। চাকলা প্রধানকে বলা হয় চাকলাদার বা জোয়ারদার। আর পরগণা প্রধান সবসময়েই দেখা গেছে কোনো জমিদার বা নৃপতি এই দায়িত্ব নিয়ে পরগণা চালিয়েছেন। স্বাধীনতার পর পরগণা উঠে গেলেও পাড়া, গ্রাম ও চাকলা ব্যবস্থা টিকে আছে হাজংদের মধ্যে। যে কোনো বিবাদ মেটাতে তারা গাঁওবুড়া, মোড়ল বা চাকলাদারদের দ্বারস্থ হয়। তবে বড় ধরনের ঘটনায় দেশের আইন অনুযায়ী তারাও এখন কোর্ট কাছারির আশ্রয় নেয়।

তাদের বড় ও আনন্দদায়ক উৎসব হচ্ছে 'প্যাক খেলা'। সাধারণত ধানের চারা লাগানোর সময় এই খেলা হয়। মোড়লের জমিতে সর্বশেষ ধানের চারা লাগানোর সময় জমিতে পুরুষরা হাল বায়, নারীরা চারা লাগায়। এ সময় গোল হয়ে অন্যেরা নাচ-গানে মেতে ওঠে। মহিলারা গান গাইতে গাইতে একে অপরকে প্যাক অর্থাৎ কাদা মাখিয়ে দেয়– এই গানকে হাজংরা বলে 'সুপনি গান'। সকালে শুরু হয় বিকেলে শেষ। খেলা শেষে দুটো হাঁড়িতে জমির প্যাক তুলে মোড়ল ও তার স্ত্রীকে বাড়ির উঠোনে বসিয়ে সারা শরীরে মাখিয়ে দেয়া হয়। গোসল শেষে সন্ধ্যায় মোড়ল নিমন্ত্রিতদের কাছিম/মাছ ও ডাল দিয়ে ভাত খাওয়ায়। এরপর নিজেদের তৈরি মদ খেয়ে উৎসব আনন্দ করে, নাচ-গান করে। এতে খোল, ধাপা করতাল ও জরি (মন্দিরা) ব্যবহার করে তারা।

বর্তমানে হাজংদের নিজেদের জমি কমে আসায় এবং অনুষ্ঠান ব্যয়বহুল হওয়ায় প্যাক খেলা প্রায় বিলুপ্তির পথে। গারো পাহাড়বেষ্টিত হাজংদের এই জনপদ ১০০ বছর আগেও শুধু হাজংদের ছিল। পাকিস্তান আমলের শুরু থেকে বৃহত্তর ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল অঞ্চলের ঘনবসতি এলাকা থেকে লোকজন এসব অঞ্চলে এসে কম দামে জমি ক্রয় করতে থাকে। ৫০/৬০ বছর আগেও বিশেষ করে টাঙ্গাইলের এক বিঘা জমি বিক্রি করে এসব স্থানে দশ/পনের বিঘা ক্রয়ের সুযোগ ছিল। এভাবেই হাজং ও স্থানীয়দের জমি বেহাত হতে থাকে। গড়ে ওঠে বাঙালি লোকালয়। এখন জনসংখ্যার দিক থেকে হাজংরা এ এলাকায় অনেক কম। অথচ অতীতে পাহাড়ের পাদদেশে গভীর জঙ্গল কেটে তারাই এ স্থানকে বাস উপযোগী করেছিল। তাদেরকে অনেক অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে। হাজং সমাজ স্বোদ্বাবারী জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রথম হাতিখেদা আন্দোলন করে। টঙ্ক আন্দোলনও এর মধ্যে অন্যতম। গারো পাহাড়ের জংলী হাতি এসে তাদের ফসল নষ্ট করে দিত। হাজংরা সেই দুর্দান্ত হাতির ঝাঁক তাড়িয়ে ফসল রক্ষা করতো। এ ক্ষেত্রে তারা মশালসহ দেশীয় অস্ত্র ব্যবহার করতো। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে হাজংদের রয়েছে গৌরবময় ভূমিকা। তারা শুধু মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়ই দেয়নি সশস্ত্র সংগ্রামে অস্ত্র হাতেও যুদ্ধ করেছে।

হাজংরা এক সময় কৃষি অর্থনীতিতে যথেষ্ট উন্নত ছিল। কিন্তু এখন অধিকাংশ হাজংদেরই নিজস্ব জমি না থাকায় দিন মজুরিই তাদের একমাত্র আয়ের উৎস। অনেকে নদী থেকে ছোট পাথর ও কয়লা সংগ্রহ করে। কেউ কেউ গারো পাহাড় থেকে কাঠ কেটে তা বিক্রি করে। বর্তমানে বিরিশিরি ও দুর্গাপুরে সোমেশ্বরী নদী হয়ে পড়েছে বালু উত্তোলনের প্রধান কেন্দ্র। এখানেও বালু ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠানে হাজংরা কাজ করছে বালু উত্তোলনে।

দেশের সরকারের অনেক উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে হাজং নারী-পুরুষ সংশ্লিষ্ট খাদ্যের বিনিময়ে গ্রামীণ রাস্তার উন্নয়নে তারা অংশ নিচ্ছে। পাশাপাশি দেশের শীর্ষ পর্যায়ের এনজিও যেমন ব্র্যাক, আশা, বুরো বাংলাদেশ, ওয়ার্ল্ড ভিশন, কারিতাস, ডিএসকেসহ স্থানীয় পর্যায়ের এনজিওরা তাদের স্বাস্থ্য শিক্ষার উন্নয়নসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। যা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

আমরা মনে করি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হাজংরাও এ দেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি অধ্যুষিত জনস্রোতের সাথে দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর টিকে থাকা এবং উন্নত জীবনযাত্রার ধারায় তাদের অবস্থান যত সুদৃঢ় ভিত্তি পাবে বাংলাদেশের সমৃদ্ধি ততোই বেগবান হবে। আমরা চাই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা ও সংস্কৃতির ধারা অক্ষুণ্ন থাক, তারাও দেশের মূল ধারার সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করুক।

ভিটেমাটির অধিকার পেলেই খুশি হাজংরা

১৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ প্রত্যয় টিম নৃতাত্ত্বিক হাজংদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এনজিও খাতের ভূমিকা এবং অবদান সম্পর্কে জানার জন্য সরেজমিন দুর্গাপুরের গোপালপুর গ্রামে উপস্থিত হই। বুরো বাংলাদেশের স্থানীয় শাখার কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ গোপালপুর নিয়ে যান। গাড়ি সড়কে রেখে প্রায় এক কিলোমিটার হেঁটে আমরা গোপালপুর গ্রামে আসি। হলুদ মাটির টিলা সংলগ্ন গ্রাম। একটি নতুন কৃষ্ণ মন্দির। হরি মন্দিরের পাশে গাছের ছায়ায় গ্রামের ২৫/৩০ জন হাজং নারী আমাদের সাথে দলগত ও এককভাবে কথা বলেন। তারা জানান, এই গ্রামের হাজং আদিবাসীরা ছিলেন খুবই হতদরিদ্র এবং অশিক্ষিত। বর্তমানে এনজিওদের সহায়তায় তাদের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে, আধুনিক চিকিৎসা ও জীবনধারায় উন্নয়নের ছোঁয়া এসেছে।

জানা যায়, এই গ্রামটিতে ব্র্যাক, উদ্দীপন, ডিএসকে, পপি প্রভৃতি এনজিও কাজ করছে। বুরো বাংলাদেশও এ গ্রামটিতে কাজের উদ্যোগ নিচ্ছে। উপস্থিত নারীদের মধ্যে একজন স্বরস্বতী হাজংকে পাওয়া গেল যিনি এসএসসি পাস করেছেন। অন্যদের মধ্যে ৪/৫ জন প্রাইমারি স্কুলে গিয়েছিলেন। বাকিরা কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মুখ দেখেননি।

এদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় স্মৃতি হাজং বললেন, ছোটবেলায় খুব কষ্ট দেখেছি। ভীষণ অভাব ছিল। অধিকাংশ হাজংদের চাষাবাদের কোনো জমিজমা নেই। গা গতর খেটে দিন মজুরি করতে হতো। অন্যের জমিতে ধান বোনা, কাটা আর

দুর্গাপুর উপজেলার গোপালপুর হাজং গ্রাম গড়ে উঠেছে সরকারের খাস জমিতে। উঁচু টিলার কোল ঘেঁষে থাকা এই গ্রামের সবগুলো হাজং পরিবার অতি দরিদ্র। ছবিতে এক হাজং নারী ও তার কন্যা বাড়ির উঠানে ধান শুকিয়ে ঘরে তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

দুর্গাপুরের একটি হাজং পরিবার

লাকড়ি কেটে বিক্রি করে যে টাকা পেতেন তাই দিয়ে চলতেন। অনেক সময়েই টাকার অভাবে উপোষ করতে হতো। তখন বন থেকে এক ধরনের আলু তুলে সিদ্ধ করে খেতে হতো।

এসএসসি পাস স্বরস্বতী হাজং বললেন, এখন সন্তানরা লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী হয়েছে। একসময় ব্যাপকহারে বাল্য বিবাহ ছিল। কিন্তু সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের পাশাপাশি এনজিওদের সচেতনতা সৃষ্টির ফলে এখন আর বাল্য বিবাহ ঘটে না।

উপস্থিত সবার হাতেই মোবাইল ফোন দেখে প্রশ্ন করতেই বললো, এটা যেমন উপকার হয়েছে, তেমনই কিছু খারাপও হচ্ছে। আগে ছেলেমেয়েরা অভিভাবকদের খুব মানতো। এখন মানতে চায় না। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দ্রুত প্রেম-ভালোবাসা হয়ে যায় ওদের মধ্যে। সমস্যায় পড়তে হয় পিতা-মাতাকে।

গোপালপুরের হাজংদের প্রায় ৯৫ শতাংশেরই নিজস্ব রেকর্ডভুক্ত ভিটা কিংবা জমি নেই। খাস জমিতেই বাড়ি করে থাকে। তবে তাদের উচ্ছেদ আতঙ্ক নেই। তাদের প্রত্যেকেই দিন মজুর। পুরুষরা এক দিন কাজ করে পান ৬০০ টাকা, মেয়েরা পান ৪০০ টাকা। উপস্থিত নারীরা এই বৈষম্যের বিলুপ্তি চান। তারা বলেন, হাজং নারীরা কর্মে পুরুষের চেয়ে কম নয়, কিন্তু মজুরির দিক থেকে তাদের ঠকানো হয়।

তারা জানান, করোনার সময় সরকার তাদের সহায়তা দিয়েছে। ঈদের সময় ১০ কেজি করে চাল দেয়া হয় কিন্তু স্থানীয় সরকারের দুর্নীতিবাজদের কারণে সবাই তা পান না বলে অভিযোগ করলেন। একজন দৃঢ়তার সাথে বললেন, আমরা মূর্খ্য, কিন্তু ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করছে, আমাদের ঠকার দিন শেষ হয়ে আসছে। আরেকজন বললো, যারা দুর্নীতি করে তারা সবসময়েই সুযোগ নেবে। বোঝা গেলো তাঁরাও দুর্নীতি বিষয়ে অবগত। এই গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে কোনো শিক্ষক, পুলিশ, বিডিআর সদস্য নেই। একজন নার্স রয়েছে। গোপালপুরে একটি প্রাইমারি স্কুল রয়েছে। সেখানে তাদের ছেলেমেয়েরা পড়ার সুযোগ পাচ্ছে।

ভাবনা হাজং বললেন, দেশের উন্নতির কথা টিভিতে যতোটা দেখি, আমরা এখানে থেকে তা বুঝতে পারি না। কেউ আমাদের সমস্যা সমাধানে আগ্রহী হয় না। তিনি বললেন, এনজিওরা আমাদের ক্ষুদ্রঋণসহ সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করছে। নিজেদের অধিকার, নারীর অধিকার সম্পর্কে বুঝতে পারি।

সুলেখা হাজং প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত পড়লেও বেশ সচেতন। তিনি বলেন, সরকারের উচিত আমাদের নিজস্ব রেকর্ডভুক্ত জমির ব্যবস্থা করা।

উজলা হাজং, অজিত হাজং, যুগস্তি হাজং এর সাথেও কথা হলো। এ দেশকে তারা খুব ভালোবাসে বলে জানালো। তবে তারা ভালো পরিবেশে বাঁচতে চায়। অজিত হাজং এসএসসি পরীক্ষা দেবে। সোয়াশ্রী হাজং এইচএসসিতে পড়ছে বলে জানালো।

দুর্গাপূজা, কালিপূজা, কৃষ্ণ পূজা ও লক্ষ্মী পূজা করে এ গ্রামের হাজংরা। মন্দিরের সেবায়েত প্রাচীন হাজং বললেন, তাকে এ জন্য সরকার থেকে প্রতি মাসে ১২০০ টাকা করে দেয়া হয়।

প্রাচীন হাজং বললেন, সরকার ৩ লাখ টাকা দিয়েছে, তা দিয়ে ৩ রুমের টিনশেড মন্দির ঘর করা হয়েছে।

হাজংদের সাথে কথা বলে মনে হলো, অর্থবিত্ত না থাকলেও তারা ভালো আছেন। তারা প্রতারণা, জালিয়াতি বোঝেন না। মানুষকে ঠকানো বোঝেন না। মনে হলো, এই দরিদ্র হাজং জনগোষ্ঠীর প্রতিটি মানুষই দেশপ্রেমে উজ্জীবিত, প্রত্যেকেই সৎ ও কর্মঠ। তাদের খুব বেশি চাহিদা নেই। দুবেলা দু'মুঠো আহারের সংস্থান হলেই তারা খুশি। মাথা গোঁজার জন্য নিজস্ব জমিতে একটা ঘর হোক মাটির– এতেই তারা খুশি। তাদের কথায় আরো জানা গেল, এনজিওরা তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উন্নয়নে সহায়তা করছে– এতে তারা কৃতজ্ঞ।

গোপালপুরের হাজংরা এদেশেরই ১৬ কোটি মানুষেরই অংশ। তারা ভালো থাকুক এই প্রত্যাশা প্রত্যয়েরও।■

হাজংরা পিতৃতান্ত্রিক। তবুও কঠোর পরিশ্রমী হাজং নারীরা। তারা ঘর ও ফসলের ক্ষেত সামলান সমান দক্ষতায়। দুর্গাপুর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের হাজং অধিবাসীদের সাথে আমরা।

আপন এক্কা

আপন এক্কা নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার কুসুম শহর গ্রামের ওঁরাও কিশোর। সে রবিন এক্কার ভাই। আপন স্থানীয় শেরপুর দাউল উচ্চ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। স্কুলে যায় একটি পুরনো বাইসাইকেল নিয়ে। আপনের এখন খেলার বয়স, স্কুলে যাওয়ার বয়স। কিন্তু দারিদ্র্য ঠিক কতদিন সচল রাখবে আপনের এই সাইকেলের চাকা তা সে নিজেও জানে না। এক দিন হয়তো ধানের আঁটি নিয়ে ওকেও যেতে হবে ক্ষেতে, স্কুলের দূরত্ব বেড়ে যাবে ধান ক্ষেতের দূরত্বের চেয়ে। সবচেয়ে কাছের ঠিকানাই হবে আপন এক্কার গন্তব্য। কিন্তু আপনদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করার দায়িত্ব যেমন সরকারের, তেমনি সমাজের উন্নয়নে নিয়োজিত বেসরকারি সংস্থাগুলোরও। সুযোগ পেলে প্রত্যন্ত কুসুম শহর গ্রামটিও আলোকিত হয়ে উঠতে পারে আপনদের হাত ধরে।

সারথী

নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার পত্নীতলা ইউনিয়নের ডোহানগর সাঁওতাল গ্রামের প্রবেশ মুখেই একটি ভ্যান গাড়িতে বসে ছিলেন এই বৃদ্ধ সাঁওতাল নারী। তার অবয়ব ও বসার ভঙ্গি আমার ক্যামেরাকে সচল হতে বাধ্য করেছিলো। নাম জানতে চাইলে স্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, 'সারথী'। এরপর বয়স জানতে চাইলাম। বললেন, একশ বছর। তার জবাবে কোনো দ্বিধা ছিলো না, তাই তার কথাই বিশ্বাস করেছি। অথচ শতবর্ষী এই নারীর মুখে বার্ধক্যের যন্ত্রণার তেমন কোনো ছাপ নেই। আর ঐ ভ্যান গাড়িতে তিনি নিজেই যে উঠে বসেছেন তা বেশ ভালোভাবেই বোঝা যাচ্ছিলো। বিভিন্ন মিডিয়ায় শতবর্ষী মানুষ দেখে ঘরে বসেই আমরা বিস্মিত হই কিন্তু আমাদের আশপাশের শতবর্ষী সারথীদের খুঁজে পাই না।
সাঁওতাল নারীরা বেশ কর্মঠ হন, কাজও করেন ফসলের ক্ষেতে। ডোহানগরের সারথী যেন পুরো নারী জাতির প্রতিচ্ছবি।

বিদ্যুত খোশনবীশ

নিজেকে এখনও ভোলেননি
কিংবদন্তি কুমুদিনী হাজং

কণ্ঠের সবটুকু শক্তি প্রয়োগ করে যখন জানতে চাইলাম কেমন আছেন, অনেকটা কষ্ট করেই তিনি উচ্চারণ করলেন, 'ভালো নাই।' কেন এসেছি তার বাড়িতে তাও হয়তো পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারছিলেন না তিনি। বয়স নব্বই পার হয়েছে। শ্রবণশক্তি কমে গেছে, বাকশক্তি অস্তমিত প্রায়, সাথে স্মৃতিশক্তিও। তবে আমরা যে তার কাছেই এসেছি সেটুকু বুঝতে বোধকরি তার কষ্ট হয়নি। কারণ আমরাই তো আর প্রথম নই, এর আগে আমাদের মতো আরো অনেকেই এসেছেন তাকে দেখতে, তার কণ্ঠে ইতিহাস শুনতে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই কিংবদন্তির কণ্ঠে ইতিহাস শোনার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি।

বলছি টঙ্ক আন্দোলনের জীবন্ত কিংবদন্তি কুমুদিনী হাজং এর কথা। কুমুদিনী হাজং এর বাড়ি নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর উপজেলার বিজয়পুরে। গ্রামের নাম বহেরাতলী। উঁচু টিলার ওপর তার ঘর পর্যন্ত পৌঁছতে পারি দিতে হয় সোমেশ্বরী নদী। কোনো সেতু নেই, একমাত্র উপায় খেয়া নৌকায়। তবে সে নৌকা পর্যন্ত যেতে হাঁটতে হবে সোমেশ্বরীর লাল বালুর চর ধরে। পায়ে হেঁটে অর্ধেকটা নদী পার হলে তবেই মিলবে এই নৌকা। এরপর মোটরসাইকেল কিংবা অটো রিকশা। খেয়া ঘাট থেকে কুমুদিনী হাজং এর টিলাবাড়ি ১৫ মিনিটের পথ। পথেই চোখে পড়বে হাজং মাতা রাশিমনি হাজং এর স্মরণে নির্মিত স্মৃতিফলক, আর তার বাড়ি থেকে আরেকটু এগুলেই মেঘালয় সীমান্ত।

কুমুদিনী হাজং এর টিলাবাড়ির আকাশটা বিকেলে ছিলো গাঢ় নীল আর সন্ধ্যায় আগুনরঙা। আগুনরঙা আকাশটা দেখে মনে হচ্ছিল, ১৯৪৬ সালের ৩১ জানুয়ারির সেই অগ্নিঝরা দিনটির কথা যার সাক্ষী হয়েছিলো এই বহেরাতলীর হাজং জনগোষ্ঠী। তবে সেই প্রজন্মের কেউই এখন আর নেই, কিংবদন্তি হয়ে বেঁচে আছেন শুধু কুমুদিনী হাজং।

টঙ্ক আন্দোলন ব্রিটিশ-বাংলার কৃষকদের অধিকার আদায়ের অন্যতম আন্দোলন। টঙ্ক প্রথা বলতে বোঝায় ধান-কড়ারী খাজনা অর্থাৎ জমিদারের জন্য টাকার পরিবর্তে ধানের খাজনা। ব্রিটিশ শাসনের শেষ দশকে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের নেত্রকোনা ও শেরপুরের জমিদাররা কৃষকদের কাছ থেকে টাকার পরিবর্তে খাজনা আদায় করতেন আবাদি জমির ফসলের হিসাবে। এ অঞ্চলের দরিদ্র কৃষকদের প্রধান ফসল ছিলো ধান। প্রতি একর জমির জন্য একজন কৃষককে দিতে হতো ৩ মণ ৩৩ সের ধান। জমিতে ফসল যাই হোক না কেন নির্দিষ্ট এই পরিমাণ ধান খাজনা হিসেবে দিতে কৃষকরা বাধ্য থাকতেন। এমনকি, এক বছর খাজনা দিতে ব্যর্থ হলে বকেয়া হিসেবে পরের বছর সেই খাজনা পরিশোধ করতে হতো। টঙ্ক প্রথার সবচেয়ে বড় বৈষম্য ছিলো, একই জমিদারের অন্য অনেক প্রজারাই টাকা হিসাবে খাজনা পরিশোধ করতে পারতো। এই নিয়মে একজন প্রজার খাজনা যেখানে ছিলো ৬ টাকা, ধানের হিসেবে তা পৌঁছতো ৪০ থেকে ৭০ টাকায়। মূলত জমিদারদের খাজনা প্রথার এই বৈষম্যের বিরুদ্ধেই 'জান দিব তবু ধান দিব না' স্লোগানে সূত্রপাত হয় টঙ্ক আন্দোলনের।

টঙ্ক আন্দোলনের সূত্রপাত ১৯৩৭ সালে। এ সময় আরেক কিংবদন্তি কমরেড মণি সিংহ এই আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হলে তা আরো জোরালো হয় এবং এক পর্যায়ে তা জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের আন্দোলনে পরিণত হয়। ১৯৪৬ সালে এই আন্দোলন তীব্র রূপ ধারণ করে। টঙ্ক আন্দোলন প্রতিহত করতে ব্রিটিশ সরকারের ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস ইউনিট নেত্রকোনার দুর্গাপুরের বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্প স্থাপন করে এই আন্দোলনের নেতা-কর্মী, বিশেষ করে হাজংদের

বহেরাতলীতে টঙ্ক আন্দোলনের স্মৃতিতে নির্মিত হাজং মাতা রাশিমনি স্মৃতিসৌধ।

জমিদাতা :
সাহাব উদ্দিন তোতা
স্থপতি :
কবি রবিউল হুসাইন
প্রকৌশলী :
ইঞ্জিনিয়ার
শেখ মো. শহীদুল্লাহ

কিংবদন্তি কুমুদিনী হাজং | ৩৩

চোখের জলই বলে দিচ্ছে নিজেকে ভোলেননি কুমুদিনী

গ্রেফতার ও তাদের বাড়ি-ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে শুরু করে। ব্রিটিশ পুলিশের এমন নির্যাতনের কারণে হাজং পুরুষরা দিনের বেলায় বাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিতো এবং আন্দোলনের বিভিন্ন পরিকল্পনা সভায় অংশগ্রহণ করতো। এমনই এক পরিস্থিতিতে ১৯৪৬ সালের ৩১ জানুয়ারি বহেরাতলী গ্রামের হাজং নেতা লংকেশ্বর হাজংকে ধরতে তার বাড়িতে যায় পুলিশ। কিন্তু লংকেশ্বরকে বাড়িতে না পেয়ে তার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী কুমুদিনী হাজংকে আটক করে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকে তারা। কুমুদিনীর বয়স তখন ১৭। তাকে আটক করে নির্যাতন করার খবর মুহূর্তেই পৌঁছে যায় টঙ্ক আন্দোলনের আরেক নেত্রী রাশিমনি হাজং (রাসমনি হাজং) এর কাছে। সে সময় রাশিমনি ও সুরেন্দ্র হাজংসহ ৩০-৪০ জনের একটি দল গোপনে সভা করছিলেন। রাশিমনি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিলেন কুমুদিনীকে উদ্ধার করতে হবে। কিন্তু অন্যরা পুলিশের রাইফেলের ভয়ে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু সতীর্থ নারীর সম্মান রক্ষায় রাশিমনি হাজং ১২ জনের একটি দল নিয়ে রওনা হয়ে গেলে সুরেন্দ্র হাজং এর নেতৃত্বে বাকিরাও তাদের পেছনে অগ্রসর হতে থাকেন। রাশিমনির দলের ১২ জন সদস্যের অধিকাংশই ছিলেন নারী।

রাশিমনি হাজং ব্রিটিশ পুলিশ দলের পথ রোধ করে কুমুদিনীকে ছেড়ে দিতে বলেন। কিন্তু পুলিশ সদস্যরা তাদের দিকে রাইফেল তাক করে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। রাশিমনি এতে দমে যাননি। তিনিও দা উঁচিয়ে হুমকি দেন পুলিশ সদস্যদের। পুলিশ তার কথা না শুনে কুমুদিনী হাজংকে নিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় হাতের দা দিয়ে আঘাত করে এক পুলিশ সদস্যকে হত্যা করেন রাশিমনি হাজং। এমন পরিস্থিতিতে আরেক পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলেই শহীদ হন রাশিমনি। রাশিমনিকে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়তে দেখে হাতের বল্লম ছুড়ে ঘাতক পুলিশ সদস্যকে হত্যা করেন সুরেন্দ্র হাজং। পুলিশও পাল্টা গুলি ছুড়লে রাশিমনির মতো সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন তিনি। পরপর দুই জন নেতার মৃত্যুর দৃশ্য দেখে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হাজংদের পুরো দলটিই ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্রিটিশ সরকারের নিপীড়ক পুলিশের ওপর। প্রায় আড়াই ঘণ্টা চলে এই সংঘর্ষ। শেষ পর্যন্ত কুমুদিনী হাজংকে রেখেই পালিয়ে যায় ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার্স রাইফেলস এর সদস্যরা। বহেরাতলীতে সেদিন রচিত হয় শোক ও গৌরবের এক যৌথ বিজয়গাথা। এক সহযোদ্ধা নারীকে রক্ষায় রাশিমনির সেদিনের সেই আত্মত্যাগ তাকে এনে দেয় হাজং মাতার স্বীকৃতি। হাজং জনগোষ্ঠীর মাঝে আজও তিনি অমর হয়ে আছেন হাজং মাতা রাশিমনি হয়ে। বহেরাতলীর এই স্থানে ২০০৪ সালে নির্মিত হয়েছে হাজং মাতা রাশিমনি স্মৃতিফলক। আর যাকে ঘিরে বহেরাতলীতে সেদিন আগুন ঝরেছিলো, সেই কুমুদিনী হাজং আজও বেঁচে রয়েছেন একজন কিংবদন্তি হয়ে।

আমাদের জন্য লাল চা বানিয়ে দিয়েছিলেন কুমুদিনী হাজং এর ছেলে বউ। সেই চা খাওয়ার জন্য ইশারায় বারবার তাগিদ দিচ্ছিলেন তিনি। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে জানতে চাইলাম সেই দিনটির কথা, তিনি হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন মনে নেই কিছু। পথেই টঙ্ক আন্দোলনের স্মৃতিফলকের ছবি তুলেছিলাম, সেটা দেখালাম তাকে। আঁচল দিয়ে দু'চোখ ঢাকলেন কুমুদিনী। বুঝিয়ে দিলেন, স্মৃতির ঘোলাটে আয়নায় এখনও কিছুটা প্রতিবিম্বিত হয় সেই আগুনঝরা দিনের দৃশ্যগুলো। তাকে স্বাভাবিক করতে এবার দেখালাম আমার ক্যামেরায় তোলা তার নিজের ছবি। এবার তিনি শব্দ করেই হাসলেন, হাসিমাখা মুখে বেশ অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন নিজের প্রতিচ্ছবির দিকে।

কুমুদিনী হাজং আমাদের বিদায় দিলেন হাসিমুখেই। কষ্ট হলেও বললেন, আবার আসবেন। তার এই আমন্ত্রণ পেয়ে আমি ভাবছিলাম, আবার যদি আসিও, তখন হয়তো এই টিলাবাড়িটা থাকবে কিন্তু থাকবেন কি কুমুদিনী হাজং! ঘণ্টাখানেক ছিলাম তার টিলাবাড়িতে। বড় বড় গাছগুলো শেকড় দিয়ে তৈরি করে রেখেছে প্রাকৃতিক সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনে হচ্ছিলো, নিজেকে এখনও ভোলেননি কুমুদিনী।■

● তথ্যসূত্র: টঙ্ক আন্দোলন, সংকলন: শেখ রফিক ও বাংলাপিডিয়া

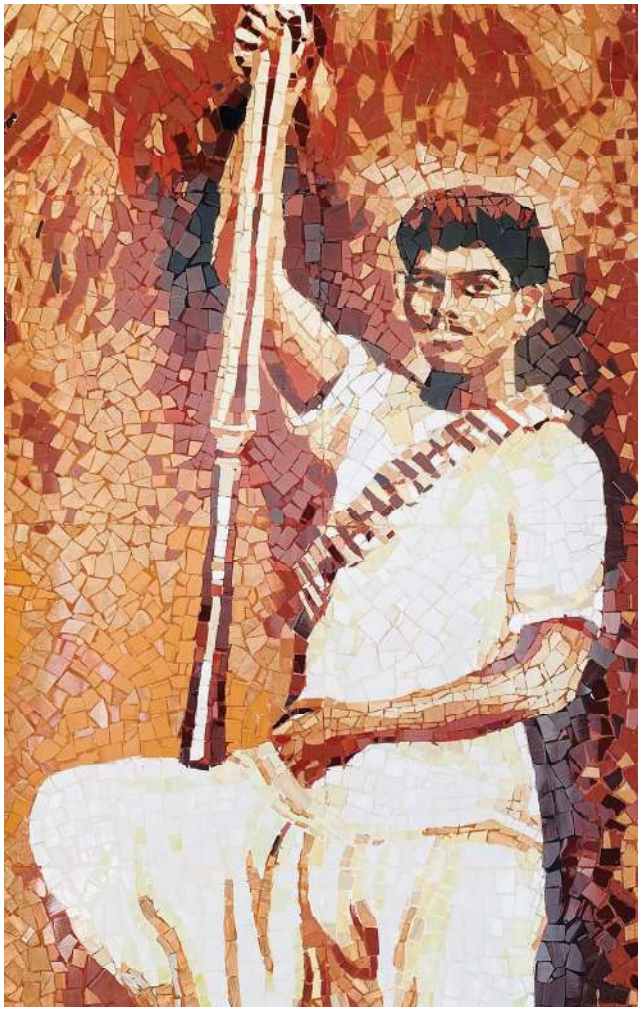

দুর্গাপুরে কমরেড মনি সিংহ-এর স্মৃতি জাদুঘরে
তার তরুণ বয়সের একটি কোলাজ চিত্র।

ঝানুরাম ত্রিপুরা

চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার পার্বত্য অংশের প্রত্যন্ত গ্রাম কয়লা। পাহাড়ঘেরা এ গ্রামের বড়পাড়া অংশে থাকেন ষাটোর্ধ্ব ঝানুরাম ত্রিপুরা। বিয়ে করেননি, কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে বিপুল পৈতৃক সম্পত্তির মালিক। এখানকার ত্রিপুরারা সাধারণত পাহাড় ঘেরা সমতলে ধান চাষ করেন, কারণ শুষ্ক পাহাড়ের ঢালে অন্য কোন ফসল চাষের সুযোগ তেমন নেই। মিরসরাইয়ের বেসরকারি সংস্থা অপকা পাহাড়ের অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য আনার জন্য কাজ করছে দীর্ঘদিন ধরে। কয়েক বছর আগে পাহাড়ের ঢালে তারা পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করেছিলো গোলমরিচের চাষ। অপকার এই উদ্যোগ শুরু হয়েছিলো এই ঝানুরামের জমিতেই। সে উদ্যোগ সফল হওয়ায় ঝানুরামের পাহাড়ে এখনও চলছে গোলমরিচের ফলন। উচ্চ বাজার মূল্যের মসলা এই গোলমরিচের বাগান নিয়মিত পরিচর্যা করেন তিনি। রোদে পুড়ে ক্লান্ত বোধ করলে বসে বিশ্রামও নেন কিছুক্ষণ। সেদিন বিশ্রাম নিতে নিতেই দীর্ঘক্ষণ গল্প করেছিলেন আমাদের সাথে। অপকার মতো উন্নয়ন সংস্থার ছোঁয়ায় দিনে দিনে বদলে যাচ্ছে পাহাড়ের অর্থনীতি ও ঝানুরামদের জীবন-জীবিকা।

জাকির হোসেন

বলিউডের তানসেন
মোহাম্মদ রফি

মরণশীল পৃথিবীতে মানুষ বেঁচে না থাকলেও অনেকেরই কীর্তিগাঁথা চিরভাস্বর হয়ে থাকে। মৃত্যু পরবর্তী সময়েও যুগের পর যুগ স্মরণের আঙিনায় তাদের দেদীপ্যমান উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তেমনই একজন কালোত্তীর্ণ ব্যক্তিত্ব উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী (প্লে ব্যাক সিঙ্গার) ঈশ্বরের কণ্ঠ বলে খ্যাত কিংবদন্তি মোহাম্মদ রফি। ১৯৮০ সালের ৩১ জুলাই সঙ্গীত জগতের এই মহান সাধক মৃত্যুবরণ করেন।

মোহাম্মদ রফির জন্ম ১৯২৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর ভারতের অমৃতসরের কোটলা সুলতান সিং গ্রামে এক সাধারণ মুসলিম পরিবারে। তাঁর পিতা হাজী আলী এবং মায়ের নাম আল্লাহ রাখী। ছোবেলায় রফির ডাক নাম ছিল ফিকু। তিনি ছোটবেলা থেকেই ছিলেন প্রচণ্ড সঙ্গীত অনুরাগী। মোহাম্মদ রফিরা ছিলেন ৮ ভাই বোন। মোহাম্মদ শফি, মোহাম্মদ দীন, মোহাম্মদ ইকবাল, মোহাম্মদ ইসমাইল, চেরাগ বিবি ও রেশমা বিবি। শিশুবেলা থেকেই রফির ঝোঁক ছিল গানের প্রতি।

মোহাম্মদ রফির বয়স যখন ৭ বছর, সে সময়ের একটি ঘটনা। তখন তাদের গ্রামে এক পাগল বৃদ্ধ সুরেলা কণ্ঠে গান গেয়ে অর্থ সাহায্য নিতেন। রফি ঐ গানের এতোই ভক্ত ছিল যে সে ফকিরের পিছনে পিছনে যেতো এবং ফিরে এসে আশেপাশের লোকজনকে অবিকল সুরে ঐ গান শোনাতো। শ্রোতারা তাকে দারুণ উৎসাহ দিত।

১৯৩৫ সালে তাদের পরিবার অমৃতসর থেকে লাহোরে চলে আসে। এখানে তার ভাই মো. দীন একটি হেয়ার কাটিং সেলুন এর দোকান দেন। রফির বড় ভাই নিজেই এটি দেখাশোনা করতেন। রফিকে দোকানে যেতে বললে সে খুব উৎসাহিত হতো এবং দোকানে গিয়ে স্বাধীনভাবে গান গাইতে পারতো। এটি তাকে গায়ক হিসেবে পরিচিতি এনে দেয়। বড় ভাই মোহাম্মদ দীনও চাইতেন তার ভাই বড় শিল্পী হয়ে উঠুক। এ জন্য তিনি তার স্বপ্নপূরণে সচেষ্ট ছিলেন। তাকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিয়ে যেতেন। বড় ভাইয়ের বন্ধু আব্দুল হামিদ রফির গান শুনে খুবই মুগ্ধ হন এবং রফিকে গান গাওয়ার ব্যাপারে বেশ উৎসাহ প্রদান করেন। রফির বাবা-মা ও পরিবার রক্ষণশীল মুসলিম পরিবার বিধায় তারা রফিকে গান গাইতে বারণ করতেন।

ঐ সময় একবার তখনকার বিখ্যাত শিল্পী কুন্দল লাল সায়গল (কে এল সায়গল) এর লাহোরের আকাশবাণীতে ও পরে মঞ্চেও লাইভ প্রোগ্রামের কথা ঘোষিত হয়। রফি ছিলেন সায়গলের গানের খুব ভক্ত। তিনি তার ভাইয়ের কাছে এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য বায়না ধরেন। তখন তার বড় ভাই তাকে নিয়ে আসেন। সায়গলের গান গাওয়ার সময় হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চলে গেলে হৈ চৈ শুরু হয়। সায়গল জানান বিদ্যুৎ না এলে তিনি গান গাইবেন না। এ সময় বড় ভাই মোহাম্মদ দীনের অনুরোধে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা ঐ মুহূর্তে অসহিষ্ণু দর্শকদের শান্ত রাখতে মোহাম্মদ রফিকে গান গাওয়ার সুযোগ করে দেন। বিদ্যুৎ না আসা পর্যন্ত মোহাম্মদ রফি ভরাটকণ্ঠে বেশ কটি গান গেয়ে দর্শকদের তুমুল করতালি ও প্রশংসা লাভ করেন। এমনকি সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিল্পী কে এল সায়গল বিমোহিত হয়ে দোয়া করলেন, 'তুমি একদিন অনেক বড় গায়ক হবে।' সেই অনুষ্ঠানে সে সময়ের বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক শ্যাম সুন্দর উপস্থিত ছিলেন। তিনি মোহাম্মদ রফির গান শুনে মুগ্ধ হন। শ্যাম সুন্দর রফিকে তার কার্ড দিয়ে যোগাযোগ করতে বলেন।

এরপর রেডিওতে গান গাওয়ার সুযোগ পান তিনি। লাহোরে সঙ্গীত জীবনে তিনি লায়লা মজনু ছবিতে গান গাওয়ার অফার পান স্বর্ণলতা নাজিরের নিকট থেকে। কিন্তু মোহাম্মদ রফির মুসলিম পারিবারিক রক্ষণশীলতা তাকে দ্বিধার মধ্যে ফেলে দেয়। কারণ তার বাবা-মা গান গাওয়া পছন্দ করতেন না। সে সময় বড় ভাই ও তার বন্ধু আব্দুল হামিদ তাঁর পিতাকে বলেন, সুরতো আল্লাহর দান। এই প্রতিভাকে থামিয়ে দেয়া ঠিক হবে না। বরং তাকে এ ব্যাপারে আমাদের সার্বিক সহযোগিতা করা প্রয়োজন। সে সময় তার বড় ভাই মোহাম্মদ দীন নানাভাবে চেষ্টা করে বাবার সম্মতি আদায় করেন। এটি ছিল ১৯৪৫ সাল। পারিবারিক অনুমতি পাবার পর বড় ভাই মোহাম্মদ দীন মোহাম্মদ রফিকে দু'জন গানের শিক্ষক রেখে দেন। এদের একজন ওস্তাদ আব্দুল ওয়াহিদ খান এবং অন্যজন ওস্তাদ বরকাত আলী খান। লাহোরে থাকাকালীনই মোহাম্মদ রফি বশিরা বিবির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৪৪ সালে মোহাম্মদ রফি তার ভাই দীন ও ভাইয়ের বন্ধু আব্দুল হামিদের সাথে বোম্বে চলে আসেন। বোম্বের ভিন্ডি বাজারে ১০ ফুট বাই ১০ ফুট একটি কামড়া ভাড়া নেন রফি। এ সময় তিনি সঙ্গীত পরিচালক শ্যাম সুন্দরের সাথে যোগাযোগ করেন। শ্যামসুন্দর তাকে বেশ কিছু গানে কণ্ঠ দেয়ার সুযোগ দেন। এ বছরই শ্যাম সুন্দরের প্রথম ছবি 'গাও কি গোরি'তে প্রথম গাওয়ার সুযোগ পান রফি। তিনি রফিকে তার একটি পাঞ্জাবী ছবিতে গান গাওয়ার অফার দেন। প্লে ব্যাক সিঙ্গার হিসেবে রফি প্রথম গান করেন শ্যাম সুন্দরের নির্দেশনায় পাঞ্জাবী বালুজ ছবিতে। তিনি জিনাত বেগমের সাথে এই গান গেয়েছিলেন। গানটি ছিল 'শুনিয়ে-নি হিরিয়ে-নি' ১৯৪৪ সালে এই ছবি মুক্তি পায়। এ ঘটনা তার সংগীত মনে বেশ রেখাপাত করে। তিনি খুব উৎসাহিত বোধ করেন।

দেশ বিভক্তির সময় ১৯৪৭ সালে মোহাম্মদ রফি ভারতে থেকে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এটাই আমার জন্মস্থান। আমি মানুষ, ধর্ম দিয়ে নিজেকে বিচার করি না। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর পিতা মাতা দেশ বিভক্তি মুহূর্তে নিহত হলে তাঁর স্ত্রী লাহোরেই থেকে যান। এর ফলে তাঁর সাথে স্ত্রী বশিরা বিবির বিচ্ছেদ ঘটে। রফির পুরো পরিবার বোম্বে চলে আসেন। এ বছরই তাঁর প্রিয় সঙ্গীত শিল্পী কে এল সায়গলের মৃত্যু হয়। তাঁর পরিচালিত শাহজাহান ছবিতে মো. রফি একটি কোরাসে অংশ নিয়েছিলেন।

সঙ্গীত চর্চায় মগ্ন মোহাম্মদ রফি

কিংবদন্তি সুরকার-শিল্পী
শচীন দেব বর্মণের সাথে মোহাম্মদ রফি

সঙ্গীত পরিচালক নওশাদ ও মোহাম্মদ রফি

১৯৪৪ সালে বোম্বে আসার পরই মূলত তার প্রাতিষ্ঠানিক সঙ্গীত জীবনের সংগ্রাম শুরু হয়। এ সময় তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী বড় ভাইয়ের বন্ধু আব্দুল হামিদ তাঁকে বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক নওশাদ এর কাছে নিয়ে যান এবং লক্ষ্ণৌ গিয়ে নওশাদের বাবার নিকট থেকে আনা সুপারিশপত্র তার হাতে দেন। নওশাদ তাদের বলেন, যে জায়গা থেকে সুপারিশ এনেছো মানা করবো না। তবে হাতে তেমন কাজ নেই। ওকে একটা কোরাস গাইতে সুযোগ দিচ্ছি। শুরুতে মোহাম্মদ রফি নওশাদের কম্পোজিশনের একটি গানে কোরাস গাওয়ার সুযোগ পান। পারিশ্রমিক হিসেবে তাঁকে ১০ টাকা সম্মানী দেয়া হয়। ছবিটির নাম 'পাহলে আপ'। কোরাসে গান গাইলেও সঙ্গীত পরিচালক নওশাদ রফির কণ্ঠের কারিশমা উপলব্ধি করেন এবং পরবর্তীতে সোলো গানে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেন। এটি ছিল মোহাম্মদ রফির সঙ্গীত জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। তিনি দুলারী ছবিতে গান গাওয়ার সুযোগ লাভ করেন। তাঁর গাওয়া 'সুহানী রাত ঢাল চুকি না জানে তুম কব আওগে' এই

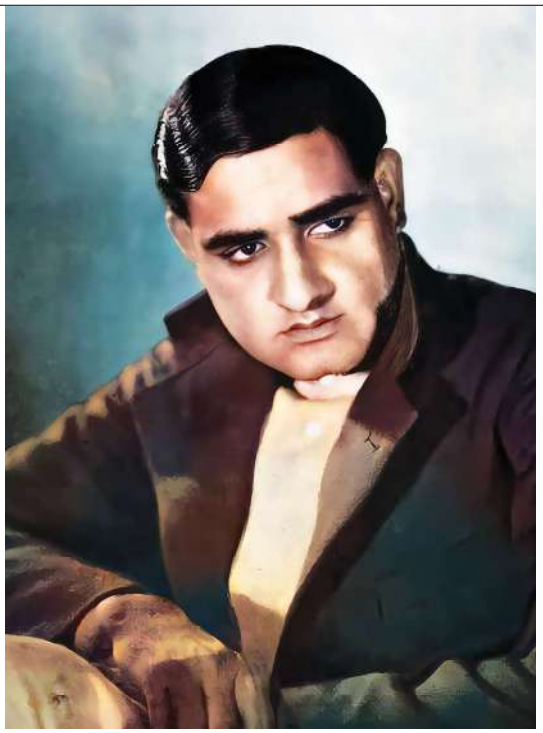

গানেই বাজিমাত করে দেন রফি। বোম্বের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিসহ কোটি কোটি শ্রোতার মনে মোহাম্মদ রফির কণ্ঠ স্থায়ী হয়ে যায়। মোহাম্মদ রফি সঙ্গীত পরিচালক নওশাদ সাহেবের সাথে প্লে ব্যাক সিঙ্গার হিসেবে অসংখ্য ছবির গানে কণ্ঠ দেন। বৌজী বওরাতে 'এ্যায় দুনিয়াকে রাখো আলে' তাকে সুরের দুনিয়ায় আরো বিখ্যাত করে দেয়। মোগলে আজম ছবির 'জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ এই মহব্বত এ জিন্দাবাদ' গানটি তাঁকে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে আসে।

সুর সম্রাট রফি বিভিন্ন পরিচালকের ছবিতে গান গাইলেও বিশেষ সফলতা আসে ১৯৪৭ সালে দিলীপ কুমারের 'জুগনু' ছবিতে গান গেয়ে। সে সময়কার নায়িকা-গায়িকা নুরজাহানের সাথে দ্বৈতভাবে গান গাওয়ার সুযোগ পান তিনি। তাঁর গান এতো বেশি পছন্দ করা হয় যে, তাঁর মজুরি নুরজাহানের মজুরির সমান ধার্য করা হয়।

১৯৪৮ সালে রফির একটি গান অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে– 'শুনো শুনো এ্যায় দুনিয়াওয়ালো বাপু কি এক অমর কাহিনী'। গানটির কম্পোজার হুসন্ লাল ও ভগত রাম। ১৯৪৮ সালে মহাত্মা গান্ধীকে হত্যার পর এটি রচিত হয়। প্রথমেই এই গানের দশ লক্ষ রেকর্ড বিক্রি হয়েছিল। ভারতের সে সময়ের প্রধানমন্ত্রী জওয়াহের লাল নেহেরুও এই গান শুনে খুব মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তিনি দিল্লিতে রফিকে ডেকে অশ্রুসিক্ত হয়ে এই গান শোনেন। ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবসে রফিকে 'রজত পদক' দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

পরবর্তীতে মোহাম্মদ রফি তাঁর সমসাময়িক অসংখ্য সঙ্গীত পরিচালকের সাথে কাজ করেন। এখানে একটি ঘটনার কথা না বললেই নয়। ১৯৫১ সালে সঙ্গীত পরিচালক নওশাদ সাহেব তার বৌজী বওরার সব গান তালাত মাহমুদকে দিয়ে গাওয়ানোর চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু তিনি এক দিন দেখতে পান তালাত মাহমুদ সিগারেট খাচ্ছেন। মুহূর্তেই তিনি সিদ্ধান্ত বদলে মোহাম্মদ রফিকে দিয়ে গান গাওয়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। তিনি পরে বলেছেন, তাঁর এই সিদ্ধান্ত সঠিক হয়েছে। তাঁর দৃষ্টিতে মোহাম্মদ রফির কণ্ঠের দ্যুতি অন্যরকম যা শ্রোতার হৃদয় দখল করে নিতে জানে। উল্লেখ্য, এ সকল গানের রচয়িতা ছিলেন শাকিল বাদায়ুনি।

পরবর্তী সময়ে মোহাম্মদ রফি সঙ্গীত পরিচালক শংকর জয়কিষণের সাথে প্লে ব্যাক সিঙ্গার হিসেবে কাজ করেন। তাদের সুরে তাঁর প্রথম গান ছিল 'ম্যাই জিন্দেগী মে হরদম রোতা হি রাহা হু'– গানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। এ দুজনের সাথে তিনি ৩৪১টি গান গেয়েছেন। এর মধ্যে অসংখ্য গান কালজয়ী হয়ে আছে। মোহাম্মদ রফি যে কয়টি গানের জন্য ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড পান তার ৪টিই শঙ্কর ও জয়কিষণের গান। এই জুটির সাথে মোহাম্মদ রফির সম্পর্ক এতোটাই ঘনিষ্ঠ ছিল যে, দুজনের মধ্যে কখনো ঝগড়াঝাটি বা মনোমালিন্য হলে তিনি তা মিটিয়ে দিতেন। গানের জগতের বাইরেও তিনি তাদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতেন। 'হাম কিসিসে কম নেহি' ছবির সঙ্গীত পরিচালক রাহুল দেব বর্মণ (আরডি বর্মণ) এর কম্পোজে রফির গাওয়া 'কেয়া হুয়া তেরা ওয়াদা' গানটি ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড লাভ করে।

সংগীত শিল্পী কুন্দল লাল সায়গল (কে.এল. সায়গল)

ভারতের অন্যতম সঙ্গীত পরিচালক সচিন দেব বর্মণ (এসডি বর্মণ) এর সাথে তিনি ৩৭টি ছবিতে কণ্ঠ দিয়েছেন। পরিচালক তাকে দিয়ে মূলত এসব ছবিতে দেবানন্দ, গুরু দত্ত ও রাজেশ খান্নার জন্য গান গাওয়ান। সে সব গানের অনেকগুলোই এখনো সঙ্গীতপ্রেমীদের মুখে মুখে আলোড়িত হয়।

সে সময়ের বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক ও.পি. নাইয়ার রফিকে দিয়ে গান গাওয়ান কিশোর কুমারের জন্য তার 'রাগিনী' ছবিতে। 'বাজ' ছিল তার সাথে প্রথম কাজ। তিনি বলেছেন, রফি না থাকলে ও.পি. নাইয়ার হতো না। তিনি মোহাম্মদ রফিকে দিয়ে বিভিন্ন ছবিতে ১৫৭টি গান করান।

সঙ্গীত পরিচালক রবিও মোহাম্মদ রফিকে নিয়ে অনেক উল্লেখযোগ্য ছবিতে গান করান। রবির ২১০টি গানে তিনি কণ্ঠ দেন। এর মধ্যে তাঁর চৌদিবি কা চাঁদ হো ইয়া আফতাব হো' গানটি গেয়ে ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার লাভ করেন মোহাম্মদ রফি। রবির সাথে তাঁর আরেকটি অনবদ্য কাজ 'বাবুল কি দোয়ায়ে লেতে যা'– এই গানটি ভারতের বিভিন্ন বিয়ে শাদিতে এখনও বাজিয়ে শোনানো হয় ।

সঙ্গীত পরিচালক খৈয়ামের সুরে ও তত্ত্বাবধানে তিনি একটি ভজনের অ্যালবাম করেন যা বেশ জনপ্রিয়তা পায়। খৈয়াম বলেন, মোহাম্মদ রফি ছিলেন একজন খাঁটি মানুষ। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলে তা যে কোনোভাবে রক্ষার চেষ্টা করতেন। একবার জ্বর নিয়ে প্রোডাকশনে গান গাইতে আসেন রফি। রফির শারীরিক অবস্থা দেখে খৈয়াম তাঁকে বলেন, এটা ক্যানসেল

সপরিবারে মোহাম্মদ রফি

কম্পোজার হুসন্ লাল ও ভগত রাম এর সাথে মোহাম্মদ রফি

সুরকার কল্যাণজী-আনন্দজী এর সঙ্গে মোহাম্মদ রফি

সুরকার লক্ষ্মীকান্ত ও পেয়ারে লাল এর সঙ্গে মোহাম্মদ রফি

করতে পারতেন। রফি বললেন, আমার অনুপস্থিতির জন্য প্রোডাকশনের ক্ষতি হবে, কার্যক্রম পিছিয়ে যাবে– এই বিবেচনায় এসেছি। আমি চাইনি আমার জন্য আপনার প্রোডাকশনের ক্ষতি হোক। শিল্পীদের অনেকে বোহেমিয়ান হলেও তার মধ্যে প্রফেশনালিজম ছিল সর্বোচ্চ মানের।

ভারতীয়দের অনেকেই তাঁকে ঈশ্বর এর আওয়াজ বলে আখ্যায়িত করেন। স্বল্পভাষী ও মৃদুভাষী রফি অনেক সঙ্গীত পরিচালকের সাথে কাজ করেছেন। বিশেষ করে লক্ষ্মীকান্ত পেয়ারে লাল জুটির সাথে প্রথম যেদিন কাজ করেন তখন তারা ভয়ে ভয়ে ছিলেন– এতো বড় শিল্পীর সম্মানী দিতে পারবেন কি না। প্রথম গানের পর তারা মোহাম্মদ রফি সাহেবকে খামে ভরে ১০০০ টাকা প্রদান করেন। কিন্তু তিনি খাম না খুলেই তাদের ফেরত দিয়ে বলেন– তোমাদের জন্য শুভেচ্ছা। এ দিয়ে মিষ্টি খেয়ো। তিনি তাদের পরামর্শ দেন– মিলেমিশে কাজ করো। তোমরা সফল হবে। পরবর্তীতে তিনি এই জুটির সাথে ৩৭৯টি গান করেন। তাদের দোস্তী ছবির গানগুলো যা মোহাম্মদ রফির গাওয়া তা ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়।

মোহাম্মদ রফির কণ্ঠে এক ধরনের জাদু ছিল। সে সময়ের প্রায় সকল সঙ্গীত পরিচালকই তাকে দিয়ে গান গাইয়েছেন। বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক কল্যাণজী-আনন্দজী জুটির সাথেও তিনি অনেক কাজ করেছেন। তাদের বিখ্যাত সঙ্গীত 'পরদেশীওছে না আঁখিয়া না মিলানা' তার কারণেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 'রাজুকা কা হ্যায় এক খাব-/রাজু রাজা রাজা সাব'– এই গানটিও শ্রোতাদের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হতো। তাদের সাথে ১৭০টি গান করেছেন তিনি।

১৯৭০ সালে তিনি সঙ্গীত পরিচালক মদন মোহনের সাথে আঁখে ছবিতে গান গেয়েছিলেন। 'তেরে আঁখো কি সিবা দুনিয়ামে রাক্ষা কেয়া হ্যায়'– এছাড়া তার হীর রাঞ্জার জন্য আইকনিক গান 'ইয়ে দুনিয়া ইয়ে মেহেফিল মেরে কাম কি নেহি' গানটি বারবার শুনতে ইচ্ছে করে। এটি ভারতীয় উপমহাদেশের সুপার হিট গানের একটি।

তাঁর কণ্ঠে শঙ্কর জয় কিষণের বাহারো ফুল, তেরে প্যারী প্যারী সুরাত, দিলকি ঝরো কে মে, চাহে কই মুঝে জংলী কহে গানগুলো বেশ দরদ দিয়ে গাওয়া। রবির সঙ্গীত পরিচালনায় রফি'র চৌধুবী কা চাঁদ/বাবুল কি দোয়ায়ে লেতে– যা পুরস্কার লাভ করে। লক্ষ্মীকান্ত ও পেয়ারে লাল রফিকে গুরু মানতেন। দোস্তী ছবির জন্য পুরস্কার পান তিনি। এছাড়া রবীন্দ্র জৈন, রওশন, উষা খান্না, রাজেশ রওশন, আর.ডি. বর্মণ, চিত্রগুপ্ত, সলিল চৌধুরী, বাপ্পি লাহিড়ী, স্বপন জগমোহনসহ অনেকের কম্পোজিশনে গান গেয়েছেন তিনি। এ ছাড়াও যে সকল গীত রচয়িতার গানে তিনি কণ্ঠ দিয়েছেন তাদের মধ্যে সায়ের লুধিয়ানভি, রাজেন্দ্র কিষণ, মজরু সুলতানপুরী, আনন্দ বকশী, রাজা মেহেদী আলী খান, হসরত জয়পুরী, শায়লেন্দ্র, গুলশান বাউড়া, শাকিল বাদায়ুনি অন্যতম।

কালাপানি ছবিতে দেবানন্দের জন্য গান গেয়েছেন। ৭০- এ আরাধনা ছবিতেও তিনি কণ্ঠ দিয়েছেন।

তার দেশাত্মবোধক গানের সংখ্যাও অগণিত। এর মধ্যে কার চলে হাম ফিদা জানেতন সাঁথিয়ো– আপ তুমহারে হাওয়ালে ওয়াতন সাথীয়ো অন্যতম। লায়লা মজনু ছবির জন্য মদন মোহন রফিকে ঋষি কাপুরের জন্য গান গাইতে বলায় প্রথমে তিনি আপত্তি করেন। কারণ ঋষির বয়স তখন মাত্র ২২ এবং তার বয়স ৫০। তিনি ভেবেছিলেন, একজন বয়েসী কণ্ঠের গান এক তরুণের কণ্ঠের সাথে মানানসই হবে কি না? কিন্তু তার আপত্তি ধোপে টিকেনি।

তার গাওয়া–

তেরে দর্পে আয়া হুঁ
কুচ করকে জায়েঙ্গে
ঝোলি ভরকে জায়েঙ্গে
ইয়া মরকে জায়েঙ্গে।

এই গানটি যেন ঋষিই গেয়েছেন। সঙ্গীত পরিচালক চিত্র গুপ্তের সাথে কাজ করেছেন রফি। তাঁর ছবি 'ভাবী'তে রফির 'চল উড় যারে পানছি কে আপ ইয়ে দেশ হুয়া বেগানা, ইয়ে দিল দিওয়ানা হ্যায় দিলতো দেওয়ানা হ্যায়- লতার সাথে এই ডুয়েটটিও ব্যাপক মন জয় করা গানের একটি।

মোহাম্মদ রফির সঙ্গে কিশোর কুমার

মোহাম্মদ রফির বড় গুণ ছিল সিনেমা জগতের কোনো পরিচালককেই তিনি ছোট করে দেখতেন না। নতুনদের তিনি উৎসাহিত করতেই খুব স্বল্প মজুরিতে কাজ করে দিতেন। তিনি ছিলেন সত্যিই ঈশ্বরের কণ্ঠ। কণ্ঠের সেবা করেই তিনি আনন্দ পেতেন। এ জন্য মোহাম্মদ রফি সাধারণ মানুষের মনে সুরের আরাধনা হয়ে বেঁচে আছেন, বেঁচে থাকবেন চিরদিন।

মোহাম্মদ রফি ও রবি

শংকর ও জয় কিষণ

মদন মোহন ও মোহাম্মদ রফি

প্রথম স্ত্রী লাহোরে থেকে যাওয়ায় মোহাম্মদ রফি ১৯৫১ সালে দ্বিতীয় বিয়ে করেন বিলকিস বানুকে। বিলকিস বানু তাঁর সঙ্গীত জগতের অন্যতম শুভাকাঙ্ক্ষী ও বড় ভাইয়ের বন্ধু স্বজন আব্দুল হামিদের শ্যালিকা। মানুষ হিসেবে অসাধারণ মোহাম্মদ রফির ৪ ছেলে ৩ মেয়ে। বড় ছেলে সাঈদ তার প্রথম স্ত্রীর সন্তান। দ্বিতীয় স্ত্রী বিলকিস বানুর গর্ভে ছেলে খালেদ, হামেদ, শাহেদ এবং মেয়ে নাসরীন ও ইয়াসমীনের জন্ম। নিজে গানের শিল্পী হলেও তিনি সন্তানদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলেন।

মোহাম্মদ রফি নিজে খুব সহজ সাধারণ নিরহঙ্কারী মানুষ ছিলেন, তেমনই সন্তানদের সেই শিক্ষা দিয়েছেন। ছেলেরা যাতে তাঁর পরিচিতি এবং সুখ্যাতির প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে অহঙ্কারী না হয় সে জন্য তিনি ছেলে মেয়েদের সিনেমা হলে নিয়ে যেতেন ছবি শুরুর ১৫ মিনিট পর এবং বের হয়ে আসতেন ছবি শেষ হবার ১৫/২০ মিনিট আগে। আবার এটিও মনে করতেন, তাঁর সাথে পরিবারের ও সন্তানদের ছবি যদি পত্রিকায় ছাপা হয় তাহলে তাদের মধ্যে অহঙ্কার এনে দিতে পারে–যা তিনি চাইতেন না। তিনি চাইতেন সন্তানরা আর দশজনের মতো সাধারণ হয়েই বেড়ে উঠুক। মানুষের মতো মানুষ হোক।

ছেলের বউ ইয়াসমীন খালেদ বলেছেন তার শ্বশুর ছিলেন খুবই সাধারণ একজন মানুষ। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তিনি বেশ বাছ-বিচার করতেন। পারিবারিক জীবনে সংসার অন্তপ্রাণ। ছেলে-মেয়ে আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজ-খবর নিতেন আন্তরিকতার সাথে। তাঁর পুত্রবধূ ইয়াসমীন খালেদ বলেন, বাবা ইংল্যান্ডে স্টেজ শো তে গিয়ে পছন্দের খাবার না খেতে পেরে লন্ডনে ছেলের বাসায় চাল-ডালের রান্না খেতে চলে আসেন এবং তিন ঘণ্টা পর শো শুরু হওয়ার আগেই শত কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে অনুষ্ঠানস্থলে ফিরে যান।

মোহাম্মদ রফির মৃত্যুর পর ভারতের বরেণ্য শিল্পীরা এক স্মরণ সভার আয়োজন করে। স্মরণ সভায় রফি সম্পর্কে কিশোর কুমার, মান্না দে, মহেন্দ্র কাপুর, লতা মুঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলেসহ তার সময়কার সকল সঙ্গীত শিল্পীরাই তুলে ধরেন যে, তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পীদের একজন।

কিশোর কুমার

এই মহান সঙ্গীতজ্ঞ সম্পর্কে গুণী কণ্ঠশিল্পী কিশোর কুমার বলেন, তার সাথে রফির সম্পর্ক ছিল খুবই গভীর। কিশোর কুমার রফিকে বড় ভাইয়ের মতো শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। কিশোর নিজে গায়ক হলেও কয়েকটি ছবিতে কিশোরের জন্য রফি কণ্ঠ দিয়েছেন। কিশোর কুমারের বোম্বে আগমন ১৯৪৮ সালে। রফি এসেছিলেন ১৯৪৪ সালে। দুজনে ১১টি বিখ্যাত ডুয়েট গেয়েছেন একসাথে। তারা দুজনসহ লতা, আশা, সুমন কল্যাণপুর একসাথে ৫০টিরও অধিক গান গেয়েছেন।

মিডিয়া অনেক সময় কে শ্রেষ্ঠ সেটা নিয়ে প্রশ্ন তুললে কিশোর এড়িয়ে যেতেন– এগুলোকে ফালতু বিষয় হিসেবে ইগনোর করতেন। এক সময় কিশোর কুমারের প্রতি সরকার নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল সঞ্জয় গান্ধীর একটি অনুষ্ঠানে অনুপস্থিতির কারণে, তাঁকে রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমে ব্ল্যাক লিস্টেড করা হয়। মো. রফি সুপারিশ করে এক সময় তার সেই নিষেধাজ্ঞা উইথড্র করান। একবার কিশোর কুমার লন্ডনে রফির ছেলের বাসায় তাঁর সাথে দেখা করতে যান। কিশোর কুমার আসবে এটা জেনে রফি সবাইকে বলেন, সবাই হাসির জন্য প্রস্তুত হও, কিশোর দা আসছে। কারণ কিশোর কুমার মানুষকে কথা দিয়ে হাসাতে পছন্দ করতেন। কিশোর কুমার রফিকে এতোটাই ভালোবাসতেন যে, মৃত্যুর পর তাঁর পায়ের কাছে বসে মাতম করেন।

মান্না দে

সমকালীন গায়ক হিসেবে মান্না দে সব সময়ই মোহাম্মদ রফিকে শ্রেষ্ঠ গায়ক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, মোহাম্মদ রফি অত্যন্ত প্রতিভাবান শিল্পী। তাঁর তুলনা তিনিই। আমার সাথে যদি তাকে তুলনা করা হয় আমি বলব, রফিই শ্রেষ্ঠ। অন্য কারো সাথে আমার তুলনা করা হলে আমি সেক্ষেত্রে এমনটি বলবো না।

মোহাম্মদ রফি ও মান্না দে

লতা মুঙ্গেশকর

বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী লতা মুঙ্গেশকরও রফিকে তাদের সময়ের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে উল্লেখ করেন। তাঁর মৃত্যুতে সঙ্গীত ভুবন এক মহানায়ককে হারালো বলে তিনি মন্তব্য করেন। মুঙ্গেশকরের সাথে তার ডুয়েটের সংখ্যা অনেক– প্রায় ৪৪৭টি। সবগুলোই জনপ্রিয়। এক সময় ৬০ দশকে শিল্পীদের রয়্যালিটি পাওয়া নিয়ে রফির সাথে দ্বিমত হয়। লতা বললেন,

রয়্যালিটি প্রয়োজন। রফি বললেন, তারা তো সম্মানী দিয়েই গান করান। এ জন্য তাদের মধ্যে ৩ বছর কথাবার্তা বন্ধ ছিল। সে সময় আশা ভোঁসলে, সুমন কল্যাণপুর, মোবারক বেগম, হেমলতা, সারদা এদের সাথে মোহাম্মদ রফি গান করেন। পরবর্তীতে শঙ্কর জয় কিষণ ও নার্গিস দত্তের হস্তক্ষেপে রফি-লতার এই দ্বন্দ্বের নিরসন হয়। লতা মুঙ্গেশকর মোহাম্মদ রফিকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। লতা বলেন, রফি সাহেব নেশা, পান-বিড়ি কিছুই খেতেন না। তিনি ভালো খেতে পছন্দ করতেন এবং গান নিয়েই সময় কাটাতেন। উল্লেখ্য, লতা-রফির দ্বন্দ্বের কারণে ৩ বছর কিশোর, মহেন্দ্র কাপুর, মুকেশ লতার সাথে ডুয়েট গান করার প্রচুর সুযোগ পায়।

লতা মুঙ্গেশকর ও মোহাম্মদ রফি

মহেন্দ্র কাপুর

মোহাম্মদ রফির কাছ থেকে তালিম নিতেন এবং রফি তাকে ছোট ভাইয়ের মতো স্নেহ করতেন। তাঁর কথা বলতে গিয়ে মহেন্দ্র কাপুর বলেছেন, প্রথম উড়োজাহাজে ওঠার জন্য রফি তাকে সুযোগ করে দেন। বোম্বে থেকে কলকাতা নিয়ে যান। আরও বলেন, রফি সাহেব এতো বেশি সাদাসিদে স্বভাবের ছিলেন যে একবার অনুষ্ঠানের পর কিছু ছেলেমেয়ে রফি সাহেবের অটোগ্রাফ নিতে ভিড় জমায়। রফি জিজ্ঞেস করেন ওরা কি চায়? মহেন্দ্র কাপুর বলেন অটোগ্রাফ চায়। রফি বলেন, তাহলে তুই লিখে দে– পরে নিজেই ইংরেজিতে অটোগ্রাফ দেয়ার অভ্যাস করেন।

মহেন্দ্র আরো বলেন, রফি সাহেবের কোন নেশা ছিল না। তার পছন্দ ছিল গাড়ি আর হাতঘড়ি। হবি ছিল ঘুড়ি উড়ানো, ক্যারাম ও ব্যাডমিন্টন খেলা। তাঁর মধ্যে কোনো অহঙ্কার ছিল না। আল্লাহর প্রতি তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস। একবার ইউএসএ এর শিকাগোতে প্রোগ্রাম করতে গিয়ে তখনকার বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী ক্লে'র সাথে দেখা করেন মোহাম্মদ রফি। ক্লে রফিকে চিনতেন না। তখন উদ্যোক্তাদের একজন তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, তুমি যেমন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা, ইনি তেমনই সঙ্গীতে শ্রেষ্ঠ। পরে দুজন একসাথে ছবি তোলেন।

১৯৭১ সলে স্ত্রীসহ হজব্রত পালন করেন মোহাম্মদ রফি। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। হজ থেকে ফেরার পর এক মৌলভী তাঁকে গান গাইতে নিষেধ করেন। তিনি কিছুদিন বিরত থাকেন। পরবর্তীতে যখন অন্যরা জানতে পারেন যে হজ করার কারণে তিনি গান গাইছেন না তখন সঙ্গীত পরিচালক নওশাদ সাহেব তাঁর সাথে দেখা করে বলেন যে, আল্লাহ তোমাকে সম্পদ দিয়েছে গলা। তুমি তো এ দিয়েই হালাল রুটি-রুজি করো। ধর্মে এ ব্যাপারে কোনো নিষেধ নেই, পরে তিনি আবার গান গাওয়া শুরু করেন। মোহাম্মদ রফি মানুষ হিসেবে মানবতাবাদী ছিলেন– যার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে।

তিনি একবার একটি টিয়া রঙের গাড়ি আমদানি করেন। ড্রাইভিং লেফট হ্যান্ড। যে কারণে ড্রাইভার লেফট হ্যান্ডেড গাড়ি চালাতে তার অপরাগতার কথা জানায়। তিনি আরেকজন ড্রাইভার নিয়োগ দেন। তখন তিনি ভাবেন যে ওতো বেকার হয়ে গেলো– ওর ফ্যামিলি চলবে কি করে? একথা চিন্তা করে তিনি তাকে ৭০ হাজার টাকা দিয়ে একটি ফিয়াট গাড়ি কিনে দেন রোজগার করার জন্য।

তিনি কখনো বোম্বের কোনো পার্টিতে যেতেন না। তিনি এসব থেকে দূরে থাকতেন। একবার তাঁর এক বন্ধু আসে দেখা করতে। বন্ধুর শার্ট ছেড়া দেখে তিনি বুঝতে পারেন তার আর্থিক অসহায়ত্বের কথা। পরে ড্রাইভারকে দিয়ে কয়েক সেট জামা কাপড় পাঠিয়ে দেন। তাঁর সেই বন্ধু সবসময় শুকরিয়া করে বলতেন, রফির মতো দরদী মনের বন্ধু আমার আছে। মোহাম্মদ রফি একবার শ্রীলঙ্কায় স্টেডিয়ামে গান গাইতে যান। সেখানে ১২ লাখ লোক উপস্থিত হয়। রাষ্ট্রপতি জে আর জয়বর্ধন ও প্রধানমন্ত্রী প্রেমাদাসা সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। রফির গান শুনে এতই মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন যে, তাঁদের অনেক কাজ থাকা সত্ত্বেও গান শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা আসন ছেড়ে উঠে যাননি।

রফি ভারতের ১৪টি ভাষায় গান গেয়েছেন। বাংলাতেও তিনি অনেক গান গেয়েছেন। তার সব গানই জনপ্রিয়তা পেয়েছে। শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গায়ক হিসেবে তাঁকে সম্মান দেয়া হয়। ভারত সরকার তাঁর সম্মানে তাঁর ছবি দিয়ে

শিকাগোতে মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে মোহাম্মদ রফি

৫ টাকার ডাক টিকেট উন্মোচন করে।

মোহাম্মদ রফি তাঁর সময়ের অনেক অভিনয় শিল্পীর জন্য গান করেন। সব ধরনের গান গাইতে পারদর্শী ছিলেন তিনি। ক্ল্যাসিক্যাল, ভজন, কাওয়ালী, ঠুমরিসহ নানা ধরনের বহুমাত্রিক গায়ক হিসেবে তাঁকে বর্ণনা করেন সঙ্গীত পিপাসুরা। তিনি যাদের জন্য গান গাইতেন তা এতোটাই দরদ মিশিয়ে গাইতেন যে, মনে হতো তারাই গান গাচ্ছেন।

চিত্রগুপ্ত ও মোহাম্মদ রফি

দিলীপ কুমার, দেবানন্দ, শাম্মী কাপুর, শশী কাপুর, জনী ওয়াকার, মেহমুদ, বিশ্বজিত চট্টোপাধ্যায়, সুনীল দত্ত, ধর্মেন্দ্র, অমিতাভ বচ্চন, ফিরোজ খান, সঞ্জয় খান, ঋষি কাপুর, জিতেন্দ্র, মনোজ কুমার, রাজেন্দ্র কুমার, গুরু দত্ত, ভারত ভূষণসহ প্রায় সকলের জন্যই তিনি প্লে ব্যাক করেছেন। তাঁর গানের কথা বলতে গিয়ে বিশ্বজিত চ্যাটার্জি (প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাবা) বলেন, রফি সাহেব এমনভাবে গান করতেন যে হিরোকে তেমন কিছুই করতে হতো না, শুধু ঠোঁট মেলালেই হতো।

শাম্মী কাপুরের জন্য তিনি অসংখ্য গান গেয়েছেন। ১৯৮০ সালে জুলাই মাসের শেষে শাম্মী কাপুর যখন একটি তীর্থস্থানে পূজা দক্ষিণা করতে গিয়েছিলেন সে মুহূর্তে মন্দিরে তার একজন ভক্ত তাকে ডেকে বলেন, শাম্মীজী আপনার কণ্ঠস্বর চলে গেছে, শাম্মী কাপুর তাৎক্ষণিক বুঝতে পারেননি। তখন ভক্ত বলেন রফি সাহেব মারা গেছেন। শাম্মী কাপুরের গান করার সময় শাম্মী সাধারণত উপস্থিত থাকতেন। একবার তিনি দেশের বাইরে ছিলেন। তিনি ফেরার পর বলেন, আমি ছিলাম না তারপরও অতো সুন্দর করে গাইলেন কেমনে! রফি বলেন, আমি জানতাম কার জন্য গান গাইছি ।

জিতেন্দ্র

সে সময়কার নায়ক জিতেন্দ্র রফি সাহেবকে স্মরণ করতে গিয়ে বলেন, মানুষ তাকেই স্মরণ করে যাকে মানুষ ভুলে যায়– রফি সাহেব তো তরতাজা আমাদের মাঝেই আছেন, তাঁকে স্মরণ করার কিছু নেই– ভুলতে চাইলেও পারব না। তিনি চির জাগরুক। জিতেন্দ্র বলেন, আকবরের দরবারে যেমন তানসেন ছিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে আমাদের মাঝে সুরের সম্রাট করে পাঠিয়েছিলেন।

তিনি আরো বলেন, সঙ্গীত শিল্পীদের অনেকেই সাধারণত গলা দিয়ে গান গেয়ে থাকেন, আর রফি সাহেব গাইতেন রুহ দিয়ে। যে কারণে মানুষের রুহকে ছুঁয়ে যেতো। রফি সাহেবের গুণ নিয়ে কথা বলা মানে সূর্যকে প্রদীপ দেখানোর চেষ্টা করা। রফি সাহেবের আওয়াজ শুনলেই মনে হতো এটি ঈশ্বর প্রদত্ত এক সুরেলা আওয়াজ। মানুষ হিসেবেও তিনি ছিলেন অনেক বড়।

জিতেন্দ্রের ছবি দিদারে ইয়ার-এ কণ্ঠ দিয়েছিলেন রফি ও কিশোর কুমার। ছবিটি শেষ হতে ৫ বছর সময় লাগে। ১৯৭০ সালে ছবিটি প্রদর্শিত হয়।

দিদারে ইয়ার ছবিটি ফ্লপ হওয়ায় প্রদর্শনীতে দর্শক কম ছিল পুলিশই বেশি ছিল। এ ছবির জন্য কিশোর ও রফি একটি ডুয়েট গান করেন, জিতেন্দ্রের ম্যানেজার জিগ্যেস করেন রফি সাহেবকে কত দেবো, জিতেন্দ্র বলেন, কিশোর দাকে যা দিয়েছো তাই দাও। ম্যানেজার বলেন, কিশোর দা'কে বিশ হাজার দিয়েছি, জিতেন্দ্র ওনাকেও বিশ হাজার দিতে নির্দেশ দেন। রফি বাড়ি গিয়ে ১৬ হাজার টাকা ফেরত দিয়ে বলেন, জিতু পয়সা বেশি এসেছে। জিতেন্দ্র ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, তিনি ছিলেন একজন নেক বান্দা, নেক মানুষ। তাঁর মধ্যে কখনো লোভ দেখিনি। এই দিনেও এরকম মানুষ পাওয়া ভার।

অমিতাভ বচ্চন

সুপারস্টার অমিতাভ বচ্চন বলেন, মোহাম্মদ রফি সাহেব অত্যন্ত মৃদুভাষী ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর সাথে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। নসীব ছবিতে তার সাথে গান গেয়ে আমি পুলকিত হয়েছিলাম। অনুভব করেছি– চল মেরে ভাই তেরে হাত জোড়তাহু হাত জোড়তাহু তেরি পাও পড়তা হু... এবং নসীবে আমার জন্য তিনি জন জনি জনার্ধন গানগুলো গেয়েছিলেন খুবই দরদ দিয়ে। পরবর্তীতে অনেকগুলো ছবিতে আমার জন্য গান গেয়েছেন তিনি।

আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, একটি স্টেজ প্রোগ্রাম করতে আমরা শিলিগুড়ি গিয়েছিলাম। ২ দিনের প্রোগ্রাম ছিল। প্রথম রাতে রফি সাহেবের গাওয়ার কথা, দ্বিতীয় রাতে অন্য এক গায়কের গান গাওয়ার কথা ছিল। আগের রাতের প্রোগ্রাম শেষে তিনি মুম্বাই ফিরে যাবার জন্য বাগডোগরা এয়ারপোর্টে চলে গিয়েছিলেন। তখনই সকালে জানতে পারি অন্যজন আসছেন না। সেই সময় আমরা সবাই এয়ারপোর্টে দৌড়ে যাই। রফি সাহেব তখন বিমানে উঠে গেছেন। আমরা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে

মোহাম্মদ রফি ও মহেন্দ্র কাপুর

মোহাম্মদ রফি ও নায়ক জিতেন্দ্র

ওপি নাইয়্যার এর সাথে মোহাম্মদ রফি

নায়ক অমিতাভ বচ্চন, সুরকার-শিল্পী রাহুল দেব বর্মণ (আর.ডি. বর্মণ) এবং শিল্পী আশা ভোসলের সাথে মোহাম্মদ রফি

প্লেনে উঠি। গিয়ে রফি সাহেবকে ঘটনা খুলে বলি আপনি আমাদের উদ্ধার করতে পারেন। তিনি এতো ভদ্রলোক ছিলেন যে, কিছুই না বলে ব্যাগ নিয়ে আমাদের সাথে চলে এলেন।

এ রকম একজন মহান মানুষ উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ বহুমাত্রিক শিল্পী রফির শেষ গান ছিল আশপাশ নামের ছবির জন্য। কলকাতা থেকে বাঙালি কিছু কম্পোজার তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন। তিনি তখন বুকে ব্যথা অনুভব করছিলেন, কিন্তু গ্যাসের ব্যথা মনে করে ইগনোর করেন এবং কম্পোজারদের সাথে কাজ শেষ করে মাত্রাতিরিক্ত অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর পরিবার তাকে মাহি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। সেখানে তার বুকে পেসমেকার বসানোর সুযোগ না থাকায় ডাক্তাররা অনতিবিলম্বে বোম্বে হাসপাতালে স্থানান্তর করেন এবং পেসমেকার লাগিয়ে আইসিইউতে চিকিৎসা দিতে থাকেন। হাসপাতালে নেয়ার পথে একাধিক স্ট্রোক হয়। ১৯৮০ সালের ৩১ জুলাই বোম্বে হাসপাতালে সেই অবস্থায়ই মহান গায়কের মৃত্যু ঘটে। জুহু'র মুসলিম কবরখানায় শতাব্দীর এই শ্রেষ্ঠ গায়ককে সমাহিত করা হয়। তাঁর মৃত্যুতে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে লাখ লাখ লোকের সমাগম হয়েছিল। এ সময় অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছিল, তাঁর ভক্ত-অনুরাগীরা তখন মন্তব্য করেন প্রকৃতিও ওনার জন্য কাঁদছে। মৃত্যুর পর যে লোক সমাগম হয় এতে মহাত্মা গান্ধীর সাথে তাঁর এই জনসমাগমের তুলনা করা হয়। মহাত্মা গান্ধীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যে পরিমাণ লোক হয়েছিল অনেকেই বলেন, মোহাম্মদ রফির শেষ বিদায় অনুষ্ঠানেও তেমনই লোকের সমাগম ঘটেছিল। তাঁর কফিনে অসংখ্য মানুষ শ্রদ্ধার্ঘ দিয়েছেন।

সঙ্গীতকার নওশাদ বলেন–

দিল গেয়া দিলবর চলা গেয়া
গীতকা পয়গম্বর চলা গেয়া।

মো. রফি আমাদের মাঝে না থাকলেও তার দশ হাজারেরও বেশি গান রয়েছে। সারা পৃথিবীব্যাপী তাঁর রয়েছে কোটি কোটি ভক্ত। বিভিন্ন ভাষায় তাঁর গাওয়া গান আমাদের আগামী প্রজন্মের কাছেও জনপ্রিয় হয়ে থাকবে বলে আমি মনে করি। পরবর্তীতে অনেকেই তাঁর গান গাওয়ার চেষ্টা করছেন কিন্তু তাদের কেউ-ই তাঁর সমকক্ষ হতে পারেননি।

রফির গান মানুষকে এতোটাই নাড়া দিত যে, একবার একজন ফাঁসির আসামি অন্তিম ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, সে মো. রফির দুনিয়াকো রাখোয়ালে গানটি শুনতে চায়। টেপ রেকর্ডার এনে তার অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করা হয় এবং তারপর ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

তিনি ছিলেন দয়ালু মনের মানুষ। নামে-বেনামে অনেক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও মানুষকে সাহায্য করেছেন তিনি। সত্যিকার অর্থেই তিনি ছিলেন একজন মহান ব্যক্তি। মো. রফি এটা বিশ্বাস করতেন যে, ওপরওয়ালার যদি আশীর্বাদ থাকে আমার প্রতি তাহলে আমার যে সাফল্য অর্জন তা মিলেমিশে উপভোগ করা উচিত। কেউ কখনো তার কাছে সাহায্য-সহযোগিতা না চাইলেও তিনি মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতেন।

এমনও ঘটেছে যে, তিনি নিজের মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা-পয়সা, গয়না রেডি করেছিলেন তা তিনি একজন দরিদ্র সঙ্গীতকারের মেয়ের বিয়েতে দান করে দিয়েছেন। আরেকটা ঘটনা, মেয়ের বিয়ের জন্য জিনিসপত্র, গয়না, কাপড়চোপড় একত্র করেছিলেন তা এক হিন্দু বন্ধুর মেয়ের বিয়েতে যৌতুক হিসেবে তুলে দেন। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক মানুষ। এরকমও হয়েছে যে, গরমের মধ্যে রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে কোনো খালি পায়ের মানুষকে দেখে তার কষ্ট দূর করার জন্য তাকে জুতো দিয়ে খালি পায়ে বাসায় ফিরতেন। মো. রফি ব্যক্তি হিসেবে সৎ ও ভালো মানুষতো ছিলেনই সঙ্গীত শিল্পী হিসেবেও ছিলেন মহান– এসব ঘটনা তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

একবার বিদেশ ভ্রমণ শেষে শুধু চকলেট নিয়ে বাড়ি ফেরেন তিনি। পরিবারের সদস্যরা এতে বেশ মন খারাপ করেন। অনেক পরে জানা যায় গান গেয়ে পাওয়া অর্থে সেবার তিনি ভারতের একটি হাসপাতালের জন্য একটা মেশিন কিনে দিয়েছিলেন।

এই মানবতাপ্রেমী, দুঃখী মানুষের বন্ধু মারা যাওয়ার পর তিনি যে সব দরিদ্র অভাবী মানুষকে প্রতি মাসে সাহায্য করতেন, তাদের অনেকেই ৬ মাস টাকা না পেয়ে বোম্বের বান্দ্রার রফি ম্যানশনে এসে জানতে পারেন তাদের সাহায্যদাতা সেই দয়ালু মানুষটি আর নেই। তারা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁর কবর জেয়ারত করেন।

তিনি মানুষকে গোপনে সাহায্য দিতেন এবং তা কখনো প্রকাশ করতেন না। তিনি কখনো অন্যের প্রশংসা পাবার জন্যও সাহায্য করতেন না। মোহাম্মদ রফি মানুষ হিসেবেও সত্যিই ছিলেন এক অনন্য অসাধারণ। তাঁর বিদেহী আত্মার সর্বাঙ্গীন শান্তি কামনা করছি।■

● লেখক : প্রতিষ্ঠাতা
নির্বাহী পরিচালক
বুরো বাংলাদেশ

সূত্র : বিবিসি হিন্দি, দূরদর্শন-ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ান ফিল্ম মিডিয়া।

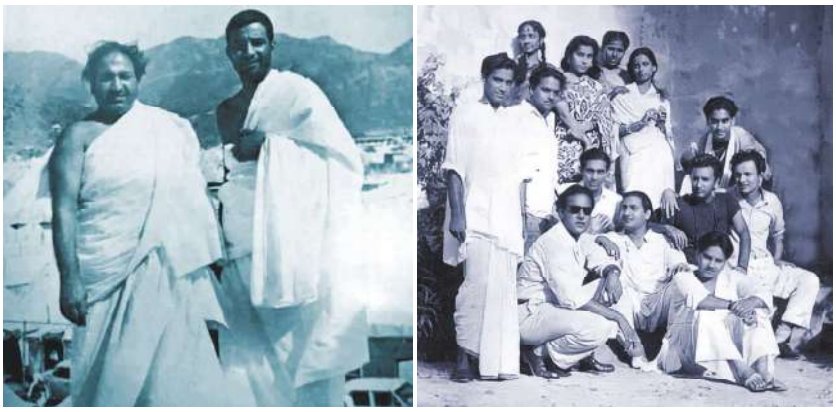

১৯৭৩ সালে হজ পালনরত মোহাম্মদ রফি (বাঁয়ে) এবং কিশোর কুমার মহেন্দ্র কাপুর, তালাত মাহমুদ, উষা তিমোথিসহ অন্যান্যদের সাথে

এনজিওদের অর্থায়নে বদলে গেছে খাসিয়াদের পেশাজীবন

জৈন্তাপুরের খাসিয়ারা

সিলেটের জৈন্তাপুর। নৃতাত্ত্বিক খাসিয়া জনগোষ্ঠীর এক বিপুল অংশের বাস। বুরো বাংলাদেশসহ দেশের বেশ ক'টি এনজিও এখানে খাসিয়াদের ক্ষুদ্রঋণসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করছে। তাঁদেরই একজন মেরী সোমের। স্বামী বিশ্বজিত সোমের। বিশ্বজিত সোমের খাসিয়া সেবা সংঘের সভাপতি। মেরী সোমের জৈন্তাপুরের একজন বিশিষ্ট নারী ব্যবসায়ী। তিনি বুরো বাংলাদেশ এর একজন সফল ঋণ গ্রহীতা।

কথা হলো খাসিয়া সেবা সংঘের সভাপতি বিশ্বজিত সোমের সাথে। শিক্ষিত বিশ্বজিত জানালেন, খাসিয়ারা মাতৃতান্ত্রিক হলেও বর্তমানে মায়ের ইচ্ছায় অনেক ছেলেই সম্পদের মালিক হচ্ছে এবং মায়ের বাড়িতেই বাসের সুযোগ পাচ্ছে। তিনি নিজেও মায়ের বাড়িতে পরিবার-স্বজন নিয়ে বাস করছেন। তাদের ২ ছেলে ১ মেয়ে। বড় ছেলে অনার্স পড়ছে, সেজ ছেলে এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র এবং মেয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে। তিনি জানান, খাসিয়া সমাজ ব্যবস্থায় হেডম্যানরাই সমাজের নেতৃত্ব প্রদান করেন। কিন্তু এখানে খাসিয়া সেবা সংঘ সেই দায়িত্ব পালন করে থাকে।

বিশ্বজিত জানান, জৈন্তাতে ৪০টি খাসিয়া পরিবারের বাস, শিক্ষার হার প্রায় ৮৫%। তাদের মধ্যে অনেক সরকারি চাকরিজীবী, ডাক্তার, অধ্যাপক, শিক্ষক রয়েছেন। বিশ্বজিত সোমের বলেন, খাসিয়ারা জুম চাষ নির্ভরশীল। বর্তমানে এনজিও ও ব্যাংক ঋণের সুবিধা নিয়ে অনেকেই পেশার পরিবর্তন ঘটিয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্য করছে। তবে তাদের প্রধান কাজ হচ্ছে পান-সুপারির বাগান।

জৈন্তিয়ায় খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর আলাদা কালচারাল একাডেমি রয়েছে। সেখানে খাসিয়াদের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ রয়েছে। তিনি জানান, বর্তমান সরকার দুস্থ অসহায় ৭টি খাসিয়া পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দিয়েছে। বিশ্বজিত বলেন, খাসিয়া পরিবারের সন্তানদের বাবা-মা প্রবাসে যেতে দেয় না।

খাসিয়াদের আদি ধর্ম সেনতেং, তারা প্রকৃতি পূজারী। পরবর্তীতে অনেকেই খ্রিস্টান হয়েছে। শ্রীমঙ্গলে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় আছে। প্রতিবছর মাঘের ৭ তারিখে সেখানে প্রার্থনার জন্য সমবেত হয়। তিনি বলেন, তাদের ঐতিহ্যবাহী খাবার হচ্ছে মোরগের মাংস গরম পানিতে হলুদ, লবণ, মরিচসহ চাউল দিয়ে রান্না করা। তাদের সমাজ ব্যবস্থার কথা বলতে গিয়ে বিশ্বজিত আরো জানান, তারা আদিতে পাহাড়ি জনপদে বাস করলেও খাসিয়ারা সমতল ভূমিতেও বেশ ভালো আছেন। তিনি বলেন, খাসিয়া সম্প্রদায়ের জন্য একসময় রাজতন্ত্র ছিল, এখন তা নেই। তিনি আরো বলেন, সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন উদ্যোগের পাশাপাশি এনজিওদের উন্নয়ন কার্যক্রমে নৃগোষ্ঠীর অনেকেই দারিদ্র্যমুক্ত এবং কর্মপ্রবণ হবার সুযোগ পেয়েছে।

বিশ্বজিত জানান, এখনো অনেক খাস জমি পরিত্যক্ত অবস্থায় জঙ্গল হয়ে গেছে। সেগুলো খাসিয়াদের মধ্যে বরাদ্দ দেয়া হলে তা দারিদ্র্য নিরসনসহ অর্থনৈতিকভাবে অনেক কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

মোকাম পুঞ্জি, জাফলং

সিলেট থেকে জাফলং যেতে রাস্তার ডানদিকে এক কিলোমিটার গেলেই খাসিয়াদের এক সমৃদ্ধ পল্লী মোকাম পুঞ্জি। এখানে ৬৫টি খাসিয়া পরিবারের বাস। জনসংখ্যা প্রায় ৩০০। এই পুঞ্জির হেডম্যান হচ্ছেন লেবানন খাসিয়া। লেবানন খাসিয়ার বয়স ৭০ এর মতো। তিনি জানালেন এখানে তারা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হলেও সীমান্তের ওপারেই মেঘালয় পাহাড়ে খাসিয়ারা এক বৃহৎ জনগোষ্ঠী। তিনি জানান, এখানকার খাসিয়ারা অর্থ-সম্পদের দিক থেকে দরিদ্র, কিন্তু কেউ ভিক্ষাবৃত্তি করে না। তারা পরিশ্রমী। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কাজ করে। নিজেদের জমিতে জুম চাষ করে সময় পেলে দিনমজুরি করে।

কথা হলো মোকাম পুঞ্জির হেডম্যান লেবানন খাসিয়ার সাথে। তিনি বলেন,

দু'কিলোমিটার পেরোলেই ছোট রংপানি নদী। নদীর পাড়েই মেঘালয়ের জৈন্তা পাহাড়। সেই পাহাড়েই মূলত খাসিয়াদের বাস। ব্রিটিশকালে সীমান্ত ছিল না। তারা অল্প সংখ্যক বাংলাদেশের মধ্যে পড়েছেন। ভারতের মেঘালয়ে খাসিয়াদের সংখ্যা কয়েক লাখ। তাদের প্রধান ফসল পান-সুপারি। আগে প্রচুর কমলা হতো। কিন্তু এখন সেসব বাগান নষ্ট হয়ে গেছে। গড়ে উঠেছে পান-সুপারি বাগান। খাসিয়াদের প্রায় সবারই ছোট বড় পান-সুপারির বাগান আছে। পেশা হিসেবে জুমই তাদের প্রধান পেশা। সাম্প্রতিককালে গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, আশা ও টিএমএসএস এখানে ক্ষুদ্রঋণ দেয়ায় পেশার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য এসেছে। সরকারের একটি বাড়ি একটি খামারও রয়েছে। অনেকেই দোকান দিচ্ছেন। তাদের দখলীয় সম্পত্তি দু'ধরনের। একটি হচ্ছে খাস জমি অন্যটি এনিমি প্রোপার্টিজ– যা দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত দেয়া হয়। তাদের মূল সমস্যা হচ্ছে বিশুদ্ধ পানি। তারা নিজেরাই ইদারা কেটে পানি সংগ্রহ করে। কিন্তু ফেব্রুয়ারি-মার্চে সেখানেও পানি থাকে না। প্রায়ই কাদাপানি পাওয়া যায়। খাসিয়ারা মাতৃতান্ত্রিক। এ সমাজে সম্পদের মালিক নারী। এখানে খ্রিস্টান ও হিন্দু দু'ধর্মের লোকই রয়েছে। সন্তানরা মায়ের ধর্ম পালন করে। এখানে পানির জন্য ৩টা এগডো রয়েছে। খাসিয়াদের কয়েকজন বললেন, সরকারি উদ্যোগে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা উচিত। অপিন পাত্র বললেন, আমরা সনাতনরা দুর্গাপূজাসহ সব ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করি। যারা খ্রিস্টান তারা গির্জায় যায়। আমাদের মধ্যে ধর্মীয় কোনো বিরোধ নেই। হেডম্যান লেবানন খাসিয়া বললেন, আমরা এ দেশেই জন্মেছি। ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী হয়েও আমরা সমান অধিকার ভোগ করছি। তারাও সরকারের চালু করা বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা পান। তবে মাতৃত্বকালীন ভাতা সম্পর্কে তারা তেমন কিছু জানেন না। তিনি জানালেন, এনজিওরা এ পুঞ্জিতে কাজ করায় তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতাসহ সচেতনতা অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মেরী সোমের; জৈন্তাপুরের একজন বিশিষ্ট নারী ব্যবসায়ী বুরো বাংলাদেশ এর ক্ষুদ্র অর্থায়নে সাজিয়েছেন দোকান

জাফলং এর নতুন সংগ্রাম পুঞ্জির খাসিয়ারা

বাংলাদেশ-ভারতের একটি আন্তঃসীমান্ত নদী ডাউকি নদী যাকে অনেকে জাফলং নদী বলেও ডাকে। নদীটি সর্পিলাকার এবং মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যময়। স্রোতস্বিনী এই নদী দিয়েই মেঘালয়ের পাহাড় থেকে ভেসে আসে বিশাল বিশাল পাথরসহ ক্ষুদ্র পাথর। যা এ দেশের জন্য ব্যাপক অর্থকরী। এই পাথর নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হয়। ভারতের সীমান্ত অংশে নদীর ওপর রয়েছে ঝুলন্ত ব্রিজ যা পর্যটকদের কাছে দারুণ আকর্ষণীয়। এই ডাউকি নদী পাহাড় এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীই জাফলংকে করেছে দেশের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র। আমরা নৌকায় ডাউকি পার হয়ে ওপারের লন্ডন বাজারে উঠি। এ পাশে জাফলং উপজেলা হলেও ওপাশের খাসিয়া পুঞ্জি পড়েছে গোয়াইন ঘাট উপজেলায়। কিন্তু তাদের সকল যোগাযোগ জাফলংকে ঘিরে। এখানকার খাসিয়ারাও হিন্দু এবং খ্রিস্টান ধর্মের। খাসিয়া সম্প্রদায়ের একজন লোক মারা যাওয়ায় হেড ম্যান সর্বা সুচেন সেখানে গিয়েছেন। আমরা তার জন্য অপেক্ষা করি।

এ সময় কথা হয় আলিশা খংলা নামের এক কলেজ ছাত্রীর সাথে। সে সুনামগঞ্জ আম্বরখানা গার্লস কলেজ এর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। তার পিতা শীলং তেনসং এবং মা জোসনা খংলা। বাবা তামাবিলে পাথর ব্যবসায়ী। তাদের সুপারি ও পানের বরজ আছে। তারা ৬ ভাই-বোন। আলিশা জানালো মাতৃপ্রধান এ সমাজে এখন মায়েরা ছেলেদেরও সম্পত্তি দিয়ে থাকে। জানা গেলো নতুন সংগ্রাম পুঞ্জিতে একটি প্রাইমারী স্কুল আছে। হাই স্কুল প্রতিষ্ঠারও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সুদর্শনা খাসিয়া তরুণী আলিয়ার সাথে কথা বলতে বলতেই এ পুঞ্জির হেডম্যান সর্বা সুচেন চলে এলেন। আমাদের আন্তরিকতার সাথে নিয়ে গেলেন তার বাড়িতে। খাসিয়া পুঞ্জি গ্রাম হলেও অত্যন্ত সাজানো-গোছানো শহর। বাড়িগুলো সাজানো-গোছানো পরিপাটি। অনেকটা আধুনিক সভ্যতার

প্রতীক। বাড়িগুলো ইট ও কাঠের বুননে অসাধারণ। প্রতিটি বাড়িই দোতলা। নিচ তলাটা সম্পূর্ণ ফাঁকা। সহকর্মী বিদ্যুত এ বিষয়টির কারণ জানতে চাইলে হেডম্যান বললেন, এটা তাদের ঐতিহ্য। এ ছাড়া এসব এলাকা এক সময় গভীর জঙ্গল ছিল। ফলে বন্য প্রাণীর আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতেই ঘরগুলো মাটি থেকে ওপরে করে সিঁড়ি দেয়া হয়েছে।

সর্বা সুচেন এর বাবার নাম উখুংলম্বা এবং মায়ের নাম বিমলা সুচেন। তিনি এইচএসসি পাস করেছেন। বুদ্ধিদীপ্ত ও হাসিখুশি সর্বা সুচেন জানালেন এ পুঞ্জিতে তাদের ৩৫টি পরিবারে প্রায় ২০০ এর মতো অধিবাসী। জুম চাষই তাদের প্রধান পেশা। পান-সুপারির বাগানই তাদের অর্থনৈতিক প্রধান খাত। সময়ের পরিবর্তনে তাদের পরবর্তী প্রজন্ম শিক্ষিত হয়ে নানা পেশায় যুক্ত হচ্ছে। এখন শিক্ষার হার ৮০% এর ওপরে। তাদের বড় সমস্যা বিশুদ্ধ পানির সমস্যা। এখানে স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই। হাই স্কুলে পড়তে জৈন্তা অথবা গোয়াইন ঘাট যেতে হয়। তাদের পুঞ্জি নিরাপদ ও সংরক্ষিত এলাকা। অন্য কোনো সম্প্রদায়ের মানুষের এখানে বাড়ি করার সুযোগ নেই।

কাঁকন বিবি (মৃত্যু- ২১ মার্চ ২০১৮)
খাসিয়া সম্প্রদায়ের এক বীর মুক্তিযোদ্ধা

সর্বা সুচেন বলেন, জাফলং পর্যটন এলাকা। তাদের পুঞ্জিতেও প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক দেখতে আসে। তাদের সমাজ ব্যবস্থার প্রতি এই আগ্রহ তাকে অনুপ্রাণিত করলেও কেউ কখনো তাদের সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসেন না। তিনি বলেন, গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, কারিতাস, আশাসহ স্থানীয় একটি ক্রেডিট সংস্থা তাদের ঋণ সহায়তা দিয়ে থাকে। সমাজ সচেতন এই হেডম্যান বুরো বাংলাদেশ এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানেন বলে জানালেন। তিনি বলেন, সরকারের উচিত খাসিয়াদের তৈরি পণ্য বাজারজাত করার সুযোগ সৃষ্টি করা। এতে করে খাসিয়াদের অর্থনৈতিক ভিত্তির পাশাপাশি আমাদের কালচার সম্পর্কে অন্যরাও জানতে পারবে।

তারা সরকারের বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতাসহ মাতৃত্বকালীন ভাতা পাচ্ছেন বলে জানালেন। তাদের এখানকার অধিকাংশ জমি এখনো জমিদার জোতদারের। বিঘা প্রতি ৩০০ টাকা করে বন্দোবস্ত নিয়ে অনেকে চাষাবাদ করে থাকেন। তিনি আরো জানান, ডাউকি নদীতে পরিকল্পনাবিহীনভাবে পাথর উত্তোলন করায় তাদের অনেক জমি ভাঙনের শিকার হচ্ছে কিন্তু বাঁধ দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। তিনি অবিলম্ব বাঁধ দেয়ার দাবি জানান।

জেনিতাপতি নামের এক খাসিয়া রমনী নদী ভাঙন, ডাউকি নদীর ওপর ব্রিজ নির্মাণসহ হাসপাতালের দাবি জানান। তিনি বলেন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হলেও আমরা এ দেশের অর্থনৈতিক এবং পর্যটনের অন্যতম শক্তি।

মাধবকুণ্ড খাসিয়া পুঞ্জি

সিলেট থেকে আমরা মৌলভীবাজার জেলার মাধবকুণ্ড খাসিয়া পুঞ্জিতে আসি। মাধবকুণ্ড ঝরনা ও খাসিয়া পুঞ্জির জন্য এটি দেশের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র। প্রতিদিনই দেশ-বিদেশের হাজারো মানুষের পদচারণায় মুখরিত এই মাধবকুণ্ড। মাধবকুণ্ড খাসিয়া পুঞ্জি সত্যিই বৈচিত্র্যপূর্ণ। পাহাড়ের খাজে খাজে ছবির মতো এই গ্রাম বা পুঞ্জি। এই পুঞ্জিতে উঠতে অনেক ধাপ সিঁড়ি ভাঙতে হয়। প্রতিটি বাড়িই আকর্ষণীয়। ইট-কাঠের সম্মিলন ও ডিজাইন বাড়িগুলোকে অনন্য সুন্দর করেছে।

প্রত্যয় টিমের সাথে কথা হলো এই পুঞ্জির হেডম্যান ওয়াম্বর এলগিরিসহ অন্যান্যদের সাথে। তাদের অনেকেই বুরো বাংলাদেশের সদস্য ও ঋণগ্রহীতা। হেডম্যান জানালেন এ পুঞ্জিতে তাদের ৫২ পরিবারের বাস। জনসংখ্যা প্রায় ৩৫০ জন। তাদের প্রধান পেশা জুম চাষ এবং আয়ের উৎস পান-সুপারির বাগান। মাতৃতান্ত্রিক খাসিয়াদের মধ্যে শিক্ষা ও সচেতনতার হার বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন ছেলেরাও মায়ের সম্পত্তির ভাগ পাচ্ছে। তবে এটি নির্ভর করে মায়ের ওপর।

হেডম্যান জানালেন বর্তমানে পানের দাম কমলেও তাদের উৎপাদন ব্যয় কমেনি। বরং বেড়েছে। প্রায় ৪০০/৫০০ ফুট উঁচু দুর্গম এলাকা থেকে পান সংগ্রহ করতে বা পরিচর্যা করতে লেবারদের বেশি টাকা দিতে হয়। ১ কুড়ি পান আগে নামিয়ে আনতে লাগতো ১৫০ টাকা থেকে ২০০ টাকা, এখন সেখানে লাগে ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা।

খাসিয়া পাহাড় একদম খাড়া দাঁড়িয়ে। এই পাহাড়ের পাদদেশ থেকে ১০০/১৫০ ফুট ওপর পর্যন্ত তাদের গৃহ। নিজেদের অর্থায়নেই তারা প্রায়

২৫০/৩০০ ফুট ওপর পর্যন্ত রাস্তা পাকা সিঁড়ি করে নিয়েছেন। বাকি ২০০/২৫০ ফুট এখনো কাঁচাই রয়েছে। পান সারা বছর তোলা গেলেও সুপারি বছরে নভেম্বর/ডিসেম্বর মাসে একবার তোলা হয়। বাগানের ঘাস পরিষ্কার করে তা পুড়িয়ে গাছের গোড়ায় দিলে তা সার হয়ে যায়। পান রোগে অনেক সময় পান নষ্ট হয় তখন তারা ক্ষতিগ্রস্ত হন।

হেডম্যান জানান, তাদের পুঞ্জির মানুষরা বেশ সুখেই আছেন। এখানে একটি প্রাইমারি স্কুল আছে। শিক্ষিতের হার ৮০% এর মতো। তাদের মধ্যে শিক্ষক, নার্স ও কয়েকজন সরকারি কর্মচারী আছে। ৫ জন নটর ডেম কলেজে পড়ছে। তাদের পুঞ্জিতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই, চিকিৎসার জন্য বড়লেখা উপজেলায় যেতে হয়। তিনি জানান, তাদের সমাজ মাতৃতান্ত্রিক হলেও হেডম্যান সবসময় থাকে পুরুষেরা। কারণ, হেডম্যানদের কাজকর্ম বাইরের মানুষের সাথে। সেখানে নারীরা নিরাপদ নাও হতে পারে।

পুরাতন সংগ্রাম পুঞ্জির ভাইবোন ফ্রান্সিস ও নাতালিয়া। ফ্রান্সিস পড়ে ক্লাস ওয়ানে আর ওর ভাষায় নাতালিয়া পড়ে শূন্য ক্লাসে; দুজনেই দুরন্ত– হতে চায় বড় কিছু।

কথা হলো আইরীন রাবন এর সাথে। তার স্বামীর নাম অবণী মারলিয়া। আইরীন প্রাইমারি স্কুলের গন্ডি পেরোতে পারেননি পিতা-মাতার আর্থিক অনটনের জন্য। তাদের ৩ মেয়ে ৪ ছেলে। নিজস্ব জমির পরিমাণ ২ একর। ২০২০ সালে বুরো বাংলাদেশ থেকে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন আইরীন। সে টাকা তিনি জুম চাষে লাগিয়েছেন। নিয়মিত কিস্তি দিচ্ছেন। আইরীন জানালেন, বুরো থেকে ঋণ না নিলে আমাকে ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো।

মেরীসা শামীন, স্বামী জীবনই মারলিয়া। মেরীসা শামীন ৩ একর জমির মধ্যে পান-সুপারির বাগান। তাদের ৪ ছেলে ৪ মেয়ে। তিনি বুরো বাংলাদেশ থেকে ১ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে জুম চাষে বিনিয়োগ করেছেন। তিনি বুরো বাংলাদেশের সহযোগিতায় খুব খুশি।

মারগেট পালে, স্বামী মৃত রিনুস ছুটি। ৫ ছেলে ২ মেয়ে। জমির পরিমাণ ৬ একর। তাদের এক মেয়ে চাকরি করেন। তিনি বুরো বাংলাদেশ থেকে ৮০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন। তার মেয়ে জেসিকা পালে চাকরি করেন। ঋণের টাকায় তিনি জুম চাষ করেছেন।

প্রীত সুম্মান, স্বামী রিবক তালান। তিনি বুরো বাংলাদেশ থেকে ৬০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে জুম চাষে কাজে লাগিয়েছেন। কুইল সুটঙ্গা, স্বামী কেবিল ডু ধ্রুপসানিয়া। তিনি বুরো বাংলাদেশের সদস্য। সঞ্চয়ী হিসাব পরিচালনা করেন। তিনি বলেন, সঞ্চয় হিসাব থেকে ব্যাংকের মতোই প্রয়োজন মুহূর্তে টাকা ওঠাতে পারি।

কাটাজঙ্গল পুঞ্জির লাভলী খংগ্রাম, স্বামী আরনেস লামীন বুরো বাংলাদেশ থেকে ৩০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন। তিনি এটি জুম এর কাজে লাগিয়েছেন। তাদের ১ ছেলে, বয়স ৪ বছর। তিনি বললেন, পুঞ্জির মানুষেরা এখনো তেমন সচেতন নন, তাই প্রত্যেকেরই একাধিক সন্তান। তবে এখন সচেতনতা আসছে। তার স্বামী আরনেস লামিন কাটাজঙ্গল পুঞ্জির হেডম্যান। সেখানে ১৮টি পরিবার বাস করে। জনসংখ্যা প্রায় ১৭০ জন। এমেলিস সুটঙা। বড়লেখা সরকারি ডিগ্রি কলেজের ছাত্রী। এমেলিস সুটঙ্গার ইচ্ছে নার্সিং পড়বে। এতে মানুষের সেবা করতে পারবে। তারা ৫ বোন ও ৩ ভাই। ২ বোনের বিয়ে হয়েছে। তারা প্রথা ভেঙে স্বামীর বাড়িতে থাকছে। সেও শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে বলে জানালো। তার দু'ভাই বিয়ের পর অবশ্য শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। তাদের ইচ্ছা ছোট বোন অপি সুটঙাকে বিয়ে দিয়ে স্বামীসহ তাদের বাড়িতেই রেখে দেবে যাতে তাদের মা-বাবার দেখাশোনা করতে পারে।

এমেলিস সুটঙা জানালো বুরো বাংলাদেশসহ অন্যান্য কয়েকটি এনজিও তাদের পুঞ্জিতে কাজ করায় এলাকার জীবন মানের উন্নয়ন হচ্ছে। তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারছে। তিনি আরো বলেন, আমরা খাসিয়ারা আলাদা থাকতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করি। কোথাও গেলেও আমরা বাসে না উঠে স্কুটার বা রিকশা নেই। এমেলিস জানালেন, খাসিয়ারা খুব পরিশ্রমী। এ সম্প্রদায়ের লোক ভিক্ষাবৃত্তিকে ঘৃণা করে। তিনি আরো বলেন, এ দেশের পান বিদেশে রপ্তানি হয়। এই পানের মধ্যে যে সকল রোগ দেখা দেয় তা নির্মূলে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সহায়তা প্রয়োজন। তিনি এনজিওদের কার্যক্রমকে ইতিবাচক হিসেবে দেখেন। তিনি বলেন, আমাদের সমাজের মানুষ ব্যাংকে যেতে অপছন্দ করে। সেক্ষেত্রে বুরো বাংলাদেশ এর কর্মীরা নিজেরা আমাদের কাছে আসায় সম্প্রদায়ের মানুষ বেশ খুশি।■

মনিপুরীদের জীবনমান উন্নয়নে বুরো বাংলাদেশ

কমলগঞ্জের রানীর বাজার উত্তর ভানুবিল একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। এই গ্রামে ৩৫০টি পরিবার। জনসংখ্যা ৮০০ এর বেশি। এর মধ্যে বাঙালি পরিবার ৩০ এবং অন্যরা মনিপুরী সম্প্রদায়ের। বাঙালিদের মধ্যে সবাই সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। এখানে মনিপুরীরাও সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। মনিপুরী সম্প্রদায়ের নারী ও পুরুষ উভয়েই গৃহ ও মাঠের কর্মের সাথে সম্পৃক্ত। এদের প্রায় প্রতিটি পরিবারই তাঁত শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত। তারা ক্ষুদ্রাকারে কোমড় তাঁতের মাধ্যমে নিজেদের পরিধেয় রঙিন পোশাক ও গামছা তৈরি করে। অনেকে আবার তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতও করে। মনিপুরীদের প্রধান পেশা হচ্ছে কৃষি। শিক্ষিত হয়ে ভালো চাকরি করলেও তারা কৃষিজ উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত। ধান, মরিচ, সরিষা এ এলাকায় ভালো ফলন হয় বলে জানা যায়। পাটও চাষ করেন তারা। তবে মনিপুরীরা বছরে ২ বার ফসল আবাদ করেন। তাদের সম্প্রদায়ে ৩ ফসল নিষিদ্ধ। তাদের জমির হিসাব হয় কোয়ায়। ৩০ শতাংশে ১ কোয়া জমি। উত্তর ভানুবিলের সনাতন বাঙালি ও মনিপুরী সম্প্রদায়ের অনেকেই বুরো বাংলাদেশের ঋণ গ্রহীতা। জানা যায় এ অঞ্চলে ব্র্যাক এবং আশাসহ আরো দুয়েকটি এনজিও কাজ করে থাকে। এদেরই একজন মিনা রানী সিনহা স্বামী সুভাষ চন্দ্র সিংহ। তিনি বুরো বাংলাদেশ থেকে বর্তমানে ২ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছেন। ৮/৯ বছর ধরেই তিনি বুরো বাংলাদেশের সদস্য। তার স্বামী সুভাষ চন্দ্র সিংহ একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক।

মিনা রানী জানালেন, বুরো বাংলাদেশ এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন তাদের জীবন থেকে অনিশ্চয়তা দূর করে দিয়েছে। এক সময় ভাবতেন, অভাবের সংসার কীভাবে চলবে? ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করাতে পারবেন কি না? কিন্তু না, বুরো বাংলাদেশের সহায়তায় তিনি স্বচ্ছলতার মুখ দেখেছেন। তার এক ছেলে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির ছাত্র, আরেক মেয়ে নার্সিংয়ে ভর্তি হয়েছে। সবই তিনি করতে পারছেন বুরোর ঋণ সহায়তার কারণে।

বুরো বাংলাদেশের আরেকজন ঋণ গ্রহীতা কৃষ্ণা রানী সিনহা। স্বামী কৃষ্ণ কুমার সিংহ পেশায় একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। কৃষ্ণা রানী এসএসসি পাস করেছেন। তিনি এবং তার স্বামী উভয়েই কর্মঠ। তারা বেশ স্বচ্ছল। ৭ কোয়ার জমির মালিক। কৃষ্ণা রানী সাহা বুরো বাংলাদেশ থেকে বর্তমানে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন। তিনি এই টাকায় নিজেদের বন্ধকী রাখা জমি অবমুক্ত করেছেন। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ক্ষেত্রেও কাজে লেগেছে। ১ ছেলে বিএ পড়ছে। মেয়ে বিএ পাস করেছে এবং স্বামী সন্তানসহ ইউএসএ রয়েছে।

লক্ষ্মী রানী সিনহা, স্বামী মৃত রসমোহন সিংহ। তার ২ মেয়ে ১ ছেলে। তিনি ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন বুরো বাংলাদেশ থেকে। তাদের ৩ কোয়ার জমি রয়েছে। তার এক ছেলে অমিত কুমার সিংহ সুপ্রিম কোর্টে কম্পিউটার বিভাগে কাজ করে। তাদের এক মেয়ে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং একজন সরকারি কলেজে মাস্টার্স পড়ছে।

রত্না সিনহা। স্বামী ব্রজমোহন সিংহ। তিনি নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন। বুরো বাংলাদেশের ঋণে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটেছে। তাদের জমি রয়েছে ২ কোয়ার। নিজেরাই চাষবাস করেন। কোমড় তাঁত দিয়ে প্রয়োজনীয় কাপড় তৈরি করেন।

পদ্মাবতী সিনহা। স্বামী স্বপন সিংহ। এসএসসি পাস। ২ ছেলে; একজন ক্লাস ফাইভে পড়ে। স্বপন সিংহ একটি চা বাগানের ওষুধ ফার্মেসির কম্পাউন্ডার। পদ্মাবতী বললেন, একসময় পিতা-মাতার আর্থিক সামর্থ্য ছিল না, তাই পড়তে পারিনি। মেয়েকে পড়াব।

তুলসী সিনহা, স্বামী কীর্তিজৎ সিংহ। তুলসী পড়াশোনা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। স্বামী একটি রাইস মিলে কাজ করে। তবে তাদের মূল পেশা কৃষি কাজ। তিনি বুরো বাংলাদেশ থেকে ৪০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে গাভি কিনেছেন। তাদের ২ ছেলে ১ মেয়ে। ছেলে বাদল সিংহ সুপ্রিম কোর্টে চাকরি করেন।

জয়ন্তী রানী সিনহা, স্বামী বিকাশ চন্দ্র সিংহ। শিক্ষা ও সম্পদে বেশ স্বচ্ছল পরিবার। জয়ন্তী রানী সিনহার পিতা কুঞ্জ বাবু সিংহ একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। জয়ন্তী রানী সিনহা অত্যন্ত দৃঢ়চেতা নারী। তিনি বুরো বাংলাদেশ থেকে ১ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে নিজেদের গরুর খামার বড় করেছেন। বিকাশ সিলেট এমসি কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে বিআরডিবিতে চাকরি করছেন। তার আরেক ভাই সুবাস চন্দ্র সিংহ স্থানীয় আব্দুল গফুর চৌধুরী কলেজে অধ্যাপনা করেন।

এই পরিবারের জমির পরিমাণ ১০ কোয়ার। জয়ন্তী রানী সিনহার মেয়ে ঐশী সিনহা মৌলভীবাজার সরকারি কলেজে অনার্সের ছাত্রী। ঐশী সিনহা বুরো বাংলাদেশ থেকে উপবৃত্তি পেয়েছে। ছেলে সন্দীপ সিংহ তেতুইগাঁও রশিদউদ্দিন হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র।

বিকাশ চন্দ্র সিংহ জানালেন, মনিপুরীরা পড়াশোনায় বেশ অগ্রগামী। তিনি বলেন, এই সম্প্রদায়ের একজন প্রধান বিচারপতি ছিলেন। সচিবালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদসহ সরকার ও বিভিন্ন সংস্থায় মনিপুরীদের অনেকেই কাজ করছেন। বিদেশেও রয়েছেন অনেকে। বিকাশ চন্দ্র সিংহ বলেন, বুরো বাংলাদেশসহ এনজিওদের সহযোগিতায় এই প্রত্যন্ত গ্রামের মনিপুরীদের ভাগ্য বদলে যাচ্ছে।

সনাতন ধর্মের জেলে সম্প্রদায়

এ গ্রামে সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী জেলে সম্প্রদায়ের ৩০টি পরিবারের বাস। এদের মধ্যে প্রবাসিনী বিশ্বাস, স্বামী সুবল বিশ্বাস প্রায় ১০ বছর ধরে বুরো'র গ্রাহক। তিনি ৭৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে মাছের চাষসহ দোকান করেছেন। বড় ছেলে ডিগ্রিতে পড়ে।

সানুকা রানী বিশ্বাস, স্বামী দ্বিপেন্দ্র বিশ্বাস বুরো বাংলাদেশ থেকে ৪০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে দোকান করে স্বচ্ছলতার মুখ দেখেছেন।

বিমলা বিশ্বাস, স্বামী ধীরেন্দ্র বিশ্বাস বুরো থেকে ১ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছেন। তিনি এ টাকায় ঘর তৈরি ও ব্যবসার কাজে লাগিয়েছেন। তাদের ৫ সন্তান। বুরো বাংলাদেশের ঋণ সহায়তায় তারা এখন স্বচ্ছল জীবনযাপন করছেন।

কল্পনা বিশ্বাস, স্বামী রডি বিশ্বাস। বুরো বাংলাদেশ থেকে ১৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে সেলাই মেশিন কিনেছেন। চলার মতো আয় হচ্ছে।

অঞ্জনা বিশ্বাস, স্বামী সুশীল বিশ্বাস বুরো বাংলাদেশের একজন সঞ্চয় হিসাবধারী। তিনি সপ্তাহে ২০০ টাকা করে সঞ্চয় করেন। প্রয়োজন মতো টাকা লেনদেন করতেন পারেন।

অর্পিতা বিশ্বাস, স্বামী দিলীপ বিশ্বাস। সন্তানদের মধ্যে একজন সপ্তম শ্রেণী, একজন পঞ্চম শ্রেণী এবং এক জন প্রথম শ্রেণীতে। ঋণ নেননি। সাপ্তাহিক সঞ্চয় ১০০ টাকা করে। বাজারে মিষ্টির দোকান। বুরো থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসার বিস্তৃতি ঘটাতে চান।

রেখা বিশ্বাস, স্বামী অমূল্য বিশ্বাস বুরো বাংলাদেশ থেকে ১৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে একটি মনোহরী দোকান সাজিয়েছেন। তার ২ মেয়ে। এক মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন। অন্য মেয়ে এইচএসসির ছাত্রী।

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার উত্তর ভানুবিল গ্রামের গৃহিণী পদ্মাবতী সিনহা ও তার ছেলে তীর্থ সিংহ। মনিপুরী নারীদের উপাধি 'সিনহা' আর পুরুষদের 'সিংহ'। তীর্থ-এর বয়স ২ বছর। পদ্মাবতীর স্বামী জঙ্গলবাড়ি চা বাগানে কাজ করেন। মনিপুরীরা সাধারণত চা বাগানে কাজ করেন না কিন্তু পদ্মাবতীর স্বামী ব্যতিক্রম। তবে কৃষি কিংবা চাকরি, পেশা যাই হোক না কেন, প্রতিটি মনিপুরী বাবা-মা-ই চেষ্টা করেন সন্তানের উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিত করার। তীর্থ সিংহের মা পদ্মাবতীও বললেন, ছেলেকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন তিনি।

কৃষ্ণ কুমার সিংহ। অবসরপ্রাপ্ত হাই স্কুল শিক্ষক। দীর্ঘ ৩৪ বছর বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন শমসের নগরের উস্তয়ার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে। তার ১ ছেলে ১ মেয়ে। ছেলে চাকরি করেন বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টে আর মেয়ে স্বামীর সাথে থাকেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তাদের মতো অধিকাংশ মনিপুরীই কর্মক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে, যার প্রভাব চোখে পড়ে মনিপুরীদের আর্থ-সামাজিক দৃশ্যপটে।

রীতা বিশ্বাস, স্বামী তরণী বিশ্বাস। তিনি ৩০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন বুরো বাংলাদেশ থেকে। তিনি তার স্বামীর কাপড়ের দোকানে এই টাকা কাজে লাগিয়েছেন। এতে তাদের আয় ভালো হচ্ছে। তাদের ১ মেয়ে কলেজে পড়ছে এবং ১ মেয়ে ও ছেলে স্কুলে পড়ছে।

দীপা বিশ্বাসের স্বামী সুদাম বিশ্বাস টেম্পো চালক। তিনি ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে টেম্পোর মেরামত করিয়েছেন। ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করছে।

বুরো বাংলাদেশ এগিয়ে যাবার বন্ধু

জেলে পল্লীর এসব সদস্যরা এখন নিদেজের সম্পর্কে সচেতন। তারা নিজেরা পড়াশোনা করতে পারেননি, কিন্তু সন্তানদের শিক্ষায় শিক্ষিত করছে। নিজেদের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ে সচেতন হয়েছে। তারা জানায়, এক সময় তাদের জীবনযাপন ছিল অসচ্ছল, বাস করতে হতো অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। বুরো বাংলাদেশ এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও সচেতনতা তৈরির কার্যক্রমে তারা বেশ উপকৃত হয়েছে। তারা জানালেন, বুরো বাংলাদেশ তাদের এগিয়ে যাবার বন্ধু।

মনিপুরী সম্প্রদায় উন্নত জনগোষ্ঠী

এ গ্রামের মনিপুরীরা বেশ শিক্ষিত এবং আর্থিক-ভাবে সচ্ছল। গ্রামের বাবু সেনা সিংহ জানালেন, তার ভাতিজা পদ্মাসন সিংহ বর্তমানে বানিয়াচং উপজেলার ইউএনও। তিনি নিজেও ১৯৭৮ সালে এসএসসি পাস করেছেন। এ পরিবারের একজন ডা. বীনা পানি সিনহা সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজের লেকচারার। শিউলী রানী সিনহা ব্র্যাক এ চাকরি করেন। তিনি আরো জানান, সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা মনিপুরী সম্প্রদায়েরই মানুষ।

আরো জানা গেলো, মনিপুরীদের মধ্যেও গোত্র বিশেষে কালচারের ভিন্নতা রয়েছে। এরা হচ্ছে মনিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়া, মনিপুরী মৈথি এবং মনিপুরী পাঙান। তারা প্রত্যেকেই সংস্কৃতিপ্রিয়। মনিপুরী নাচ পৃথিবী বিখ্যাত। মনিপুরীরা মাংস খান না– এটি তাদের ধর্মে নিষেধ রয়েছে। তারা পেঁয়াজ, রসুনও খান না।

বাংলাদেশে মনিপুরীদের সংখ্যা ২২,৯৭৮। মনিপুরীরা এ দেশে জনগোষ্ঠীর দিক থেকে স্বল্প হলেও ভারতে তারা জনসংখ্যার দিক থেকে অনেক, তাদের নিজেদের রাজ্যের নাম মনিপুরী রাজ্য। সাংস্কৃতিকভাবে তারা বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত। বিশেষ করে মনিপুরী নৃত্য দেশে ও বিদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়। মনিপুরী সম্প্রদায়ের অনেকেই জানালেন, বুরো বাংলাদেশসহ এনজিওরা তাদের জীবনমান উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।■

স্নিগ্ধা ও চেষ্টা তঞ্চঙ্গ্যা

স্নিগ্ধা ও চেষ্টা তঞ্চঙ্গ্যা

তঞ্চঙ্গ্যা মানে ধনুক যোদ্ধা। রাজার হয়ে যে সেনারা ধনুক দিয়ে যুদ্ধ করতো তারাই এক সময় তঞ্চঙ্গ্যা হিসেবে পরিচিত লাভ করে। স্বতন্ত্র পরিচয় লাভ করার আগে তঞ্চঙ্গ্যারা চাকমাদের সাথে একীভূত ছিলো। চাকমা অংশকে বলা হতো 'আনুক্কা চাকমা' আর তঞ্চঙ্গ্যাদের ডাকা হতো 'তঞ্চঙ্গ্যা চাকমা' বলে। বান্দরবানের রেইসা নদীর কাছে একটি তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামের নাম সাতকমল। এই গ্রামের দুই বোন স্নিগ্ধা ও চেষ্টা তঞ্চঙ্গ্যা। স্নিগ্ধা পড়ে ক্লাস ফাইভে, রোল ১। আর চেষ্টা শিশু শ্রেণিতে, বয়স ৫। ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন নিয়েই নিয়মিত স্কুলে যায় স্নিগ্ধা। পাহাড়ি গ্রামে ডাক্তারের বড্ড অভাব। ক্লাসের সেরা ছাত্রী সে। বললাম, ডাক্তার হতে হলে ইংরেজিতেও সেরা হতে হবে। হেসে সায় দিলো স্নিগ্ধা। ছোট বোন চেষ্টা চায় মানুষ গড়ার কারিগর হতে। বড় হয়ে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে চায় সাতকমলের মতো পাহাড়ি গ্রামগুলোতে।

দুই বোনের দুই রকম দৃষ্টিভঙ্গি। আবার মিলও আছে। দুজনেই ছবি আঁকতে ভালোবাসে। ছবি আঁকার খাতাও ওরা খুলে দেখালো আমাদের। স্নিগ্ধার আরো একটি গুণ আছে। সে গান গায়। বাংলাদেশ বেতারের অনেকগুলো অনুষ্ঠানে গান গেয়েছে সে। স্নিগ্ধা ও চেষ্টার মতো নিভৃত গ্রামের কন্যা শিশুরাই সকল প্রতিবন্ধকতা ঠেলে পাহাড় ও সমতলের এই সবুজ ভূখণ্ডকে এক দিন আলোকিত করবে তাতে সন্দেহ নেই। তবুও বেড়ে ওঠার এই দিনগুলোতে সামান্য একটু বেশি সুযোগ বহুগুণে বাড়িয়ে দিতে পারে ওদের সেই সম্ভাবনাকে।

দিন বদলাচ্ছে বান্দরবানের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর

রূপবৈচিত্র্যে ভরপুর বাংলাদেশের তিনটি পার্বত্য জেলার একটি বান্দরবান। পাহাড়, নদী ও ঝরনার আনন্দ উচ্ছ্বল উপস্থিতিতে অপরূপ সুন্দর এর মনকাড়া প্রকৃতি। জেলার নৃগোষ্ঠীদের মধ্যে মারমা, চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, মুরং, ত্রিপুরা, খেয়াং, খুমি, লুসাইরা অন্যতম। জেলার প্রধান নদী সাঙ্গু ও মাতামুহুরী। বান্দরবান জেলার দক্ষিণে আরাকান (মায়ানমার) এবং পূর্বে চীন প্রদেশ (মায়ানমার)। বাংলাদেশের সুউচ্চ পাহাড় কেওক্রাডং এ জেলায় অবস্থিত। জেলার লোকসংখ্যা প্রায় ৫ লাখ। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অনেকেই দেশের মূল ধারার উন্নয়ন হতে বঞ্চিত ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন খাতের উদ্যোগে কর্মসুবাদে উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী। বৃদ্ধি পাচ্ছে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

লাইসীপাড়ার বম জনগোষ্ঠী

পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম নৃগোষ্ঠী বম'রা মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত। বম শব্দের অর্থ হলো বন্ধন। জীবনের যাবতীয় কর্ম, শিকার পর্ব, নৃত্যগীত, পানাহার, দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ নিবেদন সবকিছুই একত্র হয়ে সম্মিলিতভাবে সম্পাদন করার রীতি থেকেই বম ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের মিজোরাম রাজ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বমদের বাস। বমরা ছিল প্রকৃতি পূজারী। ১৯২৭ সালে বান্দরবানে বসবাসকারী বম জনগোষ্ঠীর সকলেই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। বমদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে তবে আগে পৃথক বর্ণমালা ছিল না। সাম্প্রতিককালে রোমান হরফে বাইবেলসহ বম ভাষার নানা উপকথা, গীতি কবিতা, লোক সঙ্গীত প্রভৃতি লেখা হচ্ছে।

২০২২ সালের জরিপ অনুযায়ী বান্দরবানে ১৩ হাজার বম জনগোষ্ঠীর বাস।

বমরা শানফ্লা, লসিং ও ডইট্রাং এই তিনটি গোত্রে বাস করে। রুমাতেই এদের সংখ্যা বেশি। খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করায় তাদের রীতিনীতি কালচারের কিছু পরিবর্তন ঘটলেও বৈশাখীসহ বিভিন্ন উৎসবের প্রচলন এখনও রয়েছে। কিছু সংখ্যক বম বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। বজ্রের গর্জনকে তারা মনে করেন ঈশ্বরের বন্দুকের আওয়াজ। অতীতে বমরা ঈশ্বরকে খাজিং বলত। তারা একটি মোরগ হত্যা করে 'কর্নবুল' নামে এক ভূতের পূজা করত।

বমরা কমলা, আনারস, কলা, কাঁঠাল ইত্যাদি লাভজনক ও অর্থকরী ফসল ফলায়। নদী ও ছড়াগুলোতে মাছ ধরে। পুকুরে মাছের চাষ করে। তাদের অনেকে ক্ষুদ্র কুটির ও হস্তশিল্প গড়ে তুলেছে। বমদের পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে সম্পত্তির বৃহৎ অংশ পায়। তাদের সমাজে মৃতদেহ স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে মুখমণ্ডল রং করা হয়। ঘরের পার্শ্ববর্তী জায়গায় কবর খুঁড়ে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়। বমদের পাড়ার প্রধানকে বলা হয় কারবারী। আর মৌজা প্রধান হচ্ছেন হেডম্যান। প্রতি তিন বছর পর পর 'কারবারী' নির্বাচন করা হয়। এ ছাড়া তাদের পাড়ায় যে সমিতি রয়েছে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তাতে সভাপতি ও সহসভাপতি পদেও নির্বাচন করা হয়।

প্রত্যয় টিম বান্দরবানের লাইসীপাড়ায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত বমদের মুখোমুখি হয়। বমরা ভদ্র, শিক্ষিত এবং অতিথিপরায়ণ। লাইসীপাড়ায় ৯৩টি বম পরিবারের জনসংখ্যা প্রায় ৫০০ এর বেশি। এদেরই একজন জ্যাথাং শিয়ান, পিতা থাউ শিয়ান। জ্যাথাং শিয়ান এসএসসি পাস। তিনি বুরো বাংলাদেশ থেকে ১ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে আম বাগানসহ জুম চাষে কাজে লাগিয়েছেন। এক মৌসুমে ৪ থেকে সাড়ে ৪ লাখ টাকা আয় হয়। কর্মঠ জ্যাথাং শিয়ান ও তার স্ত্রী নিজেদের কাজ শেষে অন্যের বাগানেও কাজ করেন। তিনি জানান, এখানে এখন কমলা চাষ খুব হয় না। কারণ কমলার জন্য ঠাণ্ডা জায়গা লাগে।

বমদের মধ্যে অন্য ধর্মে বিবাহ নিষিদ্ধ। পাহাড়িয়া অন্য জাতিগোষ্ঠীর যদি এক ধর্মের হয় তবে বিবাহ চলে। বমরা নারী-পুরুষ উভয়েই জুম চাষ করে থাকে। তারা পরিশ্রমী। তারা পেঁপে, আনারস, কলা, আম, পাইনা গোল্লা চাষ করে। লাইসীপাড়ায় প্রাইমারি স্কুল আছে, কোন হাই স্কুল নেই। মাধ্যমিক পড়ার জন্য তাদের ৮/৯ কিলোমিটার দূরে বান্দরবান শহরে যেতে হয়। কিন্তু যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধা না থাকায় সেখানে অবস্থান করে লেখাপড়া চালাতে হয়। CNG-তে গেলে প্রতিদিন একজনকে ২০০ টাকা যাতায়াত ব্যয় বহন করতে হয়। এই পাড়াসহ বমদের সকল পাড়াতে একটি ম্যানেজমেন্ট কমিটি রয়েছে। ১৭ জনের এই কমিটি তাদের সমাজকে পরিচালনা করে। বিচার-আচার ও সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করে।

বমদের মধ্যে এখন শিক্ষার হার বাড়ছে। তাদের বাড়িঘর যথেষ্ট পরিপাটি, সাজানো-গোছানো। পাহাড়ের ঢালে ঢালে তারা দলবদ্ধভাবে বাড়ি করতে পছন্দ করে। বমরা আলাদা বা বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও কেউ বাড়ি করে না।

বমদের মধ্যেকার এক তরুণ লাল দত সং বম। বান্দরবান সরকারি কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি নিয়েছেন। ২০১৭ সালে তিনি একটি এনজিওতে কাজ করতেন। এই এনজিওটি ভিয়েনা মেডিকেল কলেজ এর সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এরপর তিনি ঢাকার আইসিডিডিআর,বি এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। বর্তমানে তিনি বুরো বাংলাদেশ এর একজন সফল ঋণ গ্রহীতা। প্রথমে ৬০ হাজার এবং পরে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন। তার একটি ফার্মেসি রয়েছে।

লালদত সং বম জানালেন, তাদের নারীদের মধ্যে এক সময় ফ্যামিলি প্ল্যানিং সম্পর্কে ধারণা ছিল না। এখন তারা যথেষ্ট সচেতন। সন্তান ২ জনেই সীমাবদ্ধ রাখছেন। জানা যায়, এক সময় এ এলাকায় ওয়ার্ল্ড ভিশন এনজিও বম সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করেছে।

কথা হলো সাপদহ্ বম এর সাথে। তিনি ১ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছেন বুরো বাংলাদেশ থেকে। এই অর্থে তিনি কৃষি কাজ যেমন আম, আনারস, আদা, লিচু আবাদ করেছেন, অন্যদিকে ছাগলও পালন করছেন। তিনি জানান, বর্তমানে তার অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ ভালো।

লাইসীপাড়ার কমিউনিটি সেন্টারে প্রায় ২৫ জন বম নারী পুরুষ একত্র হয়েছিলেন প্রত্যয় টিমের সাথে কথা বলার জন্য। তারা বললেন, আনারস ও আমের প্রায় ৩০% পচে যায় সংরক্ষণের অভাবে। এ জন্য তাদের দাবি এলাকায় আনারস ও ম্যাঙ্গো জুস কারখানা এবং কোল্ড স্টোরেজ প্রতিষ্ঠা হলে অর্থনৈতিকভাবে ব্যাপক লাভবান হওয়া সম্ভব হতো। তারা আরো দাবি জানায়, পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন ব্যাংক ও এনজিওদের অর্থায়নের ক্ষেত্রে সুদহার কিছু হ্রাস করা উচিত। বমদের মধ্যে কেউ প্রবাসে নেই। সরকারি চাকরিও খুব হয় না। তাদের মধ্যে কেউ ভিক্ষাবৃত্তি করে না। তারা অতিথিপ্রিয় জাতি। শিক্ষিত হয়ে তাদের অনেকে পেশার পরিবর্তন করেছেন।

আলোচনাকালে তাদের কেউ কেউ বললেন, বান্দরবানের প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং পাহাড় শোভিত বিভিন্ন স্থাপনা বনসহ অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর বাড়িঘর, সংস্কৃতি, দেশি বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করে থাকে। সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের উচিত তাকে সেভাবে তুলে ধরা। পাশাপাশি নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে সংরক্ষণের জন্য পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন শিক্ষায়াতন প্রতিষ্ঠা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ। এখানে কৃষিজ উৎপাদনের প্রতিও গুরুত্ব দেয়া উচিত। ■

বান্দরবানের লাইসীপাড়ার নিজের বাড়ির সাথেই লালদত সংবম'র একটি ফার্মেসি আছে। ওষুধ ব্যবসার লাইসেন্স রয়েছে তার। এই ফার্মেসি থেকেই ওষুধ কিনেন লাইসী-পাড়াসহ আশপাশের জনবসতির মানুষেরা। আমরা যখন লালদত সংবম এর ফার্মেসিতে গেলাম তখন তার মেয়ে ওখানে বসেই স্কুলের পড়া তৈরি করছিল।

বৃদ্ধি পাচ্ছে মারমাদের কর্মসংস্থান

মারমারা মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। জনসংখ্যার দিক থেকে মারমারা বাংলাদেশের দ্বিতীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী। মারমাদের সংখ্যা ২ লক্ষ ২৪ হাজার ২৬১। তিন পার্বত্য জেলায় বসবাস হলেও মূল জনগোষ্ঠীর অধিকাংশের বাস বান্দরবানে। ভারত ও মায়ানমারে মারমা সম্প্রদায়ের আরো প্রায় ৭০ হাজার জনগোষ্ঠী রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মারমারা মিয়ানমার থেকে আসায় 'ম্রাইমা' নাম থেকে নিজেদের মারমা নামে ভূষিত করে। তাদের নিজেদের ভাষা ও বর্ণমালা আছে। মারমা সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। তবে পুরুষদের সাথে মেয়েরাও পৈতৃক সম্পত্তির সমান উত্তরাধিকারী। মারমাদের প্রধান খাদ্য ভাত। তাদের প্রতি মৌজায় গোত্র প্রধান হচ্ছে হেডম্যান। তারা ধান, মরিচ, আনারস, কলা, তুলা চাষাবাদ করেন। বান্দরবানের মারমারা মূলধারার সাথে তাল মিলিয়ে নিজেরাও শিক্ষাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নতি করেছেন। তারা জানান, সরকারের পাশাপাশি এনজিওরা সহায়তা করছে বলেই তারা উন্নতি করতে সক্ষম হচ্ছেন।

বান্দরবান হানসামাপাড়ার মারমা জনগোষ্ঠী

হানসামাপাড়ার থুই প্রু মারমা ১৯৯৯ সালে এইচএসসি পাস করেছেন। তাদের

১ ছেলে ১ মেয়ে। মেয়ে এসএসসি দেবে, ছেলেটি অষ্টম শ্রেণীতে। থুই প্রু মারমা বুরো বাংলাদেশ থেকে ১ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছেন। তিনি এই টাকা চাষাবাদ ও দোকানের কাজে লাগিয়েছেন। তিনি জানান, ঋণের অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করে বেশ উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রথিমু মারমাও এসএসসি পাস। তিনি বুরো বাংলাদেশ থেকে ঋণ নিয়ে মাছ চাষ, কলার বাগান ও দোকান করেছেন। এতে তার সংসার এখন বেশ স্বচ্ছল। সমস্যার কথা বলতে গিয়ে প্রথিমু বললেন, এ অঞ্চলে পানির সমস্যাই প্রধান। পানির লেয়ার ৬০০ ফুট গভীরে। তিনি বললেন, পার্বত্য অধিবাসীদের জন্য সরকারের পানি সরবরাহের উদ্যোগ নেয়া উচিত।

বুরো বাংলাদেশ থেকে ঋণ নিয়ে এই জনগোষ্ঠীর অনেকেই আত্মকর্মসংস্থানসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। শিসই চিং মারমা ১ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে ট্রাক্টর ক্রয় করেছেন। ক্যাসিংশৈ মারমা বুরো বাংলাদেশের ঋণে উন্নত জাতের আঁখ চাষ করে লাভবান হয়েছেন। ক্যথুইচিং মারমা ২ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে গরুর খামার ও ফলের বাগানে কাজে লাগিয়েছেন।

বুরো বাংলাদেশ এর প্রায় ৩০ জন ঋণ গ্রহীতা আমাদের সাথে কথা বলেন। তাদের প্রত্যেকেরই অভিব্যক্তি, আগে তারা দেশের মূলধারার জনপদ থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন ছিল। বুরো বাংলাদেশসহ বিভিন্ন এনজিওরা তাদের আর্থ-সামাজিক সহযোগিতা করায় তারা ইতোমধ্যে উন্নয়নের কাতারে সামিল হতে পেরেছে। শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্যসম্মত বাথরুম, বিশুদ্ধ পানীয় জল ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। এনজিওদের উন্নয়ন কর্ম তৎপরতায় তাদের জীবন মানের অনেক পরিবর্তন সম্ভব হচ্ছে।

সুযোগ পেলেই ফুটবল খেলে মারমা শিশুরা। উ সিং শৈ, উ টি মং, উ মং সাই, শৈথায় উং, উ মং সাই, মং শৈ সিং হানসামাপাড়ার ক্ষুদে মারমা ফুটবলারদের কয়েকজন।

প্রত্যয় টিমের সাথে এই নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা কেউ কেউ জানান, পাংখুং, পাইক, ক্যাপা ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মারমা সমাজে জনপ্রিয়। তাদের প্রধান উৎসব ও পার্বন হচ্ছে– সাংগ্রাইপোয়ে ও ওয়াতো পোয়ে, ওয়াগোয়েই পোয়ে এবং পইংজ্রা পোয়ে। তারা বললেন, আমাদের এই সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও ইতিহাস-ঐতিহ্যকে দেশের মূল ধারার সাথে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। তাহলে দেশের অন্যান্যরাও মারমাদের জীবনাচার ও জীবনজীবিকা সম্পর্কে জানতে ও সহযোগিতার হাত বাড়াতে পারবে।

উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে মারমা-বাংলা অভিধান প্রকাশিত হয়েছে। এটি সংকলন করেছেন স্কুল শিক্ষক জুয়েল বড়ুয়া। এতে মারমা ভাষার শব্দগুলো মারমা ও বাংলা বার্ণে লেখা হয়েছে এবং মারমা শব্দের বাংলা অর্থ দেয়া হয়েছে। এই উদ্যোগ বাংলাভাষী ও মারমাদের মধ্যে নতুন সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে।■

সুখে আছে তঞ্চঙ্গ্যাঁরা

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে তঞ্চঙ্গ্যাঁরা অন্যতম। জনসংখ্যার দিক থেকে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে এরা ৫ম। জনসংখ্যা প্রায় ৪৬ হাজার। এরা নিজেদের 'তঞ্চঙ্গ্যাঁ' ভাষায় কথা বলে। মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভুত তঞ্চঙ্গ্যাঁ জনগোষ্ঠীর ভাষা ভারতীয় আর্য ভাষার অন্তর্গত পালি, প্রাকৃত এবং আদি বাংলা ভাষার মিশ্রনে সৃষ্ট তঞ্চঙ্গ্যাঁ ভাষা। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও কক্সবাজার জেলায় এই জনগোষ্ঠীর বসবাস। ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম, মনিপুর এবং মায়ানমারের আরাকান রাজ্যেও তঞ্চঙ্গ্যাঁদের বসতি আছে। তাদের মূল পেশা জুম চাষ। বিভিন্ন টিলায় বাগানও করেন কেউ কেউ। বর্তমানে শিক্ষার হার বাড়ায় অনেকেই সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। তঞ্চঙ্গ্যাঁরা বিয়েকে সাঙ্গা বলে। তাদের মধ্যে বিধবা বিয়ের প্রচলন আছে।

সাতকমল পাড়া, বান্দরবান

প্রত্যয়ে বান্দরবানের আদিবাসীদের সাম্প্রতিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটি খণ্ডচিত্র তুলে ধরার জন্য প্রত্যয় টিম গত ১৯ অক্টোবর বান্দরবান আসি। বুরো বাংলাদেশ এর সেখানকার কর্মকর্তারা আমাদের নিয়ে বান্দরবান উপজেলার বান্দরবান সদর ইউনিয়নের রেইসা গ্রামের সাতকমল পাড়া নিয়ে যান। এই পাড়ায় তঞ্চঙ্গ্যাঁদের ১২০ পরিবারের বাস। তাদের সমাজ ব্যবস্থায় এলাকা প্রধান হলেন 'কারবারী' এবং মৌজা প্রধান হলেন 'হেডম্যান'। এ এলাকার কারবারী হচ্ছেন সুনীল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যাঁ। বার্মিজ ভাষায় তঞ্চঙ্গ্যাঁ শব্দের অর্থ যোদ্ধা। তঞ্চঙ্গ্যাঁরা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা অনুসরণ করে। মেয়েরা পিতার সম্পত্তি পায় না। তবে সাম্প্রতিককালে অনেক বাবাই মেয়েদেরও সম্পত্তি দেন। ধর্মীয়ভাবে এরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। মাছ, মাংস সবই খান। জুম চাষ তাদের প্রধান পেশা। ধান, হলুদ, আনারস, আদা, কলা, মাল্টা, আম, কচু ইত্যাদি তাদের প্রধান ফসল। তবে শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটায় পেশার পরিবর্তন ঘটেছে, অনেকেই চাকরি বা ব্যবসা করছেন। তাদের অধিকাংশেরই নিজস্ব জমির দখলস্বত্ব রয়েছে। তবে সাধারণত এসব জমি ক্রয়-বিক্রয় হয় না। এদের বিয়ে একই সম্প্রদায়ের মধ্যে একই ধর্মে হয়। পারিবারিক জীবনে এরা শান্তিপ্রিয়। নারী নির্যাতনের ঘটনা খুব একটা ঘটে না।

তঞ্চঙ্গ্যাঁদের সংখ্যা প্রায় ৪৬ হাজার। এদের পড়াশোনার হার ৫০% এর উপরে। অধিকাংশই হাই স্কুল ও প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত পড়েছে। উচ্চ শিক্ষিতও আছে। তঞ্চঙ্গ্যাঁদের অনেকেই জানালেন, অতীতে তাদের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বিষয়ে এতো সচেতনতা ছিল না। শিক্ষা সম্পর্কেও তারা ছিল পশ্চাৎপদ। এনজিওরা এ এলাকায় কাজ করার ফলে তাদের মধ্যে জীবন যাপন সম্পর্কে গুরুত্ব এসেছে। তারা নিজেরা তেমন শিক্ষা নিতে না পারলেও সন্তানদের শিক্ষিত করছেন।

সাতকমলপাড়ায় ১২০টি তঞ্চঙ্গ্যাঁ পরিবারের বাস। অতীতে জুম চাষে তাদের তেমন কোনো ট্রেনিং ছিল না। এখন অনেকেই সরকারের কৃষি বিভাগের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আধুনিক ও উচ্চ ফলনশীল ফসল আবাদ করছেন। সাতকমলপাড়ায় একটি উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে। কারবারী সুনীল কান্তি তঞ্চঙ্গ্যাঁর জমির পরিমাণ ১০ একর। সেখানে আমের বাগান ও সেগুন বাগান করেছেন। তার বড় ছেলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স পড়ছে। মেঝ ছেলে ডিগ্রিতে পড়ছে এবং ছোট ছেলে ইলেক্ট্রিশিয়ান হিসেবে কাজ করছে।

তিনি জানান, তাদের প্রধান সমস্যা পানি। ঝরনা থেকে খাবার পানি সংগ্রহ

করতে হয়– যা অনেক দূরে। বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানির ওপর নির্ভর হতে হয়। তাদের সম্প্রদায়ের অনেকে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা এবং মাতৃত্বকালীন ভাতা পাচ্ছেন। তিনি জানালেন, শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা চাকরি পাচ্ছে না– এটা তাদের বড় দুঃখ।

এখানে বুরো বাংলাদেশের ক্ষুদ্র অর্থায়নসহ আর্থ-সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রমে তারা বেশ কৃতজ্ঞ। জানা গেল, এখানে ইউনিসেফ এর কার্যক্রম রয়েছে। তারা শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। একজন মহিলা শিক্ষকও রয়েছে। এ গ্রামটিতে বুরো বাংলাদেশ এর পেশাজীবী ঋণ, কৃষিঋণ ও প্রবাসী ঋণ কার্যক্রম রয়েছে।

কথা হলো নিকা তঞ্চঙ্গ্যাঁ ও তার স্বামী থোয়াইচিং মারমা'র সাথে। নিকা এসএসসি পাস। তিনি বুরো বাংলাদেশ থেকে ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন। তারা রেইসা বাজারে ২টি দোকান পরিচালনা করেন। নিকা বললেন, আগে এ পাড়ার মানুষের অবস্থা এতো স্বচ্ছল ছিল না। পড়াশোনায়ও পিছিয়ে ছিল এখানকার মানুষ। বুরো বাংলাদেশ এর ঋণ সহায়তায় তারা ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছেন। বাড়িতে কোমড় তাঁতও আছে। তার স্বামী রাঙামাটি যুব উন্নয়নে চাকরি করছেন। বুরো বাংলাদেশ এর প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

এসএসসি পাস জানি তঞ্চঙ্গ্যাঁ অটো চালক। বুরো বাংলাদেশ থেকে তার নেয়া ঋণের পরিমাণ ২ লাখ টাকা। তিনি টাকা দিয়ে বাড়ি মেরামত ও গাড়ির কাজে লাগিয়েছেন। তার স্ত্রী বেহুলা খুব ভালো পোশাক তৈরি করতে পারেন। এতে তাদের সংসারে আর্থিক স্বচ্ছলতা বদ্ধি পেয়েছে।

সুজাতা তঞ্চঙ্গ্যাঁ, স্বামী নেয়াধন তঞ্চঙ্গ্যাঁ। তিনি বুরো বাংলাদেশ থেকে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন। তাদের দুটো দোকান রয়েছে। তাদের ২ মেয়ে ও ৩ ছেলে। প্রত্যেকেই পড়াশোনা করছে। ১ মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন। ছোট মেয়ে নার্সিংয়ে পড়ছে।

রূপালী তঞ্চঙ্গ্যাঁ, স্বামী অরুণ কুমার। রূপালী তঞ্চঙ্গ্যার স্বামী অরুণ কুমার মালয়েশিয়ায় থাকেন। তিনি ২ লাখ টাকা প্রবাসী ঋণ নিয়ে ফলের বাগান করেছেন।

জেসিকা তঞ্চঙ্গ্যাঁ, স্বামী রতন তঞ্চঙ্গ্যাঁ ২ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে পুকুরে মাছ চাষে কাজে লাগিয়েছেন। এতে একাধিক লোকের কর্মসংস্থানও হয়েছে। জেসিকা জানালেন, বুরো বাংলাদেশ এর ঋণ সহায়তা এবং মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তার পরামর্শে তার পুকুরের চিংড়ি বেশ বড় হয়েছে– ৩টাতেই ১ কেজি ওজন হয়েছে। জেসিকা তঞ্চঙ্গ্যার স্বামী রতন তঞ্চঙ্গ্যার নিজস্ব সিএনজি রয়েছে।

সাতকমলপাড়ায় একাধিক তঞ্চঙ্গ্যার সাথে কথা বলে মনে হলো এ গ্রামের লোকজন বেশ সুখী। কারো সাথে সচরাচর ঝগড়া হয় না। তাদের মধ্যে ভিক্ষাবৃত্তি নেই। তারা নিজেরা মিথ্যা বলতে পছন্দ করে না, কাউকে ঠকানো বা ফাঁকি দিতে নারাজ। তারা মনে করেন, সৃষ্টিকর্তা তাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তার যথাযথ ব্যবহার করতে পারলে তারা ভালো থাকবেন।

তারা এ এলাকায় বিশুদ্ধ পানির পাম্প বসানোর জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানিয়ে আসছেন। তারা জানালেন, বুরো বাংলাদেশসহ অন্যান্য এনজিওদের কার্যক্রমের ফলে তাদের আর্থিক ও সামাজিকভাবে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি এসেছে। আমাদের সাথে উঠোন বৈঠকে বুরো বাংলাদেশ এর ঋণ গ্রহীতার মধ্যে আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তঞ্চঙ্গ্যাঁদের একজন বললেন, আমরা অল্পতেই সন্তুষ্ট। শান্তিতে থাকতে ভালোবাসি। আমরা হাসতে জানি। তাদের নিজস্ব পোশাক ও অলঙ্কার আছে। অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর নারীদের মধ্য থেকে এই পোশাক দেখে তাদের সহজেই পৃথক করা যায়। সুন্দর কারুকাজে চুলের কাটা ও চেইন সজ্জিত খোঁপাকে বেষ্টনী দিয়ে মাথায় খবরং বাধা (পাগড়ি); তঞ্চঙ্গ্যা নারীর গায়ে থাকে ফুলহাতা জামা। এই জামার কাঁধে এবং হাতের প্রান্তে নানা রঙের সুতোয় ফুল বোনা থাকে। পরনে থাকে সাত রঙের পিনন। তঞ্চঙ্গ্যাঁদের সাথে কথা বলে মনে হলো এরা প্রকৃতির মতো উদার-হাসিখুশি প্রাণবন্ত।■

সাতকমলপাড়ায় একটি চায়ের দোকানে অবসর সময়ে তঞ্চঙ্গ্যারা

রাঙামাটি : চাকমাদের সমকালীন জীবন

রাঙাপানির চাকমা পরিবার

রাঙামাটির রাঙাপানি এক সমৃদ্ধ গ্রাম। বুরো বাংলাদেশসহ ব্র্যাক, আশা, শক্তি ফাউন্ডেশন ও আইডিএস এ গ্রামটিতে চাকমা অধিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বেশ ভূমিকা রাখছে। এ গ্রামেরই অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তি সুভাষ চাকমা একজন গরুর খামারি। একই সাথে মাশরুম চাষ ও নার্সারিও আছে। তিনি এসব অর্থনৈতিক কাজে সহায়তার জন্য বুরো বাংলাদেশ থেকে ৩ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছেন। সুভাষ চাকমা বলেন, বুরো বাংলাদেশের ঋণ সহায়তা তাকে ব্যবসায়িক সাফল্যের আনন্দ দিচ্ছে। সুভাষ চাকমার স্ত্রী লক্ষ্মী দেবী চাকমাও বেশ উদ্যোগী নারী। তাদের ২ ছেলে ১ মেয়ে। বড় ছেলে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবাসী। ছোট ছেলে শ্রীলঙ্কার ভিক্ষু ভান্তে। সে মালয়েশিয়া থেকে হোটেল ম্যানেজমেন্টে পাস করেছে। তাদের ৫ কানি জমির ২.৫০ কানিতে জার্মান নেপিয়ার ঘাস চাষ করেছেন গরুর খাদ্য হিসেবে। বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট করেছেন ২টা। বাসা ভাড়া পান ৯/১০ হাজার টাকা।

লক্ষ্মী দেবী চাকমা বললেন, আমাদের অবস্থা ভালো হলেও খামার করার মতো নগদ টাকা ছিল না। বুরো বাংলাদেশ পাশে দাঁড়িয়েছে বলেই এসব কিছু সম্ভব হয়েছে। সুভাষ চাকমা বলেন, রাঙামাটিতে ৬৫টির বেশি ডেইরি ফার্ম আছে। তিনি রাঙামাটি ডেইরি ফার্ম অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি।

এ গ্রামের এইচএসসি পাস বিনতি চাকমা গ্রামীণ ব্যাংক, তারনি, সিআইপিডি এফপিএপি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। তার ১ ছেলে নবম শ্রেণীতে পড়ে। তিনি বুরো বাংলাদেশের একজন সঞ্চয়ী সদস্য। ঘরে কোমড় তাঁত দিয়ে কাপড় বুনে তা বাজারজাত করেন। বুরো বাংলাদেশ তার কাছে ব্যাংকের মতো। যে কোনো সময় টাকা লেনদেন করতে পারেন।

কোকিলা চাকমা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এমবিএ ডিগ্রি নিয়েছেন রাঙামাটি সরকারি কলেজ থেকে। এখন ভালো চাকরির প্রত্যাশা করছেন। টিউশনি করেন, বুনন পারেন, সেলাই কাজও করেন। তারা ১ বোন ১ ভাই। বাবার দোকান আছে এবং কৃষি জমিও আছে। তিনি বলেন, বুরো বাংলাদেশ এর আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমের ফলে এ এলাকার মানুষ যথেষ্ট উপকৃত। তাদের মধ্যে জীবন মান উন্নয়নসহ শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্য একজন গরিতা চাকমা অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার কারণে মাত্র পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন। স্বামী বিষ্ণু চাকমা সিএনজি চালক। তিনি কোমড় তাঁতের মাধ্যমে কাপড় বুনেন। তিনিও বুরো বাংলাদেশ এর সদস্য।

বুরো বাংলাদেশ এর ঋণ সহায়তায় মাহিনা চাকমা গরুর খামার গড়ে তুলেছেন। কোমর তাঁত দিয়ে নিজেদের কাপড় নিজেরাই তৈরি করেন। বুরোতে মাসিক ১ হাজার টাকা সঞ্চয়ী হিসাব খুলেছেন। জয়া চাকমাও বুরো'র সঞ্চয়ী সদস্য। তিনি কোমড় তাঁতের মাধ্যমে মাসিক ১০/১২ হাজার টাকা আয় করতে পারছেন। অনিকা চাকমা মনঘর স্কুল থেকে এসএসসি পাস করেছেন। বর্তমানে রাঙামাটি বিএম ইনস্টিটিউটে প্রথম বর্ষে পড়ছেন। কোমড় তাঁত থেকে তার আয় প্রায় ২/৩ হাজার টাকা। তার মন্তব্য, এনজিওরা এখন পাহাড়ি অধিবাসীদের বন্ধু।

মানুচিং রাখাইন, স্বামী মংপ্রু রাখাইন। মংপ্রু পেশায় কবিরাজ। দোকান রয়েছে। তাদের ৩ ছেলে ৪ মেয়ে। ২ মেয়ে বিউটি পার্লারে কাজ করে। কথা হলো সুরেশ চাকমা, তুষিতা চাকমা, সুস্মিতা চাকমা ও ঈশিতা চাকমার

সাথে। তারা প্রত্যেকেই কলেজে পড়েছে। তাদের চোখে মুখে অনেক স্বপ্ন। এনজিওদের কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের মূল্যায়ন হলো– বুরো বাংলাদেশসহ এনজিওরা কোনো কিছু বন্ধক না নিয়ে শুধু বিশ্বাসের ওপর টাকা ঋণ দেয়– এটি সত্যিই অবাক হবার ঘটনা। তারা বলেন, বুরো এখন আমাদের দরিদ্র নৃগোষ্ঠীর আত্মার আত্মীয়।

ভেদভেদিপাড়ার চাকমারা

ভেদভেদিপাড়ার বেশ কয়েকজন চাকমার সাথে কথা হলো। তাদের গ্রামে শিক্ষার হার প্রায় ৯৮%। এদের মধ্যে সুমা চাকমা এম.এ. পড়ছেন। তিনি ব্যবসার সাথে জড়িত। পারমি চাকমা বুরো বাংলাদেশ থেকে ৩ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসার কাজে লাগিয়েছেন। বীমা চাকমা এসএসসি পাস। তাঁতের কাজ জানেন। ছায়ারানী চাকমা, কাকলী চাকমা ও তপন চাকমা বললেন, এনজিওদের কার্যক্রমে আমরা আর্থ-সামাজিকভাবে উপকৃত। কাননী চাকমা ও রীনা দেওয়ান চাকমা বাংলাদেশ বেতার রাঙামাটি কেন্দ্রে চাকরি করেন। রীনা বুরো বাংলাদেশ থেকে ১ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসার কাজে লাগিয়েছেন। মিত্রা চাকমা, স্বামী সুবর্ণ চাকমা রাঙামাটি কলেজ থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে এম.এ. পাস করেছেন। তিনিও ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত। তিনিও ১ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসার কাজে লাগিয়েছেন। এ এলাকার চাকমাদের মধ্যে পেশার ভিন্নতা লক্ষ্যণীয়। স্কুল শিক্ষক, হোমিওপ্যাথি ডাক্তারসহ চাকরিজীবী রয়েছে। তবে প্রত্যেকেই জুম চাষের সাথেও জড়িত।

উপস্থিত চাকমা সম্প্রদায়ের সদস্যরা সবাই বললেন, বুরোসহ অনেক এনজিও-ই আমাদের সমস্যা সমাধান ও উন্নয়নের শক্তি।

মোনঘর : পাহাড়ের বাতিঘর

বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি গৌতম বুদ্ধের অমর বাণী 'বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য দিকে দিকে বিচরণ করো'। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উদ্যোগে ১৯৮০ সালে গড়ে উঠেছে মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়। ১৯৭৪ সালে একদল আলোকিত ও আত্মনিবেদিত সমাজহিতৈষী বৌদ্ধ ভিক্ষু কর্তৃক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মোনঘর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল পার্বত্য অঞ্চলের অনাথ, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের আবাসন, শিক্ষা ও চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করে তাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়। ১৯৮২ সালে কুমিল্লা বোর্ডের স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৮২ সালের ১ জানুয়ারি ১০০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়, আবাসিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩০ জন। বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১২০০ এর অধিক। এর মধ্যে ৮০৯ জন আবাসিক ছাত্রছাত্রী।

এই স্কুলে শুধু পাহাড়িয়া জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের জন্যই নয়, বাঙালিরাও পড়ার সুযোগ পায়। তবে সুযোগ থাকলেও কোনো মুসলমান ছাত্রছাত্রী এই স্কুলে নেই। এই আবাসিক স্কুলের জায়গার পরিমাণ প্রায় ১৬ একর। স্কুলে বাংলা, ইংরেজি শেখার পাশাপাশি চাকমা, মারমা, ম্রো, খুমি ও চাক ভাষাও পড়ানো হয়।

বর্তমানে মোনঘর এর নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্বে রয়েছেন অশোক কুমার চাকমা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৯ সলে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। পরে ২০০৯-১০ সালে অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটি থেকে সোশ্যাল প্ল্যানিং ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে মাস্টার্স করেছেন। কথা প্রসঙ্গে মোনঘর এর নির্বাহী পরিচালক অশোক কুমার চাকমা বলেন, মোনঘর শিশু সদনে অসহায়, এতিম, অস্বচ্ছল ছেলেমেয়েদের ঠাঁই দেয়া হয়। তারাও যে প্রতিভাবান এবং সুযোগ পেলে মানুষের মতো মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পারে, হতে পারে অনুপ্রেরণার একজন তার বড় উদাহরণ মোনঘর। তিনি বলেন মোনঘর হচ্ছে পাহাড়ের বাতিঘর। এখানে ছাত্রছাত্রীদের শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই নয়, তাদেরকে মানবিক গুণাবলি সম্পন্নভাবে গড়ে তোলা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আলোকিত মানুষ গড়ে তোলা।

অশোক কুমার চাকমা বলেন, এ প্রতিষ্ঠানটিতে সরকারের কোনো আর্থিক সহায়তা নেই। দেশ-বিদেশের অসংখ্য শুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক সহায়তার দ্বারাই এটি পরিচালিত হচ্ছে।

তিনি বলেন, এখানে ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত কোনো বিরোধ নেই। আমরা সবাই মানুষ এবং আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানবকল্যাণ। এই দীক্ষা নিয়েই এ প্রতিষ্ঠানের ছেলে মেয়েরা কর্মজীবনে তার বাস্তবায়ন ঘটায়।■

রাঙামাটির আসাম সম্প্রদায় : নৃগোষ্ঠীর স্বীকৃতি চায়

ব্রিটিশ আমলে এখানে আসাম থেকে অহমিয়াদের আনা হয়েছিল রাস্তাঘাট, রেললাইনসহ অন্যান্য সরকারি স্থাপনার কাজের জন্য। ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান ভাগ হয়ে গেলে আসামের এই লোকজন রাঙামাটি এলাকায় থেকে যায়। যেহেতু তারা আসাম প্রদেশের আদি বাসিন্দা তাই তাদের নামের শেষে আসাম যুক্ত হয়ে যায়। রাঙামাটিতে আসাম বস্তির লোকসংখ্যা ৫০০/৬০০ এর মতো। তারা দেশের মূলধারাতেও নেই, আবার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর স্বীকৃতিও তাদের ভাগ্যে জোটেনি। ফলে নৃ-গোষ্ঠীর প্রাপ্ত সকল সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত। আসাম সম্প্রদায়ের এরা এ দেশের স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে সকল নাগরিক সুবিধা প্রত্যাশা করে। সেই সাথে তারা সংবিধানে নিজেদের নৃগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি চায়।

আসাম বস্তিতে বসবাসকারী আসাম সম্প্রদায়ের এক তরুণী প্রার্থনা কাছারী রাঙামাটি সরকারি কলেজে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স ৪র্থ বর্ষের ছাত্রী। প্রার্থনা কাছারী এসএসসিতে জিপিএ-৫ এবং এইচএসসিতে জিপিএ-৩ পেয়েছিল। আসাম নামে বস্তি হলেও তা বস্তি নয়। আসামী ভাষায় বস্তি হচ্ছে পাড়া। আসাম বস্তির এই বাসিন্দারা বাংলাদেশের নাগরিক হলেও তারা স্বতন্ত্র স্বত্বা নিয়ে রয়েছে। প্রার্থনা কাছারীর বাবা পঙ্কজ আসাম একজন প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক। মা উষা চাকমা হাতের কাজ অর্থাৎ ব্যাগ তৈরি করেন। প্রার্থনা কাছারী কলেজে পড়াশোনার পাশাপাশি গৃহ শিক্ষকতা করে প্রায় ৭০০০ টাকা পান। এ দিয়েই তার পড়াশোনার খরচ হয়ে যায়। বাবা-মা'র কাছে চাইতে হয় না। প্রার্থনার ইচ্ছে, পড়াশোনা শেষ করে সরকারি চাকরিতে যোগদান করা।

আসাম বস্তির চিং সিট আসাম এর বয়স ৩৮। তিনি নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন। স্ত্রী দিয়া আসাম। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে তারা ৪ ভাই বেশি দূর পড়াশোনা করতে পারেননি। ১ ভাই সেনাবাহিনীতে চাকরি করে। চিং সিট আসাম দোকান করেন। তিনি গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ৫০ হাজার এবং আশা থেকে ৩৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসার কাজে লাগিয়েছেন। তিনি বলেন, ব্র্যাক এবং শক্তি ফাউন্ডেশনও তাদের আসাম বস্তিতে কাজ করছে। তার মতে, এনজিওরা ক্ষুদ্র অর্থায়ন না করলে তারা স্বচ্ছলতার মুখ দেখতে পেতেন না। তাদের ১ মেয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ছে।

শ্যামলী রাভা আসাম। বাবা চিন্তামনি ত্রিপুরা, মা দয়ামনি ত্রিপুরা। শ্যামলী এইচএসসি পাস করেছেন। শ্যামলী রাভার স্বামী সুখময় রাভা আসাম। শ্যামলী বছর চারেক বিসিক এ চাকরি করেছেন। স্বামী বিএ পাস। তিনি এফপিএবি নামের একটি এনজিওতে কাজ করেন। তাদের ১ মেয়ে স্বামীসহ দক্ষিণ কোরিয়ায় থাকছেন। ১ ছেলে মাস্টার্স পাস করে চাকরি খুঁজছে। সঞ্চয়পত্র ও ঘর ভাড়া থেকে যা আয় তা দিয়েই সংসার চলছে। শ্যামলীর বাবা-মা হিন্দু। তিনি বৌদ্ধ, সন্তানরাও তাই। কথা হলো দীপ্তি আসাম এর সাথে। তার স্বামীর নাম ইশোর আসাম। তিনি সিএনজি চালান। ১ ছেলে ১ মেয়ে। ছেলে এসএসসি পরীক্ষার্থী, মেয়ে নবম শ্রেণীর ছাত্রী। তিনি বাড়ি মেরামতের জন্য আশা থেকে ৯০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন। তিনি বলেন, এনজিওদের ঋণ সহায়তায় বিশুদ্ধ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। তিনি জানান, এ দেশে আসামরা নৃ-গোষ্ঠীর স্বীকৃতি চায়।

উত্তম কুমার আসাম বললেন, তাদের পরিবার আগে হিন্দু ছিলেন, পরে খ্রিস্টান হয়েছেন। তিনি পুলিশে চাকরি করতেন। এখন অবসর ভাতা নিয়ে সংসার চালাচ্ছেন। তিনি তাদের মতো পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর খোঁজখবর নেয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আসাম সম্প্রদায়ের হেমন্ত কুমার আসাম হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তিনিও পুলিশ বিভাগে চাকরি করতেন। তিনি বলেন, এক সময় আমাদের অনেকেই পুলিশ বিভাগে চাকরির সুযোগ পেয়েছে। এখন উচ্চশিক্ষা নিয়েও চাকরি পাওয়া যায় না। হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী হেমন্ত কুমারের ২ ছেলে গাড়ি চালায়। ৩ মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন। তিনি পেনশনের টাকায় চলছেন।

অনুপ কুমার আসাম ও তার স্ত্রী মায়া আসাম বললেন, দাদার সময় থেকে তারা বৌদ্ধ। বড় মেয়ে এক মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করেছে। জামাতা পুলিশে চাকরি করে। তাদের ঘরে ২ নাতি। পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে। ছেলে বিএসসি পাস করেও চাকরি পায়নি। টিউশনি করে ৮/১০ হাজার টাকা পায়।

আসাম যুব সংঘের সভাপতি বললেন, আমরা বাংলাদেশে ভালোই আছি। আমরা আমাদের হারিয়ে যাওয়া কৃষ্টি কালচার ও ঐতিহ্য ধরে রাখতে চাই। তিনি বলেন, আলাদা আলাদা ধর্ম পালন করলেও আমাদের মধ্যে সামাজিক বন্ধনের ভিত খুব শক্তিশালী। একে অপরের ভালোমন্দে আমরা একাত্ম। তিনি আরো বলেন, এখানকার আসাম সম্প্রদায় অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মতো স্বীকৃতি চায় এবং চাকরিসহ সরকারের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে কোটা চায়।■

প্রীতম রাভা

রাঙামাটির কাপ্তাই লেকের ঝুলন্ত সেতুর অদূরেই আসামবস্তী। কাগজে-কলমে বস্তী শব্দটি থাকলেও এলাকাটিকে আসাম পাড়া বলাই সম্মানজনক। দেশ ভাগের সময় এ অঞ্চলে আটকে পড়া আসামিজরা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে তালিকাভুক্ত না হলেও ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা নিয়েই বসবাস করছে বাংলাদেশে।

এই আসাম পাড়ার এক মেধাবী তরুণ প্রীতম রাভা। ২০১৯ সালে জার্নালিজমে গ্র্যাজুয়েশন করেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া অবস্থায় দৈনিক প্রথম আলোসহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ইলেক্ট্রনিক গেজেট রিভিউ এর কাজ করতো, কিন্তু করোনা মহামারিতে সে কাজে ভাটা পড়ে। জার্নালিজমে পড়ার কারণে মিডিয়াতে ক্যারিয়ার গড়তে চায় প্রীতম। কিন্তু তার এই চাওয়া আদৌ পূর্ণতা পাবে কি না তা নিয়েও শঙ্কা আছে মনের কোণায়। এ শঙ্কা থেকেই বিকল্প ভাবনাও জানিয়ে দিলো সে- যে কোন একটি চাকরি হলেই চলবে তার!

প্রীতম রাভার মতো তরুণ-তরুণীদের এই স্বপ্ন দেখা ও স্বপ্ন ভঙ্গের শঙ্কা মোটেই অস্বাভাবিক মনে হয়নি। কারণ তারা জানে, সমাজের পিছিয়ে পড়া একটি জনগোষ্ঠীতে জন্ম তাদের। কি শিক্ষায়, কি চাকরিতে- তাদের সুযোগ ও সম্ভাবনা খুবই নগন্য।

আসাম পাড়ায় পাহাড়ের চেয়ে জলের পরিমাণই বেশি। কেউ কেউ ছোটখাটো চাকরি করেন, বাকিদের পেশা মাছ ধরা। কথা শেষে চলে আসার সময় তাই মনে হচ্ছিলো, এ পাড়ার দুয়েকজন প্রীতম হয়তো উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাবে, আর বাকিরা কাপ্তাই লেকের জলে পুরো জীবনটাই হয়তো পার করে দেবে মৎসজীবী হয়ে।

মেঘের রাজ্য সাজেকে লুসাই ও ত্রিপুরাদের মেঘাচ্ছন্ন জীবন

গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র হয়ে উঠেছে সাজেক উপত্যকা। সাজেককে বলা হয় মেঘের রাজ্য। মেঘ, পাহাড় আর সবুজের সম্মোহনী সমারোহ এখানে। ক্রমাগত চলে ঋতু বদলের খেলা। প্রকৃতির এই নয়নাভিরাম রূপ দেখতে ছুটির দিনসহ সপ্তাহের প্রতিদিনই সাজেকে জড়ো হন শত শত পর্যটক। মেঘ-পাহাড়ের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পর্যটকরা হয়তো ভুলেই যান কাটফাটা রোদ নামে প্রকৃতির নির্মম একটা রূপের দেখাও এখানে পাওয়া যায়। এই সাজেক নিয়ে ভ্রমণ ব্লগ ও ভ্লগ কম নেই নেট দুনিয়ায়। সবগুলোতেই মেঘের বন্দনা, পাহাড়ের গুণগান। এই বন্দনা যারা করেন তারা সবাই পর্যটক, দুই-এক রাত্রির অতিথি। এতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু এই উপত্যকায় যাদের ঘর, সবুজ পাহাড়ের ঢালে আর উঁচু উঁচু গাছের আড়ালে যাদের জীবন বয়ে চলে, তাদের কথা তেমন শোনা যায় না কোথাও। মেঘের সৌন্দর্যের আড়ালে মানবজমিনের সুখ-দুঃখের যে কবিতা এখানে লুকিয়ে আছে তার পাঠক খুব কমই পাওয়া যাবে এই উপত্যকার পর্যটকদের দলে।

সাজেক রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার একটি ইউনিয়ন। ৭০২ বর্গমাইল আয়তন নিয়ে এটিই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইউনিয়ন। সম্প্রতি সাজেক থানায় উন্নীত হয়েছে। সাজেকের উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা, দক্ষিণে রাঙ্গামাটির লংগদু, পূর্বে ভারতের মিজোরাম ও পশ্চিমে খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলা। ভারতের মিজোরাম প্রদেশের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন কর্ণফুলী নদীর একটি শাখা নদীর নাম সাজেক। এই নদীর নামেই রাঙ্গামাটির ছাদ খ্যাত এই উপত্যকার নাম রাখা হয়েছে সাজেক। সাজেকের সবচেয়ে নিচু অংশ রুইলুই পাড়ার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৭২০ ফুট এবং সবচেয়ে উঁচু অংশ কংলাক এর উচ্চতা ১৮০০ ফুট। ভৌগলিকভাবে সাজেক রাঙ্গামাটি জেলার অংশ হলেও এর ভূ-অর্থনীতি খাগড়াছড়ি কেন্দ্রিক। কারণ সাজেক উপত্যকা থেকে রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার চেয়ে খাগড়াছড়ির দীঘিনালাতেই যাতায়াত বেশি সহজ।

সাজেক তিনটি পাড়া- রুইলুই, হামারি ও কংলাক। কংলাক একটি পাহাড়ের নাম। তবে স্থানীয়রা পুরো সাজেককে দক্ষিণ, মধ্য ও উত্তর রুইলুই পাড়া হিসেবেই বিবেচনা করে। পুরো উপত্যকায় চারটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বসবাস। লুসাই, পাংখোয়া, ত্রিপুরা ও চাকমা। কংলাক পাহাড়ে বসতি প্রধানত লুসাইদের। এখানে ৪০টি ঘরে প্রায় শ দুয়েক লুসাই বসবাস করে। কয়েক ঘর ত্রিপুরাও কংলাকে আছে। দক্ষিণ রুইলুই পাড়ায় ত্রিপুরাদের সংখ্যা বেশি, ৯৬টি পরিবার মিলিয়ে প্রায় ৬০০ জন। রুইলুই পাড়ায় ২২টি লুসাই পরিবারও আছে। সাজেক ভ্যালির আশপাশের পাহাড়গুলোতে বসবাস পাংখোয়া ও চাকমাদের। লুসাইরা প্রকৃতি পুজারি হলেও ব্রিটিশ আমল থেকে খ্রিস্টান। প্রকৃতি পূজা থেকে সরে এসে পাংখোয়ারা এখন বৌদ্ধ। চাকমারা থেরোবাদী বৌদ্ধ আর ত্রিপুরারা সনাতন ধর্মের অনুসারী। ভারতের সীমান্তঘেঁষা অঞ্চল হওয়ায় এখানকার অধিবাসীদের মিজোরাম ও ত্রিপুরায় যাতায়াত এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে যাওয়ার মতোই। অর্থাৎ পাসপোর্ট-ভিসাবিহীন ভ্রমণ। তাদের বহু আত্মীয়-স্বজনের বসবাস ওপারে। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন তো আছেই। সাজেকে আমাদের মূল লক্ষ্য ছিলো লুসাই ও ত্রিপুরাদের সাথে কথা বলা, তাদের জীবন, অর্থনীতি ও সমস্যা-সংকটের খোঁজ নেওয়া। প্রথমেই গিয়েছিলাম কংলাক চূড়ার লুসাই পল্লীতে। বুরো বাংলাদেশের কর্মী ও আমাদের গাইড পার্সন চাকমা শুরু থেকেই জানিয়ে দিচ্ছিলেন কংলাকের খাড়া পথের কথা। তার মনে হয়তো সন্দেহ ছিলো এই খাড়া পাহাড় আমরা উঠতে পারবো কি না। যাওয়ার পর দেখলাম সিলেটের মাধবকুন্ড খাসিয়া পুঞ্জির পাহাড়ের

উচ্চতার কাছে কংলাক তেমন কিছুই না। কংলাকের নিচেই দু-তিনজন স্থানীয় কিশোর-কিশোরী বাঁশের লাঠি বিক্রি করছিলো। মাধবকুন্ডতে বাঁশ লাগেনি, এখানেও লাগার কথা নয়। তারপরও আমাদের টিমে তিনজন দশ টাকা করে তিনটি লাঠি কিনলেন, মূল উদ্দেশ্য ছিলো ওদের সহযোগিতা করা। নেমে আসার পর ওই লাঠিগুলো আমরা ফিরিয়ে দিয়েছিলাম যাতে ওরা আবারও ওগুলো বিক্রি করতে পারে। কংলাকে পর্যটকদের ওঠানামা চলছিলো। চূড়ায় শক্ত পাথর, মাটিও আছে। এখানেই লুসাই পল্লী। বেশ কয়েকটা দোকানও আছে। লুসাইদের দোকান, ত্রিপুরাদের দোকান, দূর থেকে আসা চাকমাদের দোকান। পিউই একজন লুসাই দোকানি। পানি, সিগারেট, পান-বিস্কুট আর স্থানীয় পেঁপে-জাম্বুরা আছে তার দোকানে। পিউই দিদি জানালেন, অধিকাংশ পর্যটক পানি কিনেন, ফলে দোকান থেকে যে খুব একটা আয় হয় তা নয়। আমরা ঘন্টা দেড়েক ছিলাম, কোন পর্যটককে পানিও কিনতে দেখিনি। প্রতিটি দোকানে ফ্রিজার আছে। এতো উঁচুতে বিদ্যুৎ এর সংযোগ দেখে ভালো লাগলো। তবে উপত্যকার গভীরে যাদের ঘর কুপি-হারিকেনই তাদের ভরসা।

কংলাক পাহাড়ের লুসাই জনগোষ্ঠী

কংলাকে উঠলেই হেডম্যান চং সিং টাং লুসাই এর বাড়ি। পাহাড়ের ঢালে, বাঁশের মাচায়। মাচাকে তারা বলে মাচাং। আমরা হেডম্যানের ঘরেই বসলাম। এখানে জড়ো হয়েছিলেন আরো ১৫/২০ জন লুসাই নারী-পুরুষ। চং সিং টাং এর বয়স ৭৯। ভারতের ত্রিপুরার একটি স্কুল থেকে মেট্রিকুলেশন পাস করেছেন ১৯৬০ সালে। অবসর নিয়েছেন ১৯৭৫ এ। হেডম্যান হয়েছেন ৬২ তে। স্কুল থেকে পেনশন পান ৭ হাজার টাকা আর হেডম্যান হিসেবে সরকারি ভাতা পান ১০০০ টাকা। তার ২ ছেলে, ৪ মেয়ে। সবারই আলাদা সংসার। এক ছেলে ভারতে থাকেন, অন্যজন এদেশে চাকরি করেন। পিউই নামে যে দোকানির কথা বলেছি তিনি এই হেডম্যানের মেয়ে। প্রতিটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী তাদের হেডম্যানদের গভীরভাবে মান্য করেন।

লুসাইরা মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভুত। মিজোরামের লুসাই পাহাড়ের নামেই তাদের নাম। লুসাই সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। বহু আগে পশু শিকারে অভ্যস্ত থাকলেও তারা জীবিকা নির্বাহ করে জুম চাষ করে। জুম চাষকে দূর থেকে আমরা মনে করি একটি শৈল্পিক আবাদ পদ্ধতি। এ ধারণা মিথ্যে নয়, কিন্তু এর ভেতরের যে সমস্যা ও সংকট তা বোধ করি সমতলের আধিবাসী হিসেব আমরা খুব কমই জানি। ঋতু ভেদে জুমে চাষ হয় ধান, সবজি, আদা, হলুদ, তিল, কলা ও কচু। কিন্তু এই ফসলের সাথেই পাহাড়ে বেড়ে উঠে ইঁদুর, সজারু, কাঠবিড়ালি, বনমোরগ ও বিশেষ এক ধরনের পোকা। লুসাইদের ফসলের সিংহভাগই চলে যায় এদের পেটে। কোন কোন বছর উৎপাত এতোটাই বেশি থাকে যে জুমের আশি ভাগ ফসলই খেয়ে ফেলে ইঁদুর আর সজারু। এই সমস্যা পার্বত্য অঞ্চলের প্রায় সব পাহাড়েই আছে। কিছুই করার নেই। পাহাড়ে ইঁদুর দমন করা খুব সহজ না। ফসল ঘরে তোলার সময় হলে লুসাই পল্লীর আগেই খবর চলে যায় ইঁদুর পল্লীতে! পাশাপাশি পাহাড়ের উর্বরতা কমে যাওয়ার সমস্যা তো আছেই। আমাদের সমতলের আবাদি জমি যেমন উর্বরতা হারায়, পাহাড়ও তেমনি। একটি পাহাড়ের উর্বরতা ফিরিয়ে আনতে অনাবাদি রাখতে হয় কম করে হলেও দুই বছর। এ সময় জুম চাষের জন্য লুসাইদের ছুটতে হয় আরো দূরের কোন পাহাড়ে। একই সমস্যা এখানকার ত্রিপুরাদেরও। লুসাই ও ত্রিপুরারা দুই ধরনের জুম চাষের সাথে যুক্ত। একটি অন্য কোন ব্যক্তির বাণিজ্যিক জুমে দিনমজুর হিসেবে, আরেকটি নিজেদের পাহাড়ে নিজেদের জন্যে। নারী-পুরুষ সবাই জুম চাষি। দিনমজুরি খেটে তারা দিনে আয় করেন কমবেশি ৪০০ টাকা। বাঁশ বন থেকে বাঁশ কেটেও কিছুটা আয় হয় তাদের। অন্যান্য সাধারণ পেশা বা চাকরিতে সাজেকের লুসাই-ত্রিপুরাদের অংশগ্রহণ আছে কিন্তু তা বিপুল সংখ্যায় নয়।

ত্রিপুরারা বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হলেও ভারতে তারা পূর্ণ জাতিসত্তা নিয়েই টিকে আছে। ব্রিটিশ আমলে ত্রিপুরা একটি আলাদা রাজ্য ছিলো যা বর্তমানে ভারত ইউনিয়নভুক্ত। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালীর বিলোনিয়া কুমিল্লা, চাঁদপুর, মৌলভীবাজার, শ্রীমঙ্গল, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, ঢাকাসহ প্রায় আড়াই লাখের বেশি 'বাংলাদেশি ত্রিপুরা' রয়েছে। সবমিলিয়ে ত্রিপুরা জাতির জনসংখ্যা ১ লাখ ৫৬ হাজার ৫৭৮। ত্রিপুরারাও মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভুত। সমাজ ব্যবস্থার দিক থেকে তারা পিতৃতান্ত্রিক। তবে পিতা চাইলে কন্যা সন্তানকেও সম্পত্তি দিতে পারে। ত্রিপুরাদের মূল ভাষা– 'কক্-বরক'। এ ভাষা ৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের রাষ্ট্রভাষা ছিল। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি ভারতে এই ভাষা পুনরায় রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা পেয়েছে। এই ভাষার বর্ণমালা রয়েছে। ত্রিপুরারা সনাতন ধর্মের অনুসারী। তবে বর্তমানে অনেকেই খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে। ত্রিপুরারা

দক্ষিণ রুইলুই পাড়ার ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী

৩৬টি দফা বা গোত্রে বিভক্ত। লোকনৃত্যে ত্রিপুরাদের ঐতিহ্য অনেক। ত্রিপুরা নারীরা অলংকার প্রিয়। তাদের প্রধান উৎসব নববর্ষ বা বৈসুখ।

কারবারী অনীল ত্রিপুরার নেতৃত্বে রুইলুই পাড়ায় ত্রিপুরারা জড়ো হয়েছিলো তাদের কমিউনিটি সেন্টারে। ২০১৬ সালে কমিউনিটি সেন্টারটি উদ্বোধন করেছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা। ত্রিপুরা যুবকরা এখানে একটি 'ত্রিপুরা আদিবাসী ক্লাবও' প্রতিষ্ঠা করেছে। লুসাই ও ত্রিপুরাদের সাথে কথা বলে জানা গেল, সাজেকের আরেকটি বড় সমস্যা পানি। পুরো সাজেকে পানির উৎস দূর-পাহাড়ের ঝিরি বা ঝরনা। সাজেক ভ্যালির লুইরুই পাড়ায় খাড়া পথ বেয়ে উঠার আগেই ঝরনার একটি ধারা আছে। তবে এখানকার পানি খাওয়ার উপযোগী নয়। গোসলসহ অন্যান্য সাধারণ কাজে ব্যবহার করা যায়। এখান থেকে পোর্টেবল ট্যাংকে পানি ভরে চান্দের গাড়ি দিয়ে হোটেল-রিসোর্টগুলোতে বিক্রি করা হয়। ১৫০০ লিটার পানির দাম ১৮০০ টাকা। ফলে বোতলজাত পানি পর্যটকদের মূল ভরসা। কিন্তু লুসাই বা ত্রিপুরা, যারা এই পাহাড় চূড়ার অধিবাসী তারা তো আর বিলাসী পর্যটক নন। তাদের পানি সংগ্রহ করতে হয় প্রায় দুই কিলোমিটার দূরের একটি ঝরনা থেকে। দুর্গম পাহাড়ি পথ বেয়ে গোসল, কাপড় ধোয়া ও খাবার পানি নিয়ে আসতে তাদের ব্যয় হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। পাহাড় বেয়ে নামতে পারে এমন প্রত্যেক নারী-পুরুষ ও শিশুদের এই পানি বহনের কাজটি করতে হয়। না করলে চলবেই বা কীভাবে! কংলাকের চেয়ে ঝরনা অনেক নিচুতে, তাই পাইপের মাধ্যমে পানি আনার সুযোগ নেই। বৃষ্টির পানি ধরে রাখার একটি উপায় তাদের আছে। কিন্তু দুয়েক দিনের মাথায় এই জমানো পানিতে পোকা ও মশা ডিম পাড়ে। লুসাই ও ত্রিপুরা জাতিগোষ্ঠীর সবাই জোর দিয়ে দাবি করলেন, তাদের জন্য ঝরনা পর্যন্ত যেন সিঁড়ি করে দেওয়া হয়। সিঁড়ি বানিয়ে দেওয়া কি সম্ভব? জানতে চেয়েছিলাম। তারা এক বাক্যে বললেন, সম্ভব। লুইরুই পাড়ার ত্রিপুরারা পানি সমস্যা সমাধানে ঝরনার কাছে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন পানির পাম্প স্থাপনের সুযোগ রয়েছে বলে জানালেন।

রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরা সাজেক থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে দীঘিনালা হাই স্কুল থেকে ২০০৯ সালে এসএসসি পাস করেছেন। তিনি দীঘিনালার স্থানীয় এনজিও 'মানুষের জন্যে ফাউন্ডেশন'-এ চাকরি করেন। তিনি বলেন, সাজেক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠলেও একে পর্যটনবান্ধব হিসেবে গড়ে তোলা হয়নি। স্থানটি নিরাপদ এবং মেঘের রাজ্য দেখার সবচেয়ে উপযুক্ত হলেও এখানে পানি সমস্যা প্রকট। পানি অতিরিক্ত মূল্যে কিনে এনে হোটেল ও রেস্টুরেন্টে চালানোর ফলে ব্যয় বেশি পড়ে। পানির সঙ্কট দৈনন্দিন জীবনেও বড় সমস্যা। শিক্ষিত যুবক খুশীরাম ত্রিপুরা বললেন, সাজেক ভ্যালিতে কোনো ব্যাংকের শাখা নেই। আমানত করার বা ঋণের তেমন সুযোগ নেই। এখানে একটি ব্যাংকের শাখা স্থাপন করা উচিত। ত্রিপুরাদের মূল অর্থনৈতিক কার্যক্রম হচ্ছে জুম চাষ। পুরুষ-মহিলা সবাই পরিশ্রমী। তিনি জানান, এখানে মাশরুমের চাষও হয়।

দোকানী পিউই লুসাই

বাসনা ত্রিপুরা ব্র্যাক এর স্বাস্থ্যকর্মী। বাসনা বললেন, আমরা পাহাড়িরা বেশ পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী। এখানে ব্র্যাক, বুরো বাংলাদেশসহ অন্যান্য এনজিওরা উন্নয়নমূলক কাজ করার ফলে এই জনগোষ্ঠী এখন উন্নয়নের সুযোগ পাচ্ছে। তাদের ভাগ্যের চাকা বদলে যাচ্ছে।

চিকিৎসাসেবাও খুবই অপ্রতুল সাজেকে। রাঙ্গামাটির মাচালং বাজারে ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে কিন্তু যাতায়াত কষ্টসাধ্য। অসুখ-বিসুখে লুসাই ও ত্রিপুরাদের যেতে

হয় খাগড়াছড়ির দীঘিনালা সরকারি হাসপাতালে। প্রায় এক ঘণ্টার পথ। আর কংলাক চূড়ার কেউ যদি অসুস্থ হন তাকে নিচে নামিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যে কতটা দুর্বিসহ তা নিজ চোখে না দেখলে বোঝানো সম্ভব না। লুসাই হেডম্যান বলছিলেন, কেউ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতাল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার আগেই যমদূত এসে হাজির হয়। এক সময় নাকি ইউএনডিপির একজন স্বাস্থ্যকর্মী এসে চিকিৎসা দিয়ে যেতেন। এখন আসে কি না তা কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারেনি। ব্র্যাকের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম এই এলাকায় আছে তবে তা যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়া নির্মূলে সীমাবদ্ধ। ফলে লুসাই ও ত্রিপুরারা দাবি জানালেন সাজেকে একটি সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করার।

সাজেক ভ্যালিতে শিক্ষার সুযোগটাও সীমিত। কংলাকের নিচে আর রুইলুই পাড়ায় দুটি আলাদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। শিশুরা এখানে প্রাথমিক শিক্ষা নিতে পারে। আর আছে বিজিবির অর্থায়নে পরিচালিত একটি জুনিয়ার হাই স্কুল। দক্ষিণ রুইলুই পাড়ায়। এখানে তিনটি শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করা হয় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। শিক্ষকও তিনজন। রবিবারে যেদিন ফিরে আসবো সেদিন সকালে গিয়েছিলাম এই জুনিয়র হাই স্কুলে। ছেলেমেয়েরা ক্লাসরুমে বসে পড়ালেখা করছিলো। শিক্ষক ববিন ত্রিপুরা কথা বললেন আমাদের সাথে। এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মাসিক বেতন ১০০ টাকা। লুসাইরা বলেছিলেন, তাদের ছেলেমেয়েদের অনেকেই এই স্কুলে বিনা পয়সায় পড়ে। সাজেকে পড়ালেখার সুযোগ বলতে এটুকুই। ক্লাস এইটের পর কেউ পড়তে চাইলে যেতে হয় দীঘিনালা কিংবা খাগড়াছড়ি শহরে। এটা অনেক ব্যয়বহুল। দরিদ্র এই জনগোষ্ঠীর সবার পক্ষে সম্ভব হয় না এতো দূরে পাঠিয়ে ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার খরচ বহন করার। ফলে অধিকাংশ ছেলেমেয়েই ঝরে পড়ে স্কুল থেকে, বঞ্চিত হয় শিক্ষার আলো থেকে। তাদের জীবন বাধা পড়ে যায় উপত্যকার সবুজ পাহাড়ে বাঁশ কাটা আর জুম চাষে। তবে বিজিবির জুনিয়র হাই স্কুলটা যদি হাই স্কুল হয়ে যায় আর সেই সাথে বানিয়ে দেওয়া হয় একটা সরকারি কলেজ তাহলে সাজেকের শিশু কিশোরদের জীবনের ব্যাপ্তি ছাড়িয়ে যাবে এই মেঘের উপত্যকাকেও। এটা শুধু আমাদের নয়, পশ্চাৎপদ এই ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের কথাও।

কংলাকের লুসাই মা ও শিশু

বিগত কয়েক বছর ধরে সাজেক বেশ জমজমাট এক পর্যটন কেন্দ্র। এখানে গড়ে উঠেছে কয়েক ডজন হোটেল ও বিলাসবহুল রিসোর্ট। লুসাই ও ত্রিপুরাদের কেউ কেউ তাদের জমি লিজ দিয়েছেন বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে। কেউ বাৎসরিক আর কেউ মাসিক ভিত্তিতে জমির ভাড়া পান হোটেল ও রিসোর্টগুলো থেকে। কিন্তু জমি লিজ দেওয়ার এই সুযোগ সবার হয়নি। হোটেল-রিসোর্ট তো আর যেখানে-সেখানে তৈরি করা হয় না। ফলে এই দুই জাতিগোষ্ঠীর খুব অল্প সংখ্যক মানুষই পেরেছেন পর্যটন শিল্পের সুবিধা ঘরে তুলতে। আবার যারা জমি লিজ দিয়েছেন তারা পাহাড় চূড়া ছেড়ে ঘর বা মাচাং বানিয়েছেন পাহাড়ের পাদদেশে। ফলে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন হলেও তাদের জীবন ব্যবস্থায় খুব একটা বড় পরিবর্তন আসেনি। হোটেল-রিসোর্টগুলোতে এই নৃগোষ্ঠীগুলোর কিশোর-তরুণেরা চাকরি করছে ঠিকই কিন্তু তাদের বেতন যে খুব বেশি নয় তা সহজেই অনুমান করা যায়। ফলে সামগ্রিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত হয়ে দারিদ্র্যের মধ্যেই জীবন কেটে যাচ্ছে এখানকার অধিবাসীদের। পর্যটকদের বিলাসী জীবন ও লুসাই-ত্রিপুরাদের দারিদ্র্য এই উপত্যকায় সমান্তরাল। এই মেঘের রাজ্যে কেউ আসে মেঘ দেখতে, আর কেউ কেউ রয়ে যায় মেঘের আড়ালে।■

সুচিন্ত চাকমা

রাঙ্গামাটির রাঙাপানি এলাকার এক উজ্জ্বল ও চঞ্চল শিশু সুচিন্ত চাকমা। নিজের বয়স হাতের চারটি আঙুল গুণেই বলে দিতে পারে সে। রাঙ্গামাটির প্রতিটি পাড়ায় পাড়াকেন্দ্র নামে শিশুদের জন্য একটি করে পাঠশালা বানিয়ে দিয়েছে সরকার। পাঠদান করেন একজন করে নারী শিক্ষক। দিনে একবেলা রাঙ্গাপানির পাড়াকেন্দ্রে পড়তে যায় সুচিন্ত।

সুচিন্তের বাবা বিকু চাকমা আর মা গৌরিকা চাকমা। বিকু আগে চট্টগ্রামে মাইক্রোবাস চালাতেন, ২০১৭ থেকে রাঙ্গাপানিতে সিএনজি চালাচ্ছেন। ক্ষুদ্র অর্থায়ন সংস্থা আশার ঋণ দিয়েই কিনেছেন সিএনজিটা। তার দৈনিক আয় কম-বেশি দেড় হাজার টাকা। গৌরিকা বাড়িতে বেইন তাঁতে কাপড় বুনে বিক্রি করেন। দুজনের উপার্জনে চলছে সংসার। তবে আশার ঋণ নেওয়ার আগে এটুকু স্বচ্ছলতাও ছিলো না তাদের। একমাত্র সন্তান সুচিন্তকে নিয়ে এখনও কোন পরিকল্পনা নেই বিকু-গৌরিকার। স্কুলে যাওয়ার বয়স হলেই ভর্তি করিয়ে দেবেন স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, তারপর জেলা সদরের হাইস্কুল ও কলেজে। সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করার যথেষ্ট সময় তাদের আছে। একই সাথে আছে উদ্বেগও। পাহাড়ের আর্থ-সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এই উদ্বেগের কারণ। তারপরও সুচিন্তের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আয় বাড়াতে হবে, সঞ্চয় করতে হবে। কারণ ছেলেকে নিজের মতো সিএনজি চালক বানাতে রাজি নন তিনি। তাই আশা কিংবা বুরো বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলোই তার ভরসা।

রাঙামাটি

রাজবন বিহারের কঠিন চীবর দান

কঠিন চীবর দান বৌদ্ধ ধর্মের থেরবাদী দর্শনে একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ আচার বা অনুষ্ঠান। বৌদ্ধ ধর্মের দুটি শাখা বা যান রয়েছে। একটি মহাযান এবং অন্যটি থেরবাদ। চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও ভুটানের মতো দেশগুলোতে চর্চিত হয় মহাযানী বৌদ্ধ ধর্ম এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, লাওস ও শ্রীলঙ্কায় অনুসরণ করা হয় থেরবাদী বৌদ্ধ দর্শন। ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান বেশ বড় পরিসরের ধর্মীয় উৎসব। এটা শুধু উৎসব বা অনুষ্ঠানই নয়, এর সাথে জড়িয়ে আছে গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত জীবন দর্শন, বিভিন্ন ধর্মীয় আচার ও আর্থ-সামাজিক অনুসঙ্গ।

ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীদের নিয়ে কাজ করার জন্য আমরা যখন পার্বত্য চট্টগ্রাম গিয়েছি তখন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মাসব্যাপী এই বাৎসরিক উৎসব শুরু হয়ে গেছে। ফলে আগে থেকেই আমরা ঠিক করে রেখেছিলাম বান্দরবানের কাজ শেষে রাঙামাটি পৌঁছে এই অনুষ্ঠানের কিছু অংশ পর্যবেক্ষণ করবো। রাঙামাটির কঠিন চীবর দান উৎসব বেশ বড় পরিসরের। শহরের রাজবন বৌদ্ধ বিহারে অনুষ্ঠিত এই আয়োজন সরাসরি তত্ত্বাবধান করেন চাকমা রাজা ও রাজ পরিবার। রাজবন বিহারে পৌঁছতে হলে ইঞ্জিনচালিত নৌকায় পাড়ি দিতে হয় কাপ্তাই লেকের একটি অংশ। চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা ও ত্রিপুরা জাতিগোষ্ঠীর হাজার হাজার নারী-পুরুষ ও শিশুরা অংশগ্রহণ করে এই উৎসবে। ঐতিহ্যবাহী পণ্যের ছোটখাটো একটি মেলারও আয়োজন ছিলো এখানে। ঘাটের অনেকগুলো সিঁড়ি পেরিয়ে আমরা যখন রাজবন বিহারের ভেতরে যাই তখন অনুষ্ঠানের শেষ অধ্যায় চলছে। উঁচু মঞ্চে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা প্রার্থনা পরিচালনা করছেন আর সামিয়ানা ছাড়িয়ে খোলা প্রাঙ্গণে বসে কয়েক হাজার নারী-পুরুষ সেই প্রার্থনায় অংশ নিয়েছেন। নারী-পুরুষ বলতে কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, শিশু-বৃদ্ধ সবাই।

চীবর অর্থ চাদর। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা লাল-খয়েরি রঙের যে পোশাক পরিধান করেন পালি ভাষায় তাকেই চীবর বলা হয়। চীবরের প্রচলন আড়াই হাজার বছর আগে গৌতম বুদ্ধের সময়কাল থেকেই। ভিক্ষুদের এই সাধারণ পোশাককে ত্রি-চীবর বলা হলেও এর অংশ চারটি- দোয়াজিক, অন্তর্বাস, চীবর ও কটিবন্ধনী। বুদ্ধের সময় থেকেই কেউ স্বেচ্ছায় না দিলে ভিক্ষুরা কারো কাছ থেকে চেয়ে পোশাক বা চীবর গ্রহণ করতে পারতেন না। আড়াই হাজার বছর আগে জেতবন বিহারে গৌতম বুদ্ধের সাথে দেখা করার জন্য ত্রিশ জন ভিক্ষু রওনা হয়েছিলেন। বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে তারা অনেক কষ্টে বুদ্ধের কাছে পৌঁছতে সক্ষম হন। তাদের পড়নে একটি মাত্র চীবর ছাড়া আর কোন বাড়তি চীবর ছিলো না। ফলে এই ভিক্ষুদের দুঃসহ অবস্থা দেখে তিন মাসের বর্ষাবাস শেষে কঠিন চীবর দান গ্রহণ করার অনুমতি দেন তিনি।

কঠিন চীবর দান ও বর্ষাবাস একটি অপরটির সাথে শর্ত হিসেবে সম্পৃক্ত। বর্ষাবাস বা বর্ষাব্রত ছাড়া ভক্তদের কাছ থেকে কঠিন চীবর দান গ্রহণ করার অনুমতি নেই ভিক্ষুদের। বর্ষাবাস পালনের নির্দেশনা সরাসরি গৌতম বুদ্ধ প্রদান করেছিলেন। বর্ষাকালে প্রতিকূল আবহাওয়ায় পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে, এক জনপদ থেকে আরেক জনপদে পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করে ভক্তদের ধর্মদেশনা প্রদান করা ছিলো খুবই কষ্টসাধ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এ সময় বৃষ্টিতে ভিজে, একই পোশাকে রোদে শুকিয়ে ও বিষাক্ত কীটপতঙ্গের কামড়ে ভিক্ষুরা প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। অসুস্থতায় অকালে মৃত্যুবরণ করতে হতো অনেক ভিক্ষুকে। তাছাড়া বর্ষাকালে চলার পথে অনিচ্ছাকৃতভাবে অনেক সবুজ তৃণ ও

ক্ষুদ্র প্রাণী পদদলিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতো। ফলে ভিক্ষুদের স্বাস্থ্য ও জীবনের কথা চিন্তা করে বর্ষাকালের তিন মাস বিহারে অবস্থান করে ধ্যান, আত্মশুদ্ধি ও উপসোথ ব্রত চর্চার মাধ্যমে ধর্মীয় উৎকর্ষ অর্জনের বিধান প্রবর্তন করা হয়। তখন থেকে প্রতিবছর আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী বা প্রবারণা পূর্ণিমা পর্যন্ত এই বর্ষাবাস পালন করেন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা। একজন ভিক্ষু তার জীবদ্দশায় কতটি বর্ষাবাস পালন করলেন তার ওপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হয় তার ধর্মীয় জেষ্ঠ্যত্ব। যে ভিক্ষু ২০ বর্ষাবাস পালন করতে সক্ষম হন তাকে বলা হয় মহাথেরো বা মহাস্থবির। বর্ষাবাসকালে ধ্যান-সাধনা ও নিজ ভুল-ত্রুটির জন্য একে অন্যের কাছে ক্ষমা চেয়ে বিনয় চর্চা করেন তারা। পাশাপাশি মধ্যাহ্নের আগের দিনে এক বেলা খাদ্য গ্রহণ করতে হয় তাদের। এ সময় স্থানীয় ভক্ত বা দায়ক-দায়িকারা ভিক্ষুদের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী দান করেন। এই দান ধর্মীয় আচারের একটি অংশ।

তিন মাসের বর্ষাবাস শেষে প্রবারণা পূর্ণিমার পরবর্তী দিন থেকে কার্তিকী পূর্ণিমা পর্যন্ত এক মাসের মধ্যে যে কোন সুবিধাজনক সময় আয়োজন করা যায় কঠিন চীবর দান উৎসব। পালি ভাষার শব্দ কথিনার আক্ষরিক অর্থ কঠিন। অন্য একটি ভাষ্যে, যে তাঁতে ভিক্ষুদের জন্য চীবর তৈরি করা হয় তার নাম কথিনা। তবে ভিক্ষুদের দান করার জন্য ভক্তরা যে প্রক্রিয়ায় চীবর তৈরি করে সেটা কঠিন বলেই এই উৎসবের নাম কঠিন চীবর দান। কঠিন চীবর তৈরি করার জন্য ভক্তরা তুলা চাষ করেন। উৎসবের আগের দিন সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয় পর্যন্ত এই তুলা থেকে সুতা কেটে রঙ করা হয় গাছ-গাছড়ার বাকল, পাতা ও ফুল থেকে তৈরি রঙ দিয়ে। পরে এই সুতা দিয়েই বেইন নামক বাঁশের তাঁতে তৈরি করা হয় চীবর। একটি বেইনে এক সাথে চারজন কাপড় বুনতে পারেন। পুরো প্রক্রিয়াটিই শেষ করতে হয় এক সূর্যোদয় থেকে আরেক সূর্যোদয়ের মধ্যে। কায়িক, বাচনিক ও মানসিক শ্রমের মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা এই কঠিন চীবর বুননের কাজ সম্পন্ন করেন অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে। কারণ গৌতম বুদ্ধের উক্তি- কঠিন চীবর দানই বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। চীবর বুনন শেষে উৎসবের শেষ পর্যায়ে সম্মিলিত প্রার্থনার শেষ করে বিনয়ের সাথে এই এগুলো দান করা হয় ভিক্ষুদের মাঝে। তবে সবাই যে চীবর বুনে দান করেন তাও নয়। অনেকে বাজার থেকে কিনে এনেও চীবর দান করেন। তবে সেটা আর কঠিন চীবর দান হিসেবে স্বীকৃতি পায় না। ভিক্ষুরা মূলত দান হিসেবে পাওয়া এই চীবরগুলোই পরিধান করেন সারা বছর। যদিও কেউ চাইলেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত চীবর সংগ্রহে রাখতে পারেন না। পোশাক ও আহারের মিতব্যয়িতা বৌদ্ধ ধর্মে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অনুসৃত।

রাজবন বিহারে যখন প্রার্থনা চলছে আমরা তখন বিনয়ের সাথেই এদিক-ওদিক ঘুরে দেখছিলাম। ক্যামেরা হাতে আমাদের উপস্থিতি ভিক্ষু ও ভক্ত কাউকেই বিচলিত করেনি। কারণও আছে। এতো বড় এই উৎসবে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী দর্শনার্থী ও সাংবাদিকদের উপস্থিতি উৎসবের সাথে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। চীবর দান শেষে হাজারবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করছিলেন পুণ্যার্থীরা। হাজারবাতি বলতে মোমে মোড়ানো এক হাজারটি সুতাকে বোঝায়। অনেকে সরাসরি মোমবাতিও প্রজ্বলন করেন বেশি পুণ্যের আশায়। সব ধরনের ধর্মীয় আচার শেষ করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পাহাড়ি অধিবাসীরা যখন এগিয়ে যাচ্ছিলেন কাপ্তাই লেকের ঘাটের দিকে আমরও এগিয়ে চলছিলাম তাদের সাথে। কয়েক হাজার মানুষ ঘাটে জড়ো হয়েছেন নৌকায় ওঠার জন্য, অথচ ছিলো না কোন হুড়োহুড়ি। শান্তিপ্রিয় বৌদ্ধদের এই শৃঙ্খলাবোধ মুগ্ধ করেছে আমাদের।■

বান্দরবান

উজানীপাড়া রাজগুরু মহা বৌদ্ধ বিহার ও স্বর্ণ মন্দির

আমরা যখন বান্দরবান পৌঁছাই তখন বান্দরবানসহ সারা দেশে শুরু হয়েছে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বড় ধর্মীয় উৎসব কঠিন চীবর দান। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কর্মব্যস্ততা ভাষায় বর্ণনাতীত। এমন মহাব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের অপেক্ষায় বসে ছিলেন উজানীপাড়া রাজগুরু মহা বৌদ্ধ বিহারের সম্মানিত অধ্যক্ষ ড. সুবন্নলংকারা মহাথেরো। ড. সুবন্নলংকারা একজন পন্ডিত ব্যক্তিত্ব ও ধর্মগুরু। বৌদ্ধ ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী তিনি একজন মহাথেরো বা মহাস্থবির। ভারতের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক এবং বিহারের মগধ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষায় স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন তিনি। তার উদ্যোগে এই বিহারে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পালি ভাষা শিক্ষা কলেজ যেখানে পরবর্তীতে অন্তর্ভুক্ত হবে ইংরেজি ও বাংলা ভাষাও। এই কলেজের পাশাপাশি তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বিহারের অধীনে একটি বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠার, যার কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে।

উজানীপাড়া বৌদ্ধ বিহারটি বান্দরবানের সবচেয়ে বড় ও কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহার। এই বিহারের মূল পৃষ্ঠপোষক বোমাং সার্কেলের রাজা উচ প্রু। বৌদ্ধ বিহারগুলো একদিকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং একই সাথে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালয় ও অনাথ আশ্রম। উজানীপাড়ার এই বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো ১৮৯০ সালে। দেশের অন্যতম প্রাচীন এই বিহারের বর্তমান অভিভাবক ড. সুবন্নলংকারা মহাথেরো দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ২০১৯ সালে তার পূর্বসুরি অধ্যক্ষ উ. চাইন্দাওয়ারার প্রয়াণের পরে। বর্তমানে ড. সুবন্নলংকারাই বান্দরবানের সর্বজ্যেষ্ঠ বৌদ্ধ ভিক্ষু বা মহাথেরো।

ড. সুবন্নলংকারার সাথে দেখা হতেই শুভেচ্ছা বিনিময় করে আমাদের বসার অনুরোধ করলেন। বিহারের নিয়ম অনুযায়ী আমরা বসলাম মেঝেতে বিছানো কার্পেটে। আলাপচারিতার শুরুতেই তিনি জানালেন, বিহার পরিচালনার জন্য একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। এই পর্ষদের বর্তমান সভাপতি মারমা রাজকুমার চুহ্লা প্রু জিমি এবং সাধারণ সম্পাদক মং থোয়াই চিং হেডম্যান। এই পর্ষদই বিহারধ্যক্ষ নিয়োগ করে থাকে। বিহার পরিচালিত হয় মূলত ব্যক্তি পর্যায়ের অনুদানের মাধ্যমে। পাশাপাশি বিভিন্ন উৎসবে সরকারও থোক বরাদ্দ হিসেবে চাল প্রদান করে থাকে, অবকাঠামো

উন্নয়নেও রয়েছে সরকারের সহযোগিতা।

উজানীপাড়া বিহারের আশ্রমে বর্তমানে সাধারণ শিক্ষার্থী রয়েছে ১৫৬ জন। এই শিক্ষার্থীদের পরিবার হতদরিদ্র ও দুর্গম পাহাড়ি এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। সন্তানদের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে না পারলে অভিভাবকরা এই বিহারেই তাদের সন্তানদের অর্পণ করেন বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কাছে। ফলে আশ্রয়প্রাপ্ত এসব দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পড়ালেখাসহ সকল ধরনের দায়দায়িত্ব বহন করে বিহার কর্তৃপক্ষ। অনেক এতিম শিশুও বসবাস করছে উজানীপাড়া বৌদ্ধ বিহারের আশ্রমে। এই শিশুরা বিহারের নিজস্ব বিদ্যালয়সহ অধ্যয়ন করার সুযোগ পায় স্থানীয় সরকারি বিদ্যালয়গুলোতেও। উজানীপাড়া বিহারে আমরা যখন পৌঁছাই তখন মধ্য দুপুর। আশ্রমের শিক্ষার্থীরা তখন যার যার স্কুলে। ফলে তাদের সাথে কথা বলার সুযোগ আমাদের হয়নি।

বিহারে ধর্মীয় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৫ জন। তাদের বলা হয় শ্রমণ। এই শ্রমণরাই ধর্মীয় শিক্ষা ও সাধনার মধ্য দিয়ে পরিণত বয়সে বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসেবে অধিষ্ঠিত হবেন। তবে ৭ বছর বয়সের আগে কেউ শ্রমণ হিসেবে তার দীক্ষা জীবন শুরু করতে পারে না। শ্রমণদের প্রকৃত নাম জানতে চাওয়া নিষিদ্ধ। কেউ জানতে চাইলেও তারা তাদের নাম বলেন না। বিহারের ভিক্ষু বা ধর্মগুরুরা শ্রমণদের সম্বোধনের জন্য নিজেরাই নাম নির্ধারণ করে নেন। ২০ বছর বয়স পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা ও বিভিন্ন আচারে অভ্যস্ত হওয়ার পর শ্রমণরা ভান্তে হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। আর এই পর্যায়ে শুরু হয় ভান্তেদের নিয়মিত বাৎসরিক ত্রৈমাসিক বর্ষাবাস। এই বর্ষাব্রত মহামতি গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত একটি আত্ম উৎকর্ষমূলক ধর্মীয় আচার। প্রতি বছর আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বনী পূর্ণিমা পর্যন্ত তিন মাস ভান্তেদের ধ্যান, সাধনা, সংযম, আত্মশুদ্ধি ও ধর্মীয় শিক্ষা বিতরণের মাধ্যমে বর্ষাব্রত পালন করতে হয়। এভাবে দশ থেকে বিশ বর্ষাবাস সম্পন্ন করতে পারলে ভান্তেরা স্বীকৃতি পান থেরো বা স্থবির হিসেবে। আর যে থেরোরা জীবনে বিশ বর্ষাবাস অতিক্রম করতে সক্ষম হন তারা হয়ে ওঠেন মহাথেরো বা মহাস্থবির। এই মহাথেরোরাই বৌদ্ধ সমাজে সবচেয়ে সম্মানিত ও প্রাজ্ঞ ভিক্ষু হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে থাকেন। তারাই নেতৃত্ব দেন বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে।

আমাদের সাথে সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতা শেষে বিদায় নেবার আগে ড. সুবন্নলংকারা মহাথেরো আরো জানালেন, এই বিহারসহ বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহারের ভান্তে ও মহাথেরো শুধু ধর্মীয় কার্যক্রমেই নয়, নিয়োজিত আছেন বিভিন্ন পেশা ও সেবামূলক কাজে। অনেকেই কাজ করছেন বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়ে। কোন কোন ভান্তে স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের জন্য অবস্থান করছেন ভারত, মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। ধর্মীয় দর্শনের পাশাপাশি তারা সমাজে বিতরণ করছেন অর্জিত প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান ও চিন্তার আলো।

আমাদের প্রতি অধ্যক্ষ ড. সুবন্নলংকারা মহাথেরোর সহযোগিতা এখানেই শেষ নয়। মহা বৌদ্ধ বিহারের অদূরে বালাঘাটে অবস্থিত বিখ্যাত স্বর্ণমন্দিরটিও দেখার অনুমতি দিয়ে দিলেন তিনি। বিগত কয়েক বছর ধরে দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ রয়েছে এই ধর্মীয় তীর্থস্থান ও পর্যটন কেন্দ্র। মন্দিরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ভিক্ষুরা কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানের কারণে সেবেলায় ব্যস্ত থাকায় আমরা গেলাম বিকেল তিনটে নাগাদ। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১৬০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত এই উপাসনালয়কে মন্দির বলা হলেও এটি একটি প্যাগোডা। ১৯৯৫ সালে শুরু হয়ে এর নির্মাণকাজ শেষ হয়েছিলো ২০০৪ সালে। ব্যয় হয়েছিলো প্রায় ১০ কোটি টাকা। দক্ষিণ এশিয়ায় এটিই সর্ববৃহৎ হীনযান বৌদ্ধ মন্দির। অপূর্ব কারুকার্যময় এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডের প্যাগোডাগুলোর নির্মাণ শৈলীর অনুকরণে। এখানে স্থাপন করা হয়েছে গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িককালের একটি বুদ্ধ মূর্তি। বলা হয়ে থাকে এটিই বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বুদ্ধ মূর্তি। গোলাকৃতির এই মন্দিরের চারপাশে রয়েছে বুদ্ধের আরো ১২টি মূর্তি। দৃষ্টিনন্দন এই বৌদ্ধ উপাসনালয়টি সবমিলিয়ে অতুলনীয় একটি স্থাপনা। তবে এটাকে স্বর্ণমন্দির বলা হলেও এটি স্বর্ণ নির্মিত নয়। সোনালি রঙের কারণেই মূলত এই নাম। আর এই মন্দিরের প্রাতিষ্ঠানিক নাম মহাসুখ প্রার্থনাপুরক বুদ্ধ ধাতু জাদী।■

দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত মহাসুখ প্রার্থনাপুরক বুদ্ধ ধাতু জাদী বা স্বর্ণমন্দির। ধাতু বলতে পবিত্র ব্যক্তির দেহ বা ব্যবহৃত অংশ বিশেষ বোঝায়।
এই মন্দির চূড়া থেকেই চোখে পড়ে পুরো বান্দরবানের চোখ জুড়ানো দৃশ্য।

এ বি এম তাজুল ইসলাম

অর্থনীতির নতুন দিগন্ত
বৈচিত্র্যময় পাহাড়ি কৃষি

পাহাড়-অরণ্য উপত্যকা বেষ্টিত পাহাড়ি জনপদ, এক সময় যা ছিল আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও যোগাযোগবিহীন দেশের দুর্গম প্রান্তর। অধিকাংশ পাহাড়ি ভূমি যেখানে অনাবাদি থেকেছে বছরের পর বছর। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, আধুনিক ও উন্নত কৃষি প্রযুক্তির প্রসারে সময়ের সাথে সাথে বাড়ছে পাহাড়ি জনপদে কৃষি অর্থনীতির পরিধি। সমতল ভূমির পাশাপাশি মাঝারি উচ্চতার পাহাড়ে চাষাবাদে বদলে যাচ্ছে মানুষের জীবন। বহুমাত্রিক বৈচিত্র্যময় কৃষিই পাহাড়ের অনন্য বৈশিষ্ট্য। দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পাহাড়ি কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলাসহ সিলেট, শেরপুর, মধুপুর, ময়মনসিংহ এবং নেত্রকোনা জেলার কিছু অঞ্চল নিয়েই মূলত এর কার্যক্রম বিস্তৃত। পাহাড়ি কৃষির হাত ধরেই আগামীর বাংলাদেশে সূচনা হতে যাচ্ছে রপ্তানিমুখী বাণিজ্যিক কৃষির নতুন দিগন্ত।

মাটির ধরন, ভূমির প্রকার, পানির প্রাপ্যতা বিবেচনায় একসময় পাহাড়ের কৃষি ছিল মূলত জুম নির্ভর কিন্তু গত এক দশকে পাহাড় হয়ে উঠেছে বৈচিত্র্যময় কৃষির স্বর্গরাজ্য। যেসব পাহাড় বছরের পর বছর অনাবাদি থাকত তা এখন আবাদের আওতায় আসছে। পাহাড়ি অঞ্চলে শিল্পাঞ্চল গড়ে না ওঠায় স্থানীয় মানুষের কাছে কৃষিই একমাত্র জীবিকার উৎস। এছাড়া বর্তমানে আধুনিক ও উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন ফসলের জাত আবিষ্কৃত হওয়ায় দুর্গম অঞ্চলের মানুষও এখন পরিকল্পিত ও বাণিজ্যিক কৃষির প্রতি আগ্রহী হচ্ছে। ফলে কৃষিতেই মানুষের সক্ষমতা আসছে। ঢালু প্রকৃতির হওয়ায় পাহাড়ের মাটিতে সূর্যের আলো বেশি পড়ে; এছাড়া অম্লীয় ধাঁচের মাটি, সূর্যের আলোর কৌণিক অবস্থান এবং অনুকূল পরিবেশের কারণে পাহাড়ের মাটি উদ্যান ফসলের জন্য অধিক উপযোগী।

কফি ও কাজুবাদামে নতুন স্বপ্ন

দেশের মানুষের কাছে কফি ও কাজুবাদাম দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বর্তমানে তিন পার্বত্য জেলায় প্রায় ১২ লাখ ৩৫ হাজার একর জমি অনাবাদি পড়ে আছে। প্রকৃতি ও বিরাজমান ফসলের ক্ষতি না করে এসব অনাবাদি জমি কফি ও কাজুবাদাম চাষের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব।

জাতীয় দৈনিক পত্রিকা থেকে পাওয়া তথ্য মতে গত কয়েক বছরে দেশে কাজুবাদাম আমদানির চিত্রটা রীতিমতো পিলে চমকে যাওয়ার মতো! ২০১৪-১৫ অর্থবছরে যেখানে ১৮ টন কাজুবাদাম আমদানি হয়েছিল সেখানে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আমদানি হয়েছে ৫৮০ টন এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে আমদানির পরিমাণ ১৯৮১ টন। মাত্র ছয় বছরের ব্যবধানে কাজুবাদামের আমদানি বেড়েছে প্রায় ১১০ গুণ! এভাবে প্রতিবছর হাজার হাজার কোটি টাকা শুধু কাজুবাদাম আমদানির কারণে বিদেশে চলে যাচ্ছে।

পার্বত্য তিন জেলা ছাড়াও ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া, হালুয়াঘাট এবং টাঙ্গাইল জেলার মধুপুরেও হতে পারে কাজুবাদামের চাষ। বাংলাদেশে কাজুবাদাম চাষের উপযোগী জমি রয়েছে প্রায় ১৩-১৫ লাখ একর। এর মধ্যে ৫ লাখ একর জমিতে কাজুবাদামের চাষাবাদ শুরু করা গেলে দেশে কাজুবাদামের উৎপাদন দাঁড়াবে প্রায় ৫ লাখ টন। বর্তমানে বান্দরবানে প্রায় ১ হাজার ৮০০ একর জমিতে কাজুবাদামের চাষ হচ্ছে। ২০১৮ সালে দেশে কাজুবাদামের উৎপাদন হয়েছিল ৯১৬ টন, ২০২১ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩২৩ টনে। আশার কথা, মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৩১ শতাংশ। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে শুধু পার্বত্য তিন জেলার অনাবাদি জমি কফি ও কাজুবাদাম চাষের আওতায় নিয়ে আসতে পারলে এই দুই ফসল থেকে বছরে প্রায় ১৬-১৭ হাজার কোটি টাকা আয় করা সম্ভব, যা বাংলাদেশের জন্য এক মাইলফলক হবে।

কাজুবাদামের আন্তর্জাতিক চাহিদাও লক্ষণীয়। প্রতিবছর বিশ্বে প্রায় ৬০ লাখ টন কাজুবাদাম উৎপাদিত হয়, যার আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য রয়েছে প্রায় ১৪.৯ বিলিয়ন ডলার যেখানে ভিয়েতনাম এককভাবে ৪ বিলিয়ন ডলারের কাজুবাদাম রপ্তানি করে থাকে। আমদানি-রপ্তানির এই পরিসংখ্যান থেকে কাজুবাদামের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনুধাবন করাটা খুব একটা কঠিন কাজ নয়।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনা করে বর্তমান সরকার পাহাড়ি এলাকায় কফি ও কাজুবাদাম চাষে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় পাহাড়ি এলাকায় বিনামূল্যে কৃষকদের মাঝে এসব গাছের চারা বিতরণ করা হচ্ছে। বাণিজ্যিকভাবে কফি ও কাজুবাদাম উৎপাদনের লক্ষ্যে পার্বত্য অঞ্চলে শত শত বাগান স্থাপন করা হয়েছে যা আগামী কয়েক বছরের মধ্যে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বেড়েছে মৌসুমি ফলের বাণিজ্যিক উৎপাদন

উচ্চফলনশীল ফলের জাত, উপযোগী ভূ-প্রকৃতি ও অনুকূল পরিবেশের কারণে পাহাড়ি এলাকায় গত এক দশকে গড়ে উঠেছে প্রচুর পরিমাণ আম, আনারস, পেঁপে, কলা, মালটা, ড্রাগন ফল জাতীয় উচ্চ মূল্যের নতুন নতুন বাণিজ্যিক ফলের বাগান। বিশেষ করে বারমাসি, আম্রপালি ও রাঙ্গুইন জাতের আম পাহাড়ি এলাকায় এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। এখানে পোকামাকড়ের উপদ্রব কিছু কম হওয়ায় ও মাটিতে রস কম থাকার কারণে পাহাড়ি আমের মিষ্টতা তুলনামূলকভাবে বেশি, ফলে এখানকার আমের চাহিদা বেশি। বাজারমূল্য ভালো হওয়ায় স্থানীয় বহু শিক্ষিত তরুণ যুক্ত হচ্ছে বাণিজ্যিক কৃষিতে এবং তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন উদ্যোক্তা। আম, আনারস, কলার পাশাপাশি পাহাড়ে এখন সম্প্রসারিত হয়েছে লিচু, মালটা ও ড্রাগন ফলের চাষ– যার ফলশ্রুতিতে এখন শহরের অলি-গলিতে সারা বছর ভ্যানে মৌসুমি ফল বিক্রি করতে দেখা যায়।

পাহাড়ে পতিত জায়গায় পরিকল্পিতভাবে যথাযথ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে ঘন পদ্ধতির ফলদ বাগান (Ultra High Density Plantation method) এবং মিশ্র ফলদ বাগান সৃজন বাণিজ্যিকভাবে অধিক লাভজনক। এছাড়া পাহাড়ের ভ্যালিতে পাহাড়ের উচ্চতা অনুসারে বারি আম-৩, বারি আম-৪, বারি আম-৮, বারি কলা-৩, বারি লিচু-২ ও ৩, চায়না লিচু-৩, বারি মাল্টা-১, দার্জিলিং কমলা, আনারস, পেঁপে, বারোমাসি কাঁঠাল, পেয়ারা ও লেবুজাতীয় ফলের আবাদ বাড়ানোর সুযোগ আছে। যথাযথভাবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উত্তম কৃষি চর্চা (Good Agricultural Practice-GAP) অনুসরণের মাধ্যমে আম, কলা, আনারস এবং পেঁপে আবাদ করলে এ সকল ফল বিদেশে রপ্তানি করার সুযোগ তৈরি হবে যা আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের নতুন দ্বার খুলে দেবে। এই ধরনের কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজন যথাযথ কারিগরি প্রশিক্ষণ। এ ক্ষেত্রে তরুণ কৃষি উদ্যোক্তাদের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সহায়তায় প্রয়োজনীয় কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি ঋণ সহায়তা প্রদান করা হলে উৎপাদশীলতা অনেক বৃদ্ধি পাবে যা দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

উচ্চমূল্যের মসলা চাষে আগ্রহ বাড়ছে পাহাড়ে

ভোগ্যপণ্যের মধ্যে মসলার বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি। প্রতিনিয়ত রান্নার অন্যতম উপকরণ হচ্ছে মসলা আর এক্ষেত্রে আমরা প্রায় পুরোপুরি আমদানিনির্ভর। বাংলাদেশ প্রতিবছর গড়ে প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার মসলা আমদানি করে থাকে এর মধ্যে প্রায় ২০০ কোটি টাকার এলাচ, ১৬০-১৭০ কোটি টাকার দারুচিনি এবং গোলমরিচ আমদানি হয়। আমাদের পাহাড়ি অঞ্চলের মাটি ও আবহাওয়া মসলা চাষের জন্য উপযোগী হওয়ায় বিগত কয়েক বছরে তিন পার্বত্য জেলাসহ মধুপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রত্যন্ত পাহাড়ি জনপদে স্থানীয় কৃষকদের উচ্চমূল্যের মসলা চাষে আগ্রহ বাড়ছে। এক সময় পাহাড়ি ফসল আদা, হলুদের স্থান দখল করছে দারুচিনি, তেজপাতা, আলুবোখারা, এলাচ, গোলমরিচ, বিলাতি ধনিয়ার মতো বিভিন্ন উচ্চমূল্যের মসলা। এতে দেশের চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে। মসলা ফসলের জন্য অধিক উপযোগী হওয়ায় সরকার এ সকল এলাকার প্রান্তিক কৃষকদের জন্য উচ্চমূল্যের মসলা চাষের বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

ক্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে সমন্বিত খামার কার্যক্রমে বাড়ছে আর্থিক সুফলতা

ক্রিক হলো দুই অথবা তিন পাহাড়ের সঙ্গে বাঁধ দিয়ে জলাধার তৈরি করা। এতে জলাধারে মৎস্য চাষের পাশাপাশি পাহাড়ের ঢালে বিভিন্ন সবজি এবং ফল ফসলের সমন্বিত খামার স্থাপনের মাধ্যমে আর্থিকভাবে অধিকতর লাভজনক হওয়ার সুযোগ রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে পাহাড়ের পতিত জমিতে ক্রিকের মাধ্যমে মাছ চাষসহ অন্যান্য চাষাবাদে দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পের মাধ্যমে পাহাড়ের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কাজ চলছে। পার্বত্য অঞ্চলের তিন জেলায় ইতোমধ্যে প্রায় তিন শতাধিক ক্রিক নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যার অধিকাংশরই নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। এসব ক্রিকের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ক্রিক পদ্ধতির অন্যতম সুবিধা হলো মাছ চাষের পাশাপাশি জলাধারের পানি দিয়ে গৃহস্থালির কাজ করা, শাকসবজিসহ অন্যান্য ফসলে সেচ প্রদানের সুযোগ তৈরি হয়। এ কাজের মাধ্যমে পাহাড়ের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুফলভোগীরা মাছ চাষের পাশাপাশি হাঁস-মুরগি পালন, শাকসবজির চাষ করে স্বচ্ছলতার পথে এগিয়ে গিয়েছে। এখন জুমচাষের পাশাপাশি 'ক্রিক পদ্ধতি'ই হতে যাচ্ছে পাহাড়ি কৃষির সম্ভাবনার নতুন সূর্য।

পাহাড়ি কৃষির সমস্যা ও সম্ভাবনা

পাহাড়ি অঞ্চলে কৃষির প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো শুষ্ক মৌসুমে তীব্র পানির সংকট, সেচের অভাব, মাটির উর্বরা শক্তি ও ফসলের কম উৎপাদনশীলতা, মাটি ক্ষয় ও ভূমিধস, প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানসম্মত কৃষি উপকরণ সহজলভ্য না হওয়া, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা ও জ্ঞানের স্বল্পতা, অপ্রতুল যাতায়াত ব্যবস্থা এবং উৎপাদিত শস্য বাজারজাতকরণে সমস্যা, পণ্যের ন্যায্য দাম না পাওয়া, পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ না পাওয়া, কালেকশন সেন্টার ও সংরক্ষণাগার না থাকা ইত্যাদি। তবে এতসব সমস্যা অতিক্রম করে সকল সম্ভাবনার সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে অনূর্বর পাহাড় এখন কৃষি অর্থনীতির নতুন দুয়ার।

বর্তমান সময়ে পাহাড়ি কৃষির সম্ভাবনার কথা বলতে গেলে প্রথমে আসবে বাণিজ্যিক কৃষির প্রসার, এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ও কৃষি উদ্যোক্তা তৈরি।

সম্ভাবনাময় ফসলের মধ্যে কাজুবাদাম ও কফি চাষ এবং এর প্রক্রিয়াজাত ও রফতানিকরণ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অধিক উৎপাদনক্ষম ফল যেমন– আম, কলা, কাঁঠাল, আনারস, পেঁপে, ড্রাগন ফল, জলপাই ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাত করে দেশি এবং বিদেশি বাজারে রপ্তানি করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

জুমের স্থানীয় জাতের ধানের পরিবর্তে জুমের জন্য বিআর-২৬, ব্রি ধান-২৭, ব্রি ধান-৪৮. ব্রি ধান-৫৫'র মতো উন্নত জাতগুলো অনেক বেশি লাভজনক হতে পারে। অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক করতে রঙিন ভুট্টা, তিল, মারফা, চিনাল, ছোট আকৃতির মিষ্টি কুমড়া, জুম করলাসহ আরো নানা রকম স্থানীয় সবজির জাত সমূহের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর ওপর গবেষণা করা প্রয়োজন।

মাটির ধরন অনুযায়ী উপযুক্ত ফসল নির্বাচনের জন্য ক্রপ জোনিং করা, উচ্চফলনশীল ধানের আবাদ বাড়ানো, বছরব্যাপী সবজি উৎপাদন, হাইব্রিড জাতের তুলা চাষ সম্প্রসারণ, লাভজনক জুম চাষের জন্য ফসলের উপযুক্ত জাত বাছাইকরণ, পাহাড়ের উচ্চতা অনুযায়ী বিদেশি ফল এবং উচ্চমূল্য ফসলের উপযোগিতা যাচাইকরণসহ যথাযথ উত্তম কৃষি চর্চা (GAP) অনুসরণের মাধ্যমে পাহাড়ি জনপ্রিয় কৃষিপণ্য চা, কফি, কাজুবাদাম, কমলা, আনারস, পেঁপে বা কলাসহ অন্যান্য ফলের উৎপাদন এবং এর ব্র্যান্ডিংকরণের মাধ্যমে বিদেশের বাজারে এ সকল পণ্য রফতানির সুযোগ সৃষ্টি করতে পারলে বদলে যাবে বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতির গতিপথ। বিজন পাহাড়-ই হবে আগামী বাংলাদেশের অর্থনীতির নতুন দিগন্ত আর প্রশিক্ষিত তরুণরাই হতে পারে এ পরিবর্তনের বাজির ঘোড়া।■

● লেখক : সহকারী কর্মকর্তা-কৃষি
বুরো বাংলাদেশ

পাহাড়ে-সমতলে | ১

পাঁচ টাকার কুসুম্বা মসজিদ

রাজশাহী বিমানবন্দর থেকে আমাদের গন্তব্য ছিলো মহাদেবপুর সাঁওতাল পল্লী। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আশ্রয় এ উপজেলার সাঁওতাল ও ওঁরাও জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো সমতলের এই দুই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নিয়ে আশ্রয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা নেওয়া। তবে মহাদেবপুর যে নওগাঁ জেলায়, রাজশাহীতে নামার আগ পর্যন্ত জানতাম না। আমাদের গাড়িচালক জিয়ার কাছ থেকেই জানতে পারলাম, আমরা আসলে আড়াই ঘন্টা ড্রাইভ করে নওগাঁ যাচ্ছি। জিয়া শুধু গাড়ি চালকই নয়, একজন পাকা টুরিস্ট গাইডও। বাড়ি এ অঞ্চলেই, চাঁপাইনবাবগঞ্জে। ফলে এখানকার খুঁটিনাটি সবকিছু তার নখদর্পণে।

রাজশাহী-নওগাঁ হাইওয়ে দিয়ে ঘন্টা খানেক চলার পর জিয়ার কাছেই শুনলাম পথেই পরবে ঐতিহাসিক কুসুম্বা মসজিদ। হাইওয়ে থেকে কয়েক মিনিটের পথ। সাথে সাথেই সিদ্ধান্ত নিলাম দশ মিনিটের জন্য হলেও থামতে হবে আমাদের। কারণ এমন একটি প্রাচীন স্থাপনার গা ঘেষে যাবো কিন্তু দেখা হবে না, সেটা হয় না। দূরত্ব বেশি হলে না হয় একটা সান্ত্বনা থাকতো!

কুসুম্বা একটি গ্রামের নাম। গ্রামের নামেই মসজিদ। আমাদের গাড়ি যেখানটায় গিয়ে দাঁড়ালো তার দু'পাশে সারি সারি অনেকগুলো দোকান। চা-পান এর দোকান, মিষ্টির দোকান, টানা-কটকটির দোকান এবং এমনকি খেলনার দোকানও আছে। বোঝাই যাচ্ছিলো পর্যটকদের আনাগোনা একেবারে কম নয়। সব বয়সীরাই আসে।

রাজশাহী শাহ মখদুম বিমানবন্দর

আমরা যখন পৌঁছেছি তখন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। চট করেই গা ভিজে যাওয়ার মতো নয়, আবার ছাতা ছাড়া খুব বেশিক্ষণ বাহাদুরী দেখাবার মতোও নয়। ফলে কিছুটা ঝামেলা তো ছিলোই।

মসজিদ প্রাঙ্গণ একটু উঁচুতে, দু-তিনটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হলো। নতুনকালে এই উচ্চতা যে আরো বেশি ছিলো তা বেশ সহজেই অনুমান করা যায়। পূর্ব দিকটায় ৭৭ বিঘার সুবিশাল দিঘি, লোকে বলে কুসুম্বা সাগরদিঘি। কিন্তু এদিকটায় সৌন্দর্য বর্ধন করতে গিয়ে এমনভাবে গাছ লাগানো হয়েছে যে কয়েক ডজন সিঁড়ি মারিয়ে ঘাটে না নামলে পুরো দিঘিটা চোখে পড়ে না। এক সৌন্দর্য আরেক সৌন্দর্যকে নষ্ট করেছে আমাদের অজান্তেই। অথচ বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত এই মসজিদের পরিচর্যায় আরো বেশি পেশাদারিত্ব ও নান্দনিকতার ছোঁয়া থাকা প্রয়োজন ছিলো।

মান্দা উপজেলার কুসুম্বা গ্রামে এই মসজিদ নির্মিত হয়েছিলো ১৫৫৮ কিংবা ৫৯ সালে। সে হিসাবে বয়স ৪৬৪ বছর। তখন বাংলা শাসন করতেন আফখানি শূর বংশের সুলতান গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহ। তবে সুলতান কিংবা তার মন্ত্রীবাহাদুরদের কেউ এই মসজিদ নির্মাণ করেননি। যিনি এই মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা তার নাম সোলায়মান এবং এটুকু

ছাড়া তার সম্পর্কে আর তেমন কিছুই জানা যায় না। ৬ গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদ দৈর্ঘ্যে ৫৮ এবং প্রস্থে ৪২ ফুট। ভেতরে ও বাইরে পুরো মসজিদের দেয়াল কালো ও ধূসর পাথরে নির্মিত। এমনকি মেঝেও। এজন্য স্থানীয়রা এর নাম দিয়েছে কালাপাহাড়। দেয়ালে লতা-পাতাসহ বিভিন্ন জ্যামিতিক কারুকাজ করা। চার কোণায় চারটি অষ্টভুজা মিনার আছে, কিন্তু এগুলো মসজিদের ছাদের উচ্চতার সমান হওয়ায় প্রথম দর্শনে মিনার বলে মনে হবে না। কালাপাহাড়ের দেয়ালের সাথে মিল আছে কুড়িগ্রামের চিলমারি স্থলবন্দরের কাছে ছোট সোনা মসজিদের। সেটা আরো কালো এবং আরো বেশি কারুকার্যময়। অনেক বছর আগে এই মসজিদটিও দেখার সুযোগ আমার হয়েছিলো।

কুসুম্বা মসজিদ বেশ ঢাউস। খুব ভালো করে দেখতে সময় লাগবে। ২০০৬ সালে মুদ্রিত পাঁচ টাকার নোটে এই মসজিদের ছবি আছে। এজন্য লোকে একে পাঁচ টাকার মসজিদও বলে। কুসুম্বা মসজিদের নির্মাণ ব্যয় জানা না গেলেও টাকার অঙ্কটা যে অনেক বড় ছিলো তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মসজিদে মোট তিনটি দরজা। সবগুলোই পূর্ব দিকে ও খিলান করা। একটা দরজার খিলানে বিশাল মৌচাক। খাদেম বললেন, এখন একটা থাকলেও তিনটা দরজাতেই মৌমাছিরা নিয়মিত চাক বাঁধে।

মসজিদের ভেতরে প্রবেশের পর সবকিছু ছাপিয়ে প্রথমেই চোখে পড়বে কালো পাথরের একটি উঁচু মঞ্চ বা বেদী। এর আগে অনেক প্রাচীন মসজিদ দেখেছি, কিন্তু এমন উঁচু মঞ্চ এই মসজিদেই প্রথম দেখলাম। তবে অনুমান করতে কষ্ট হয়নি, সে আমলে এখান থেকেই কাজীর বিচারকার্য চলতো এবং হয়তো জুমার খুতবাও দেওয়া হতো। কুসুম্বা মসজিদের মিম্বর তিনটি। দুটি নিচে আর তৃতীয়টি এই মঞ্চের ওপরে। মঞ্চে ওঠার সিঁড়িটাও কালো পাথরের এবং বেশ সরু। ওঠা-নামা করতে সতর্ক থাকতে হয়েছে। কারণ স্বল্প আলোতে পাথরের এই সিঁড়িতে পা পিছলে পরে গেলে দাঁতের সংখ্যা কমে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। দশ মিনিটে হয়নি, কুসুম্বায় আমরা ছিলাম ত্রিশ মিনিট। বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। আমাদের গন্তব্যের পথ দীর্ঘ হওয়ায় পেছনে এই কালাপাহাড় রেখে আবারও ছুটতে শুরু করলাম মহাদেবপুরের দিকে।

বিরিশিরি : পাহাড় যেখানে রঙ বদলায়

নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমার ধারণা ছিলো সোমেশ্বরী নদীর এপারে দুর্গাপুর আর ওপারে বিরিশিরি। কিন্তু যাওয়ার পরে আবিষ্কার করলাম এপারেই বিরিশিরি আর ওপারে দুর্গাপুর। নামগুলোও বেশ- সোমেশ্বরী, সুসং দুর্গাপুর, বিরিশিরি, রানি খং। বিরিশিরি নামটার মধ্যে এক ধরনের নান্দনিকতা খুঁজে পাই। নামটা যেমন শ্রুতি মধুর তেমনি পর পর চারটি হ্রস-ই কার থাকায় এর লিখিত রূপটিও শৈল্পিক মনে হয় আমার কাছে। বিরিশিরি শব্দটির অর্থ কী তা জানতে পারেনি। তবে সুসং দুর্গাপুর এর 'সুসং' শব্দের অর্থ নিয়ে অনেক আগে থেকেই একটা জিজ্ঞাসা ছিলো। এবারের ভ্রমণে তার সমাপ্তি ঘটেছে একটি স্কুলের নামের আগে 'সুসঙ্গ দুর্গাপুর' লেখা দেখে। এরপর চোখে পড়লো একই বানানের আরো কয়েকটি সাইনবোর্ড। নিশ্চিত হলাম সুসং মানে সুসঙ্গ, অর্থাৎ সৎ সঙ্গ।

দুর্গাপুর ভ্রমণে আমাদের প্রথম লক্ষ্য ছিলো এখানকার একটি হাজং গ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সম্মক ধারণা নেওয়া। হাজংদের যে গ্রামে আমরা যাচ্ছিলাম তার নাম গোপালপুর। মেঠো পথ, বেশ কাছেই পাহাড়। পথের পাশেই সরু একটি খালের তলা ঘেঁষে প্রবহমান জলের ধারা। প্রথমে সাধারণ খাল মনে হলেও এক হাজং নারীর মুখে শুনলাম এ খালের পানি দূরের এক ঝরনা থেকে প্রবাহিত। এ কথা শুনে একটু দাঁড়িয়ে সেই জলের বয়ে চলা দেখলাম। ভরা বর্ষায় খালটিও নাকি ভরে উঠে ঝরনার জলে। এক পা দু'পা করে যখন চলতে শুরু করেছি ঠিক তখনই চোখে পড়লো বেগুনি রঙের চমৎকার এক বুনো ফুল। দেখেই মুগ্ধ হলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে দৃষ্টিসীমায় এলো এই ফুলের আরো অনেকগুলো গাছ। এতক্ষণ তীব্র রোদে ওগুলো নজরে আসেনি। তাছাড়া চোখের চশমাটাও তো ছিলো কালা কালা। হাজংদের কাছে থেকে পরে জেনেছি এর নাম ত্বকলে। একটা ছিঁড়ে হাতে নিলাম, ঘ্রাণ নেই। মিনিট খানেকের মধ্যেই মলিন হয়ে গেলো। আমি পাহাড়ি নই বলেই হয়তো সখ্য করতে চায়নি ত্বকলে!

আমাদের পরের গন্তব্য ছিলো বিজয়পুরের বহেরাতলী গ্রামে কুমুদিনী হাজং এর বাড়ি।

সোমেশ্বরী পাড়ি দিতে হবে বহেরাতলী যেতে। পথেই পরবে সেই চীনামাটির পাহাড়। এটা কুল্লাগড়া ইউনিয়নে। শেষ বিকেলেই নাকি দেখা মিলে এই পাহাড়ের আসল সৌন্দর্য। তাই কুমুদিনীর বাড়িতে যাওয়ার আগে ওখানেই যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। ওপারে যেতে সোমেশ্বরীর অর্ধেকটাই পাড়ি দিতে হয় পায়ে হেঁটে। বিশাল বালুচর, রঙ কোথাও লাল, কোথাও সাদা। এই নদী থেকেই উত্তোলন করা হচ্ছে শত শত টন লাল বালি। স্থানীয়দের একজন বললেন, নির্ধারিত সংখ্যার তিনগুণ বেশি ড্রেজিং মেশিন বসানো হয়েছে এখানে। এজন্যই নদীর এই করুণ অবস্থা। প্রতিদিন শত শত ট্রাক ভেজা বালু নিয়ে চলাচল করে এপার থেকে ওপারে। ফলে বিরিশিরি ও দুর্গাপুরের কয়েক কিলোমিটার রাস্তা পরিণত হয়েছে ডোবা-নালায়। এ যেন চির বর্ষার এক জনপদ। এই ছোট্ট শহরে ঘরের বাইরে বের হলে গায়ে কাদা না মেখে কেউ ঘরে ফিরতে পারে না।

আমরা তিনটি মোটরসাইকেল নিয়ে খেয়া নৌকায় উঠলাম। ভাড়া নিলো ২০ টাকা করে। তারপর পাকা রাস্তা ধরে বিজয়পুরের চীনামাটির পাহাড়ে। অদ্ভুত সুন্দর জায়গা। শেষ বিকেলে আকাশ রঙ বদলায়, আর সেই সাথে রঙ বদলায় চীনামাটির পাহাড় ও এর সামনের জলাধার- কখনো নীল আবার কখনো সবুজ। আর আকাশে গোলাপি আভা থাকলে দেখা মিলবে পাহাড় ও জলের গোলাপি রূপের সৌন্দর্যটাও। এ যেন রঙ বদলের খেলা। ভূতাত্ত্বিক জরিপ চালাতে যে ১৩টি কূপ খনন করা হয়েছিলো সেগুলোতেই পানি জমে তৈরি হয়েছে এই নয়নাভিরাম জলাধারগুলো।

বিজয়পুরে চীনামাটির এই পাহাড়গুলো আবিষ্কৃত হয়েছিলো ১৯৫৭ সালে। ১৫ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে খণ্ড খণ্ডভাবে ছড়িয়ে আছে এই খনিজ পাহাড়গুলো। আরেক নাম সাদা পাহাড়। তবে পুরোপুরি সাদা নয় এই মাটি, বলা চলে সাদাটে। কোথাও গোলাপি, কোথাও হলদেটে। বিজয়পুরে মজুদ আছে ২৪ লক্ষ ৪০ হাজার মেট্রিক টন চীনামাটি যা দিয়ে তিনশ বছরের চাহিদা মেটানো সম্ভব দেশের সিরামিক শিল্পের।

পরের দিন সকালে আমরা গিয়েছিলাম কিংবদন্তি কমিউনিস্ট নেতা ও কমিউনিস্ট পার্টি-বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মণি সিংহ মিউজিয়ামে। কমরেড মণি সিংহের ছেলে দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক ড. দিবালোক সিংহের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় আগ্রহ দেখিয়ে ছিলাম এই মিউজিয়ামে আসার।

তিনি বলে রেখেছিলেন তত্ত্বাবধায়কদের। কমরেড মণি সিংহের নাম এতোদিন বইপত্রেই পড়েছি, এ যাত্রায় এই মিউজিয়ামে রাখা তার বিভিন্ন ঐতিহাসিক ছবি ও ব্যবহৃত জিনসপত্র দেখে সমৃদ্ধ করেছি আমাদের অভিজ্ঞতা। তবে সময়ের অভাবে যাওয়া হয়ে ওঠেনি তার পৈতৃক বাড়িতে।

সুসঙ্গ দুর্গাপুর থেকে আমরা রওনা হলাম মধুপুরের দিকে। সোমেশ্বরীর সেতু পার হতেই প্রত্যয়ের সম্পাদক ফেরদৌস ভাই বললেন, 'বইয়ের সেলফওয়ালা একটা সেলুন চোখে পড়লো।' আমি দেখিনি তবে এমন একটা সেলুন দেখার সুযোগ হাতছাড়াও করতে চাইনি। তাই খুব বেশি দেরি হওয়ার আগেই গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। ডোবা-নালার মতো রাস্তায় আমাদের গাড়ির সামনে-পেছনে কয়েক ডজন বালুর ট্রাক, গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখার উপায় নেই। ফেরদৌস ভাই গাড়ি নিয়ে সামনে এগুতে থাকলেন, আর আমি সেলুনের খোঁজে উল্টো পথে হাঁটতে শুরু করলাম। এই সেলুনটি যার তার নাম কৃষ্ণকান্ত শীল। বাড়ি দক্ষিণ ভবানীপুর। একজনের চুল কেটে

দিচ্ছিলেন তিনি। কথা বলার অনুমতি নিয়ে আমি বইয়ের সেলফ সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি জানালেন, চুল কাটাতে এসে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় তার কাস্টমারদের। অপেক্ষার এই সময়টা খুব সহজেই যাতে তারা পার করতে পারেন সে জন্যই এই ব্যবস্থা। চুল কাটাতে এসে যদি একটা ভালো বই পড়া হয়ে যায় তাহলে মন্দ কি- এই চিন্তাও কাজ করেছে তার এই উদ্যোগের পেছনে। কৃষ্ণকান্তের এই সেলুন-লাইব্রেরির অধিকাংশ বই তিনি নিজে কিনেছেন, আর কিছু পেয়েছেন দুর্গাপুরের একটি লাইব্রেরি থেকে। আমার আগ্রহ দেখে বইয়ের সেলফের সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যয়ের জন্য নিজের ছবিও তুললেন বিরিশিরির এই অসাধারণ নরসুন্দর কৃষ্ণকান্ত। কৃষ্ণকান্তকে ধন্যবাদ জানিয়ে কয়েক ডজন বালুর ট্রাকের ভিড়ে আমাদের গাড়িটা খুঁজতে শুরু করলাম।■

● বিদ্যুত খোশনবীশ
নির্বাহী সম্পাদক, প্রত্যয়

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও বাংলাদেশ : পরিপ্রেক্ষিত কুমিল্লা

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে অংশগ্রহণ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রযুক্তির ব্যবহার এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন ধারণা বর্তমান যুগে একটি অবশ্যম্ভাবী বিষয়। ২০৪১ সালের উন্নয়ন চিন্তাকে সামনে রেখে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে রচিত বইটিতে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব নিয়ে বাংলাদেশের প্রস্তুতির বাস্তবচিত্র প্রচ্ছদিত হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আলোচনা, ব্যবহারিক বাস্তবায়ন ও গণমানুষের সম্পৃক্ততার চিত্রায়ন পাওয়া যায় **'চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও বাংলাদেশ : পরিপ্রেক্ষিত কুমিল্লা'** বইটিতে।

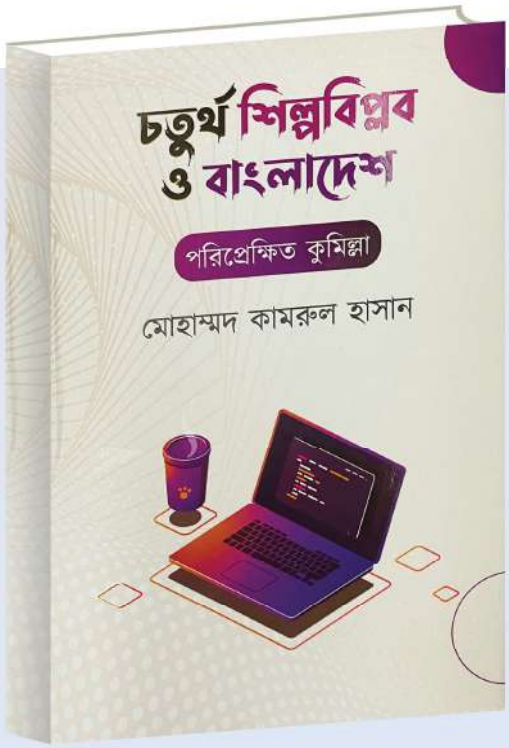

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও বাংলাদেশ
প্রকাশক : ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ
পরিবেশক : যুক্তরাষ্ট্র-মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
অনলাইন পরিবেশক : rokomari.com, othoba.com
প্রচ্ছদ : আবরার মাহমুদ হাসান মূল্য : ২৭৫ টাকা

মোহাম্মদ কামরুল হাসান
ময়মনসিংহ জেলার সদর উপজেলার কুষ্টিয়া নামাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণিবিদ্যায় বিএসসি সম্মানসহ এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় হতে গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে এমএ এবং যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব বেডফোর্ডশায়ার হতে প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি জাতীয় উন্নয়ন ও পরিকল্পনা একাডেমি হতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি একজন বিসিএস কর্মকর্তা হিসেবে বর্তমানে কুমিল্লার জেলা প্রশাসক। ইতোমধ্যে বিভিন্ন জার্নালে তাঁর খাদ্য নিরাপত্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কতিপয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এই শিল্পবিপ্লবের প্রধান হাতিয়ারের অবয়ব রূপে প্রকাশ পেয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ব্লকচেইন প্রযুক্তি ও ন্যানো টেকনোলজি যা আমরা বর্তমানে প্রত্যক্ষ করছি। এছাড়া রোবোটিক্স, বায়ো টেকনোলজি, ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি) ও অন্যান্য প্রয়োগিক প্রযুক্তির উৎকর্ষতাও সহজে অনুমেয়। দক্ষ জনশক্তির পেশা হিসেবে ফ্রিল্যান্সিং ও মার্কেট প্লেস বিষয়ে সুন্দর আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া ফ্যাবল্যাব: ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের কারখানা একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ ।

কুমিল্লার জনগোষ্ঠী বিশেষ করে ছাত্র সমাজকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের অনুসারী হিসেবে গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে তা সত্যিই প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয়। প্রয়োগিক কর্মশালার বিশদ আলোচনা, শিক্ষার্থীদের অভিমত ও প্রাসঙ্গিক চিত্র বইটির উৎকর্ষতাকে আরো সমৃদ্ধ করেছে ।

বিজ্ঞানমনস্ক ও সমৃদ্ধ চেতনার লেখক জনাব কামরুল হাসান বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির জটিল বিষয়সমূহকে সহজ ও সুন্দর ভাষায় সাধারণের জন্য উপস্থাপন করেছেন। একইসাথে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের পথে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার একটি পথপরিক্রমাকে সাবলীলরূপে চিত্রায়ন করেছেন যা এই বিপ্লবে বাংলাদেশের অংশীদারিত্বের প্রমাণক হিসেবে উপস্থাপন যোগ্য।

সন্দেহ নেই বর্তমান পৃথিবী নব প্রযুক্তিগত আবিষ্কার এবং তা ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। মানুষের মনোজগতে ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে। গতকাল যা ছিল অসম্ভব তা আজ কেবল সম্ভবই নয় মানুষের হাতের মুঠোয় এসেছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় আজ যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে তা দু'দিন পরেই অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে।

২০৪১ সালে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার যে স্বপ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন তা যে বাস্তবে রূপ নেবে এ ব্যাপারে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব যে পথ প্রদর্শক হতে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন এবং ব্যবহার আমাদের সমাজকে ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশে রূপান্তরিত করবে এটা নিশ্চিত।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব সংগঠনের জন্য সরকারি পর্যায় থেকে যে নীতি ও সহযোগিতা প্রয়োজন তা সরকার যথাযথভাবে দিচ্ছে। তথাপি এ কথা অনস্বীকার্য সরকারি অফিস-আদালত এবং সরকারি কর্মকাণ্ডে এখনও প্রাগৈতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি বিরাজমান রয়েছে। এ জায়গায় পরিবর্তন না আনা গেলে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার সম্ভাবনা দূরবর্তী হয়ে পড়বে।

সরকারের মাঠ প্রশাসনের ইতিবাচক ভূমিকা নিঃসন্দেহে সমাজকে আশার আলো দেখাবে। কুমিল্লা জেলার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামরুল হাসান এই পথের অগ্রণী সৈনিক হিসেবে নিজের অবস্থান নির্দিষ্ট করেছেন। ৬০-এর দশকে ড. আকতার হামিদ খান যেমন গ্রামীণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে পথ নির্দেশ করেছিলেন তেমনি জনাব হাসানকে তার উত্তরাধিকার বলা কম হবে।

ফ্রিল্যান্সিং এবং আউটসোর্সিং কাজে যে সকল ছেলেমেয়েরা জড়িত রয়েছেন তাদেরকে বিশেষ ট্যাক্স সুবিধা প্রদান করতে হবে যাতে করে তাদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সহজেই দেশে আনতে পারেন।

সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞানমনস্ক মনোভাব গড়ে ওঠার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি হয়েছে। মোহাম্মদ কামরুল হাসানের লিখিত বইটি পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে।

লেখকের বিজ্ঞানমনস্ক মানবসম্পদ তৈরির প্রয়াস ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার পথকে আরো নমনীয় করার অভিপ্রায়কে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং সেইসাথে বইটির বহুল প্রচার ও সাফল্য কামনা করছি।■

● **এম. মোশাররফ হোসেন**
পরিচালক- অর্থ, বুরো বাংলাদেশ

● **জাহাঙ্গীর আলম**
কর্মকর্তা- আইসিটি, বুরো বাংলাদেশ

বুরোর ঋণে বদলে যাচ্ছে ওঁরাও নারী শেফালী'র জীবন

মহাদেবপুর উপজেলার বকাপুর গ্রামের শেফালী বারোয়া ও বিপ্লব টপ্পার জীবন মান বদলে গেছে বুরো বাংলাদেশ এর ঋণ সহায়তায়। শেফালী বারোয়া অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন। শেফালীর বাবার নাম সুনেয়া বরোয়া এবং মা মালতী এক্কা। তাদের বাড়ি পোরশা থানার বড়গ্রাম। অর্থের অভাবে অর্থাৎ পিতার সংস্থার অসচ্ছল থাকায় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার সুযোগ পেয়েছেন। তার স্বামী বিপ্লব টপ্পা দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন। তার পিতার নাম বুদো টপ্পা, মা সুন্দরবালা এক্কা।

শেফালী ও বিপ্লবের বিয়ে হয় ২০১৮ তে। দুজনের পরিবারই ছিল দরিদ্র। বিপ্লব টপ্পা টাকার জন্য এসএসসি পরীক্ষা দিতে পারেননি। সে বকাপুর হাই স্কুলের ছাত্র ছিল। বকাপুর হাই স্কুলে সে ছিল খুব পরিচিত মুখ, কারণ সে ভালো ফুটবল খেলতো। তার ইচ্ছে ছিল বড় ফুটবল খেলোয়াড় হবে, কিন্তু সুযোগের অভাবে হতে পারেনি।

ছোটবেলা থেকেই ওরা কর্মঠ পারিবারিকভাবেই। বিপ্লব পড়াশোনার পাশাপাশি বন্ধের দিনগুলোতে হাটে হাটে বাদাম বিক্রি করতো। মাঠে মজুরিতেও কাজ করতো। এ সময় সে অ্যামব্রয়ডারি কাজ শেখে যাতে ঝড় বৃষ্টিতেও ঘরে বসে কাজ করা যায়, আয় বন্ধ না হয়।

বিপ্লব টপ্পা বুরো বাংলাদেশ থেকে ৩০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছে। তার নিজের ৩২ হাজার টাকা মিলিয়ে একটা গাভি ক্রয় করে। ১ কেজির বেশি দুধ হয়। কিন্তু সে ১ কেজির বেশি গাভি থেকে গ্রহণ করে না। বাকিটুকু ওলানে রেখে দেয় বাছুরের জন্য। আর দুধ বিক্রি না করে শিশু সন্তানকে খাওয়ায়। তার বাছুরটা নেপালি জাতের। ৩ মাস বয়সের এই বাছুরটির দাম উঠেছে ৬৫ হাজার টাকা। বিপ্লব বললো ১ বছর পর এর দাম ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা হবে। বিপ্লবের বাবা-মা দুজনেই মাঠে কাজ করে। আগে ১৫০/২০০ টাকা ছিল মজুরি, এখন তা ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা।

বিপ্লবের ১ ছেলে, নাম কৃষ্ণ টপ্পা। বয়স আড়াই বছর। সিজনে ২০ দিন খেটে তারা আগে পেতো ৪০ হাজার টাকা এখন পায় ৭০/৮০ হাজার টাকা। এক সময় তাদের খুব অভাব ছিল, এখন উন্নতি হয়েছে। আগে পুকুর থেকে পানি এনে ভাত রাঁধতে হতো। এখন মোটর দিয়ে পানি উঠিয়ে সেই পানি পানসহ ভাত রাঁধে। তবে এখনো বড়গ্রামের অনেক মানুষই পুকুরের জল দিয়ে ভাত রান্না করে।

বুরো বাংলাদেশের ঋণ সহায়তা ও সামাজিক সচেতনতা তৈরির কারণে এখন তাদের অনেকেই টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করে। বিপ্লবের ঘরে ফ্রিজও আছে। বাচ্চার অসুস্থতা মুহূর্তে ডাক্তার যে ওষুধ দিয়েছে তা ফ্রিজে রাখতে হয়। ফ্রিজটি ২৭ হাজার টাকায় তা ক্রয় করেছে। তাদের পরিবার সুখী পরিবার। এই পরিবারের সম্পদ ২টা গরু, ১টা ছাগল, ২টা রাজহাঁস, ৫৫টা মুরগি (দেশি)। ৪টা ডিম পাড়ে। ডিম শিশুকে খাওয়ানো হয়। তবে নিজেদের কোনো ফসলি জমি নেই।

বিপ্লবের বাবা বুদো টপ্পা একটি পুকুরের পাহারাদার। দিনে মাঠে মজুরি দেন, রাতে পাহারা দিয়ে মাসে ৭০০০ টাকা পান। এভাবেই তাদের সংসার স্বচ্ছল হয়ে উঠেছে। বিপ্লব টপ্পা বলেন, আমাদের এই স্বচ্ছলতা ও উন্নয়নের পেছনে বুরো বাংলাদেশের ঋণ সহায়তাসহ তাদের পরামর্শ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। ভবিষ্যতে অধিক টাকা ঋণ নিয়ে তিনি তার অ্যামব্রয়ডারি মেশিন আরো বাড়াতে চান।■

শস্য বহুমুখীকরণে
জালাল আলী সফল পানচাষি

রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলার কাশেমপুর গ্রামের একজন দিনমজুর কৃষক মো. জালাল আলী। পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা ৩ জন। কৃষির সাথে তার সম্পৃক্ততা ১৫ বছর। নিজেস্ব ১০ শতাংশ জমি বসতভিটা, বর্গা ও লিজ নেওয়া জমি ১৭৫ শতাংশ। ২০২০ সাল পর্যন্ত কাশেমপুর গ্রামের একজন দরিদ্র দিনমজুর কৃষক হিসেবেই পরিচিতি ছিলেন জালাল আলী। চাষাবাদ বলতে ধান, পান, সবজি ও ছাগল পালন– এই দিয়েই কোন রকম চলছিল সংসার নামক জীবন যুদ্ধ। চোখের সামনে অনেক কৃষক ধান, পান, সবজি, পেঁয়াজ জাতীয় ফসল চাষাবাদের মাধ্যমে নিজের ভাগ্য বদলাতে সক্ষম হয়েছেন। কৃষির পরিভাষায় যার নাম শস্য বহুমুখীকরণ। অন্যের ভাগ্য পরিবর্তন দেখেছেন কিন্তু নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করবেন এর জন্য দরকার পুঁজি। কারণ ধান, পান, সবজি ও ছাগল পালন করতে পুঁজির যোগান লাগে বেশি, তাই ২০২০ সাল পর্যন্ত সাহস হয়নি ১৫ বছরের ছকবাঁধা চাষাবাদের বাইরে নতুন কিছু করার ইচ্ছা। সেই সময় ইচ্ছা পূরণে প্রতিবেশী বুরো বাংলাদেশ এর সদস্য এর পরামর্শ নিয়ে দুর্গাপুর শাখায় আসেন যদি কিছু টাকা ঋণ পাওয়া যায় এই আশায়।

শাখা ব্যবস্থাপক সবকিছু শোনার পর সিদ্ধান্ত নেন জালাল আলীর পাশে দাঁড়ানোর এবং তাকে এসএমএপি প্রকল্পের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে প্রথম ধাপে ঋণ প্রদান করা হয় ৫০ হাজার টাকা। জালাল আলীর স্বপ্ন পূরণের সঙ্গী হয় বুরো বাংলাদেশ।

প্রথম ধাপে ঋণের টাকা দিয়ে ১০০ শতাংশ জমিতে ধান চাষ করেন। ধান চাষে তার খরচ হয় ৪০ হাজার টাকা, বিক্রির পরিমাণ ৭২ হাজার টাকা, নীট আয় ৩২ হাজার টাকা। জালাল আলী দিন বদলের যাত্রার শুরুটা এখান থেকেই। কারণ ফসল উৎপাদনে ফসলের বিভিন্ন রোগ ও পোকামাকড় দমনের জন্য বুরো বাংলাদেশ কারিগরি সহায়তা সেবা প্রদান করে। তিনি সফলভাবে ঋণের টাকা পরিশোধ করেন এবং লাভের টাকা দিয়ে একটি ছাগল ক্রয় ও সবজি চাষ করেন।

তিনি দ্বিতীয় ধাপে ঋণ গ্রহণ করেছেন ১ লক্ষ টাকা, ঋণের টাকা দিয়ে পান চাষ করেন ৩৩ শতাংশ জমিতে, ধান ও সবজি চাষ করেন ১৪২ শতাংশ জমিতে। পান চাষে তার মোট খরচ ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। তিনি আশা করেন, পানের বাজার ভাল থাকলে বিক্রির পরিমাণ হবে ৩ লক্ষ টাকা। এছাড়াও তার ছোট-বড় ৫টি ছাগল রয়েছে, ছাগলের মূল্য ৪০-৫০ হাজার টাকা।

সঠিক পরিকল্পনা এবং ঋণের যথাযথ ব্যবহার যে কোন মানুষের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে, একজন জালাল আলী তার প্রকৃত উদাহরণ।■

● মো. আব্দুর রহমান
আরপিও-কৃষি, এসএমএপি প্রকল্প, রাজশাহী অঞ্চল।
বুরো বাংলাদেশ

মো. মনোয়ারুল হক

প্রতিষ্ঠাকালীন
উপপরিচালক-প্রশাসন
বুরো বাংলাদেশ

শোকবার্তা

বুরো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাকালীন সংগঠক ও উপপরিচালক-প্রশাসন মো. মনোয়ারুল হক গত ১৯ আগস্ট ২০২২ তারিখে ঢাকার একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন জানতে পেরে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন। আমি তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

আমার এক সময়ের সহকর্মী মনোয়ারুল হক ছিলেন ধার্মিক, বিনয়ী, মৃদুভাষী ও অত্যন্ত মেধাবী একজন মানুষ। সংগঠক হিসেবেও তিনি ছিলেন সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব। তৎকালীন 'বুরো টাঙ্গাইল'কে একটি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে আইনী ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে আমার সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছিলেন তিনি। ঐ সময়ে তার এই অবদানের গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বুরো বাংলাদেশের আজকের এই অবস্থানের পেছনে তার ঐ অবদান কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। আমি এবং বুরো বাংলাদেশ পরিবার মনোয়ারুল হকের এই অবদানকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

নরসিংদী জেলার সন্তান মনোয়ারুল হক পরবর্তীতে বুরো বাংলাদেশের সাথে সম্পৃক্ত না থাকলেও পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে। পাশাপাশি তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন বিভিন্ন সামাজিক ও সেবামূলক কার্যক্রমের সাথেও। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও কন্যা সন্তান রেখে গেছেন।

একজন সহকর্মী ও বুরো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা সংগঠকদের একজনকে হারিয়ে আমি এবং পুরো বুরো বাংলাদেশ পরিবার শোকাহত ও ব্যথিত। আমরা মনোয়ারুল হক এর শোক সন্তপ্ত পরিবার ও স্বজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি এবং হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে প্রার্থনা করছি, মহান সৃষ্টিকর্তা তাকে যেন জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন।■

BURO Bangladesh

জাকির হোসেন
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক
বুরো বাংলাদেশ

এম. মোশাররফ হোসেন

আমাদের ভাই সাহেব

১৯৯০ সাল। কনকনে শীতের শেষে বসন্ত আগমনের বার্তায় উনার সাথে প্রথম পরিচয়। আলোচনার বিষয়বস্তু আমাদের বাংলাদেশ বেকার পুনর্বাসন সংস্থার (Bangladesh Unemployed Rehabilitation Organization বা BURO) ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে। তৎকালীন বুরো'র মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের আর্থিক চিত্র অনুসন্ধান করার জন্য PACT Inc./PRIP-এর সাথে মেসার্স এম.এ কাদের কবীর অ্যান্ড কোঃ, চার্টার্ড একাউন্টেটস এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই কাজের অংশ হিসেবে আমি, এম.এ. কাদের কবীর এবং Graham A.N. Wright ১৯৯০ সালের পহেলা রমজান (২৭ মার্চ ১৯৯০) নরসিংদী জেলার বেলাবোতে বুরো'র শাখা পরিদর্শনে যাই। সেখানে প্রথম সাক্ষাৎ হয় মো. মনোয়ারুল হকের সাথে। আমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের ছোট ছোট অথচ চুম্বক উত্তর দিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারপর অনেক ইতিহাস ও ঘটনা পেরিয়ে একত্রে কাজ শুরু হলো। PACT Inc. এবং BURO-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে Organizational Strengthening of a Rural Saving and Investment Program প্রকল্পে জাকির হোসেন, মো. সিরাজুল ইসলাম, মো. মনোয়ারুল হক এবং মো. মোশাররফ হোসেনসহ আরো কয়েকজন নিয়োজিত ছিলেন। এদের মধ্যে আবার বুরো'র নির্বাহী পরিষদের তৎকালীন মহাসচিব জাকির হোসেন, অর্থ সচিব মো. মনোয়ারুল হক, সাংগঠনিক সচিব মো. সিরাজুল ইসলাম এবং মো. মোশাররফ হোসেন সদস্য হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন।

বুরো'র তৎকালীন চেয়ারম্যান মেজর (অব.) ওয়াহেদুল হোসাইন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার কারণে উল্লেখিত ৪ জনসহ মোট ১২ জন কর্মকর্তা পদত্যাগ করি।

পদত্যাগ পরবর্তী করণীয় ছিল বুরো টাঙ্গাইল প্রতিষ্ঠাকরণে মনোযোগী হওয়া। এ সময়ে মনোয়ারুল হকের ভূমিকা এবং অবদান ছিল উল্লেখ করার মতো। দিনের পর দিন হাঁটুর ওপর খাতা রেখে সংস্থাকে আইনি কাঠামো দেওয়ার জন্য রেজুলেশনসহ অনেক কাগজপত্র লিখেছেন। সেই হাতে লেখা রেজুলেশনের কপি এখনও সংস্থায় সংরক্ষিত আছে ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে।

বুরো টাঙ্গাইল প্রতিষ্ঠার পর সংস্থার প্রধান কার্যালয়, বেপারী পাড়া, টাঙ্গাইলে স্থানান্তর করা হয়। দোতলা বিল্ডিং এর নিচ তলায় অফিস আর দোতলায় আবাসিক। সেখানে আমি, মনোয়ারুল হক এবং মো. সিরাজুল ইসলাম থাকতাম। কিছুদিন পর মো. সিরাজুল ইসলাম পরিবার নিয়ে আলাদা বাসায় চলে যান।

আবাসিক প্রায় প্রতিদিন আমাদের চারজনের আলোচনা ও আড্ডা হতো। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল সংস্থার উন্নয়নে পরবর্তী করণীয় ও কৌশল নির্ধারণ করা। মো. মনোয়ারুল হক সাহেব ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক এবং আমাদের ভেতর মুরব্বী। এক পর্যায়ে আমরা সকলেই তাকে ভাই সাহেব বলে সম্বোধন করা আরম্ভ করি। সেই থেকে অদ্যাবধি তিনি আমাদের কাছে মনোয়ার ভাই সাহেব বা ভাইসাব। প্রতি রবিবার হলেই ভাইসাবকে ঘিরে আমাদের আগ্রহ সৃষ্টি হতো। এর বড় কারণ ছিল ঢাকা থেকে টাঙ্গাইল আসার সময় মনোয়ার ভাবি কিছু না কিছু নিত্যনতুন রসালো এবং উপাদেয় খাবার ভাইসাবকে দিয়ে দিতেন। এটাই ছিল আমাদের আগ্রহের কারণ। সেই রসনায় আমরা হালকা উপাদেয় বলে অভিহিত করতাম। সে দিন অফিস শেষে সভা হলেই আমাদের ডায়ালগ থাকত, ভাইসাব হালকা কোথায়? উত্তর আসত– আছে ভাইসাব, বসেন। সংগঠনের প্রতি উনার আন্তরিকতা ভোলার মতো নয়। ত্যাগ, পরিশ্রম, সময়ানুবর্তীতায় তিনি অনন্য উচ্চতার মানুষ ছিলেন।

তিনি ছিলেন মৃদুভাষী এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে চৌকস ও কৌশলী। প্রতিষ্ঠাকালীন ঝঞ্জা বিক্ষুব্ধ দিনে কোনো প্যাচ ও জটিলতা সৃষ্টি হলে ভাইসাব আবির্ভূত হতেন নিজস্ব স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে। আমাদের প্রিয় ভাইসাব ইন্তেকাল করেছেন গত ১৯ আগষ্ট। তার মৃত্যুতে হৃদয়ের গভীরতম স্থান থেকে প্রার্থনা করছি– তাঁকে আল্লাহ জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন।■

● অর্থ পরিচালক, বুরো বাংলাদেশ

কুমিল্লা সিএইচআরডি উদ্বোধন

গত ১৬ জুলাই ২০২২ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে বুরো বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র কুমিল্লা। কোটবাড়ী রোডের ধনপুর এলাকায় সুপরিসর এই স্থাপনাটি উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব জনাব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবসময়ই নারী উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে আসছেন। কারণ আমাদের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। আমরা যদি নারীদের প্রশিক্ষিত করে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারি তাহলে অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়নের প্রভাব পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র ভোগ করবে। জনাব সলীম উল্লাহ আরো বলেন, পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে বাংলাদেশি জনশক্তির মূল্য কম। ভারত, ইন্দোনেশিয়া, চায়নার তুলনায় বাংলাদেশি শ্রমিকরা কম মজুরি পান কিংবা কম বেতনে চাকরি করেন। তার একটাই কারণ দক্ষতার অভাব। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের জনশক্তিকে যদি দক্ষভাবে তৈরি করে বিদেশে রপ্তানি করা যায় তাহলে আরো বেশি

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। তিনি বলেন, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে পারলে এর ফল সরাসরি দেশের অর্থনীতিকে বেগবান করবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মো. ফসিউল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন কুমিল্লার জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসান। সিএইচআরডির বিশাল হলরুমে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বুরো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাত ও নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংস্থার পরিচালক-অর্থ এম মোশাররফ হোসেন এবং পরিচালক-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা জনাব প্রাণেশ বণিক। অনুষ্ঠানের শুরুতে উপস্থিত অতিথিবৃন্দের সাথে বুরো বাংলাদেশকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য একটি ডিজিটাল প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন বুরো বাংলাদেশের পরিচালক অপরেশনস-ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এর ফারমিনা হোসেন। বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে সিএইচআরডিটি উদ্বোধনের পর আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ আর্থিক সক্ষমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের একটি সেশন

পরিদর্শন করেন এবং সংস্থার প্রশিক্ষণার্থী নারী উদ্যোগক্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। এ সময় প্রধান অতিথি তাদের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন।

মনোমুগ্ধকর পরিবেশে নির্মিত ও পরিচালিত এই আধুনিক ও অভিজাত মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে রয়েছে ১টি ফ্যামিলি স্যুট রুমসহ ৩টি স্যুট রুম, ১৬টি এক্সিকিউটিভ কিং (AC Couple Bed), ৫১টি এক্সিকিউটিভ টুইন (AC 2 Bed) যেখানে মোট ১২৬ জন এর থাকার ব্যবস্থা আছে। সাথে রয়েছে কমপ্লিমেন্টারি সেবা যেমন– সকালের নাশতা, ইন্টারনেট ব্যবহার এর সুযোগ, ব্যায়ামাগার

সুবিধা, সওনা বাথ, স্টিম বাথ, গাড়ি পার্কিং এবং এমিনিটিজ।

প্রশিক্ষণ সুবিধার জন্য রয়েছে ২টি প্রশিক্ষণ কক্ষ যেখানে ৩০ জন করে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুবিধা, আরও রয়েছে ২টি কনফারেন্স রুম ও ১টি অডিটোরিয়াম যেখানে আছে ১৩০ জন করে বসার সুব্যবস্থা।

সুন্দর সময় কাটানো ও অতিথিদের চাহিদামতো খাবার পরিবেশন করার জন্য আছে রুফটপ রেস্তোরাঁ, আউটডোর ডাইনিং এবং সাথে বারবিকিউ এরও সুব্যবস্থা। একসাথে ১০০ জনের খাবার গ্রহণের সুব্যবস্থা রয়েছে।

বুকিং দিতে ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন:

মোবাইল: +৮৮০১৭০১২৫০১১৬
ঠিকানা: কোটবাড়ী রোড, ধনপুর, হালিমানগর, কুমিল্লা।
ই-মেইল: chrd_cumilla@burobd.org

শোকের ক্যানভাসে জাতির পিতা চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে গত ১৬ই আগস্ট বুরো বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'শোকের ক্যানভাসে জাতির পিতা' চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং আলোচনা সভা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ ফসিউল্লাহ, এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি। সভাপতিত্ব করেন বুরো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন। আরো উপস্থিত ছিলেন বুরো বাংলাদেশের অর্থ পরিচালক জনাব মোশারফ হোসেন। অনুষ্ঠানটি সকালে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শুরু হয়। এই আয়োজনে বুরো বাংলাদেশ পরিবারের ৩ থেকে ১৪ বছর বয়সি শিশুরা অংশগ্রহণ করে। আলোচনা সভায় শিশুদের প্রতি জাতির পিতার স্বরূপ ও দেশপ্রেম চেতনা জাগিয়ে তোলার কথা বলেন জনাব মো. ফসিউল্লাহ। অনুষ্ঠান

শেষে বিজয়ী এবং অংশগ্রহণকারী শিশুদের মাঝে সার্টিফিকেট, উপহারস্বরূপ চিত্রকলার উপকরণ এবং বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত বই বিতরণ করা হয়। বিচারক হিসেবে ছিলেন চিত্রশিল্পী জনাব মোস্তাফিজ কারিগর এবং সালওয়াত সেমন্তী, ক্রিয়েটিভ সুপারভাইজার, একো স্টুডিওস।

প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের নাম

গ্রুপ-ক:
আরিয়ানা জামান (১ম স্থান)
দাহিয়া ওয়াহি কালবি (২য় স্থান)
সাফীর মাহবুব (৩য় স্থান)

গ্রুপ-খ:
শুভশ্রী দে হৃদি (১ম স্থান)
আরিবা মুস্তারি রুশদা (২য় স্থান)
এস কে জাহিন আতিক নূহা (৩য় স্থান)

গ্রুপ-গ:
ফারিন রহমান (১ম স্থান)
রায়ান সারা (২য় স্থান)
আফিফা ইসলাম আনহা (৩য় স্থান)

গ্রুপ-ঘ:
নূরে জান্নাত (১ম স্থান)
ফারদিন রহমান (২য় স্থান)
নূর-ই শামস (৩য় স্থান)

SME খাতে বিনিয়োগের জন্য বুরো বাংলাদেশ এর পর্যালোচনা সভা

SME খাতে বিনিয়োগের জন্য বুরো বাংলাদেশ দেশে প্রথমবারের মতো SME Syndication এর মাধ্যমে Citibank, N.A. এর তত্ত্বাবধায়নে ৯টি ব্যাংক যথাঃ সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া, মিউচুয়াল ট্রাষ্ট ব্যাংক, সাউথইষ্ট ব্যাংক এবং সিটিব্যাংক এন. এ. থেকে ৫৭৫ কোটি টাকার তহবিল সংগ্রহ এবং বিনিয়োগ করে। সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে ২৫/০৮/২০২২ তারিখে বুরো বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিটিব্যাংক এন. এ. এর প্রধান নির্বাহী সামস্ জামান, বুরো বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন এবং পরিচালক (অর্থ) মো. মোশাররফ হোসেন বক্তব্য রাখেন।

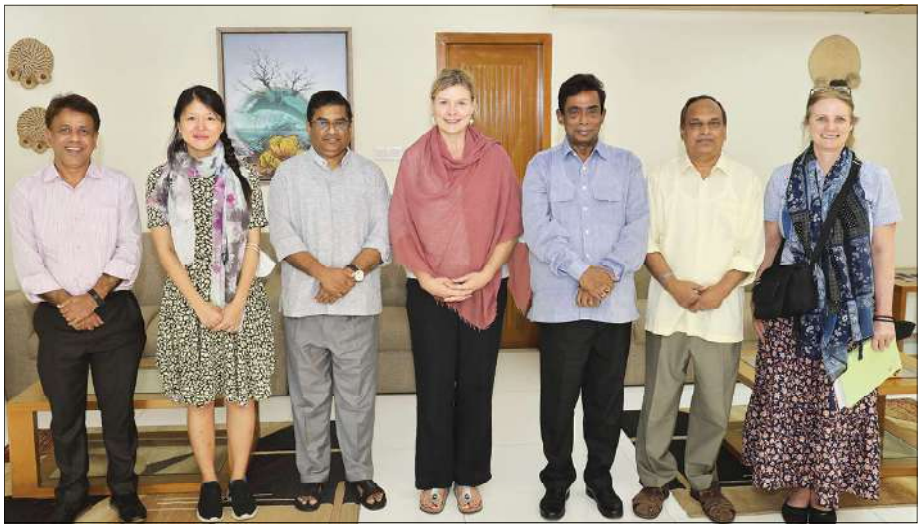

অপরচুনিটি ইন্টারন্যাশনাল অস্ট্রেলিয়া

সম্প্রতি বুরো বাংলাদেশের চলমান স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচির অগ্রগতি, প্রভাব এবং সম্প্রসারণের উপায় নিয়ে মতবিনিময় করতে অপরচুনিটি ইন্টারন্যাশনাল এর একটি প্রতিনিধি দল সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেনসহ অন্যান্য পরিচালকবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন। বুরো বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন মেরেডিথ ডাউনি- ম্যানেজার ওম্যান্স হেলথ অ্যান্ড সেফটি প্রোগ্রাম, অ্যানি ওয়াং- পরিচালক ওম্যান্স হেলথ অ্যান্ড সেফটি প্রোগ্রাম এবং জুটা ওয়েরমেল্ট- পরিচালক কর্মসূচি অপরচুনিটি ইন্টারন্যাশনাল জার্মানি। বুরো বাংলাদেশের পক্ষে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন, পরিচালক অর্থ- জনাব এম মোশাররফ হোসেন, পরিচালক-বিশেষ কর্মসূচি জনাব সিরাজুল ইসলাম ও বিশেষ কর্মসূচি বিভাগের সমন্বয়কারী জনাব এস এম এ রাকিব।

শোক সংবাদ

বুরো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাকালীন সংগঠক ও উপপরিচালক-প্রশাসন মো. মনোয়ারুল হক গত ১৯ আগস্ট ২০২২ তারিখে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকার একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন।

মনোয়ারুল হক ছিলেন ধার্মিক, বিনয়ী, মৃদুভাষী ও অত্যন্ত মেধাবী একজন মানুষ। সংগঠক হিসেবেও তিনি ছিলেন সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব। তৎকালীন 'বুরো টাঙ্গাইল'কে একটি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে আইনী ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন এর সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন তিনি। প্রতিষ্ঠান হিসেবে বুরো বাংলাদেশের আজকের এই অবস্থানের পেছনে তার ঐ অবদান কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

তার মত একজন প্রতিষ্ঠাতা সংগঠককে হারিয়ে পুরো বুরো বাংলাদেশ পরিবার শোকাহত ও ব্যথিত। আমরা মনোয়ারুল হক এর রুহের মাগফেরাত এবং তার শোক সন্তপ্ত পরিবার ও স্বজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি।

নতুন উদ্যমে বুরো'র ওয়াশ কর্মসূচির যাত্রা শুরু

সংস্থা শুরু থেকে গণমানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে টেকসই করার লক্ষ্যে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন খাতে সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড এবং স্থাপনা নির্মাণের জন্য ঋণ সহায়তা দিয়ে আসছে। প্রকল্পকালীন ৫,৪০,০০০ সদস্যকে যথাযথ সেবা প্রদানের পর সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে কার্যক্রমটি 'ওয়াশ কর্মসূচি' নামে কর্মসূচি বিভাগের আওতায় অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই কার্যক্রমের আওতায় শাখা পর্যায়ে সকল কর্মীদের WaSH কর্মসূচি বাস্তবায়নবিষয়ক দেশব্যাপী এলাকাভিত্তিক ওরিয়েন্টেশন প্রদানের লক্ষ্যে গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে বুরো বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন টাঙ্গাইল মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, ছিলিমপুরে শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

পরবর্তীতে তিনি সখিপুর, মধুপুর ও কুমিল্লা অঞ্চলের আরও তিনটি ওরিয়েন্টেশনে উপস্থিত থেকে প্রোগ্রামের করণীয় নিয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। ওরিয়েন্টেশনগুলোতে সকল বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বিভাগীয় প্রশিক্ষক-ওয়াশ ও এলাকা ব্যবস্থাপকসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার সকল কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও প্রধান কার্যালয় হতে কর্মসূচি সমন্বয়কারী, আইসিটি বিভাগের প্রধান ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক উপস্থিত থেকে ওয়াশ কর্মসূচির গুরুত্ব তুলে ধরেন।

বুরো বাংলাদেশ ও ইস্টার্ন ব্যাংক সিলেট-সুনামগঞ্জের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য খাদ্য সহায়তা

গত ৩০-৩১ আগস্ট, বুরো বাংলাদেশ ও ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে সিলেট-সুনামগঞ্জের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

সিলেটের জৈন্তাপুর ও গোয়াইনঘাট এবং সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুর ও দিরাই উপজেলার বন্যা ক্ষতিগ্রস্ত, হতদরিদ্র ও খাদ্য সংকটে থাকা ৩ হাজার পরিবারের মাঝে ৩১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। বুরো বাংলাদেশের সাংগঠনিক সহযোগিতায় পরিচালিত এই কার্যক্রমে ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার (সিএসআর) আওতায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। খাদ্য সহায়তা বিতরণ কার্যক্রমে বুরো বাংলাদেশ, ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড ও স্থানীয় উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে ট্রি ট্যাগিং কর্মসূচি

প্রকল্প গ্রিন ক্যাম্পাস এর আওতায় সম্প্রতি ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে উদ্বোধন করা হয় Tree Tagging কর্মসূচি। গত ১৯ অক্টোবর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কলেজটির অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ এবং বুরো বাংলাদেশের ঢাকা মেট্রোপলিটন-উত্তর অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মুস্তাফিজুর রহমান রাহাত। বুরো বাংলাদেশের পৃষ্ঠপোষকতায় বাস্তবায়িত এই কর্মসূচির মাধ্যমে মোহাম্মদপুরে অবস্থিত ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন গাছে পরিচিতিমূলক ট্যাগ লাগানো হয়। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন কলেজটির সায়েন্স ক্লাবের কো-অর্ডিনেটর মো. নুরুন নবী, ক্লাব মডারেটর মো. মুস্তাফিজুর রহমান, শিক্ষক হাসান শেখ ও ইশরাত জাহান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে বুরো বাংলাদেশ এর কার্যক্রম এবং গ্রিন ক্যাম্পাস প্রকল্প নিয়ে দুটি পৃথক ডিজিটাল প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়।

ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরামের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

টাঙ্গাইলের রেজিস্ট্রি পাড়ায় বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরামের একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় বক্তব্য রাখেন ফোরামে সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক ও বুরো বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন, সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল হাসান শেলী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হারুন-অর-রশিদ, গণসঙ্গীত শিল্পী এলেন মল্লিক, রাজনীতিবিদ খন্দকার নাজিম উদ্দিন ও কবি মাহমুদ কামালসহ জেলার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। টাঙ্গাইল জেলায় সাংস্কৃতিক সম্মেলন আয়োজনের লক্ষ্যে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্ব হার্ট দিবস উপলক্ষে টাঙ্গাইলে র‍্যালি ও আলোচনা সভা

বিশ্ব হার্ট দিবস উপলক্ষে টাঙ্গাইলে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন টাঙ্গাইল ও বুরো হেলথ কেয়ার ফাউন্ডেশন টাঙ্গাইলের যৌথ উদ্যেগে উক্ত র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিশ্ব হার্ট দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল–

হৃদয় দিয়ে হৃদয়কে ভালোবাসুন/প্রকৃতি ও পরিবেশকে রক্ষা করুন

সভায় এই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজের পরিচালক প্রফেসর ডা. মোহাম্মদ আলী খান, টাঙ্গাইল জেলার জেলা প্রশাসক ড. আতাউল গণি, টাঙ্গাইল জেলার পুলিশ সুপার সরকার মো. কায়সার, বুরো হেলথ কেয়ার ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন ডা. সাঈদা কে আলম, বুরো হেলথ কেয়ার ফাউন্ডেশনের পরিচালক রাহেলা জাকির, টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সভাপতিসহ শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, বুরো হেলথ কেয়ার ফাউন্ডেশনের চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তা, কর্মচারী সহ বিশিষ্ট গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বুরো নার্সিং ইনস্টিটিউট এর অনুমোদন প্রাপ্তি

৪০ আসনবিশিষ্ট বুরো নার্সিং ইনস্টিটিউট এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আনুষ্ঠানিক অনুমোদন পেয়েছে। বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল এর রেজিস্ট্রার রাশিদা আক্তার এই অনুমোদনপত্র প্রদান করেন। বুরো হেলথ কেয়ার ফাউন্ডেশন এর পক্ষে এই অনুমোদনপত্র গ্রহণ করেন বুরো বাংলাদেশের ঢাকা মেট্রোপলিটন অঞ্চল-উত্তর এর আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক জনাব মুস্তাফিজুর রহমান রাহাত। ৪০ আসনবিশিষ্ট এই নার্সিং ইনস্টিটিউট এর কার্যক্রম পরিচালিত হবে টাঙ্গাইল এর রেজিস্ট্রি পাড়ায়। আমরা কৃতজ্ঞ বুরো হেলথকেয়ার ফাউন্ডেশন-এর পরিচালক রাহেলা জাকিরের প্রতি, যার ঐকান্তিক পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টা এই উদ্যোগকে সাফল্যমন্ডিত করেছে।

৪০ আসন বিশিষ্ট বুরো নার্সিং ইন্সটিটিউট এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আনুষ্ঠানিক অনুমোদন পেয়েছে। বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল এর রেজিস্ট্রার রাশিদা আক্তার আজ এই অনুমোদন পত্র প্রদান করেন। বুরো হেলথ কেয়ার ফাউন্ডেশন এর পক্ষে এই অনুমোদন পত্র গ্রহণ করেন বুরো বাংলাদেশের ঢাকা মেট্রোপলিটন অঞ্চল-উত্তর এর আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক জনাব মুস্তাফিজুর রহমান রাহাত। ৪০ আসন বিশিষ্ট এই নার্সিং ইন্সটিটিউট এর কার্যক্রম পরিচালিত হবে টাঙ্গাইল এর রেজিস্ট্রি পাড়ায়।

দুই বাংলার সম্প্রীতির কবিতা পাঠ

৪ সেপ্টেম্বর বুরো বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয়ে 'দুই বাংলার সম্প্রীতির কবিতা' পাঠের আয়োজন করা হয়। বুরো বাংলাদেশের সাময়িকী প্রত্যয় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রত্যয়ের সম্পাদক কবি ফেরদৌস সালাম এবং সঞ্চালনা করেন নির্বাহী সম্পাদক বিদ্যুত খোশনবীশ।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ-এর মহাপরিচালক কবি জাফর ওয়াজেদ। এ ধরনের কবিতা পাঠের আয়োজনে দুদেশের মধ্যেকার ভ্রাতৃত্ববোধ ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায় বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি। দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বুরো বাংলাদেশের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসাও করেন কবি জাফর ওয়াজেদ।বিশেষ অতিথি হিসেবে কবিতা পাঠের এই আসরকে সমৃদ্ধ করে তোলেন কবি মাহমুদ কামাল, কবি সৌমিত বসু এবং কবি শাহীন রেজা। বাংলাদেশ ও ভারতের আমন্ত্রিত বিশিষ্ট কবিরা এই আসরে কবিতা পাঠ করেন।

ইনাফি বাংলাদেশের রিপোর্ট শেয়ারিং সেমিনার

ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান ও সামগ্রিকভাবে এই সেক্টরের গ্রাহকদের উপর কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির প্রভাব খুঁজে বের করতে সম্প্রতি একটি গবেষণা পরিচালনা করেছে ইনাফি বাংলাদেশ। আনুষ্ঠানিকভাবে এই রিপোর্টটি প্রকাশ করা হয় রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে আয়োজিত একটি সেমিনারে। রিপোর্টটি তুলে ধরে ইনাফির প্রোগ্রাম ম্যানেজার তাসনুভা ফারহিম জানান, মহামারির কারণে দেশের ৮৩.৯ শতাংশ এমএফআই এর আয় কমেছে কিংবা লোকসানের সম্মুক্ষিণ হয়েছে। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শেখ মোহাম্মদ সলিম উল্লাহ, সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মো. ফসিউল্লাহ, এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইনাফি বাংলাদেশ এর নির্বাহী পরিচালক মাহবুবা হক।

তিশা চাকমা; বাড়ি রাঙ্গামাটির ভেদভেদী এলাকায়। স্বামী সজিব চাকমা ও সাড়ে তিন বছরের মেয়ে নিদি চাকমাকে নিয়ে তার সংসার। ভেদভেদী বটতলা বাজারে তিশার একটি দোকান আছে। বিভিন্ন নিত্যপণ্যের পাশাপাশি পান-সুপারিও বিক্রি করেন দোকানে। তিশা বুরো বাংলাদেশের সদস্য দুই বছর ধরে। এক লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে দোকানে বিনিয়োগ করেছেন আর স্বামীকে কিনে দিয়েছেন একটি সিএনজি থ্রি-হুইলার। তার স্বামী অবসরে ছবি আঁকেন, বিশেষ করে গৌতম বুদ্ধের ছবি। তিশার ভাষায়, বাঁ হাতি সজিবের মেধা ছিলো কিন্তু কাজে লাগাতে পারেনি। তিশা পড়ালেখা করেছেন উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত কিন্তু আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে এরপর এগুতে পারেননি। কিন্তু মেয়ে নিদিকে উচ্চ শিক্ষিত করার আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে প্রবল। নিদির এখনো স্কুলে যাওয়ার বয়স হয়নি, তবুও নিয়মিত পাঠাচ্ছেন স্থানীয় বৌদ্ধ বিহারের পাঠশালায়। বুরো বাংলাদেশের আর্থিক সহায়তায় তিশা ও সচিব চাকমার সংসারে যতটুকু স্বচ্ছলতা ও সুখ ফিরে এসেছে তাকে পুঁজি করেই সন্তানের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করতে চান তিশা-সজিব দম্পতি।

আলোকচিত্র ● বিদ্যুত খোশনবীশ

BURO Bangladesh

excel telecom SAMSUNG

বুরোর নতুন স্মার্টফোন লোন
ঘরে ঘরে ডিজিটাল আলোড়ন

বুরো বাংলাদেশের সদস্যদের জন্য এখন থাকছে
লোনের মাধ্যমে স্যামসাং স্মার্টফোন কেনার সুযোগ

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন
https://burobd.org/qr/services.php
অথবা স্ক্যান করুন

#MIROFINANCETOMACROHAPPINESS

09610443322